শতবার্ষিকী স্মরণিকা

Centenary Souvenir

১৯১৩-২০১৩

1913-2013

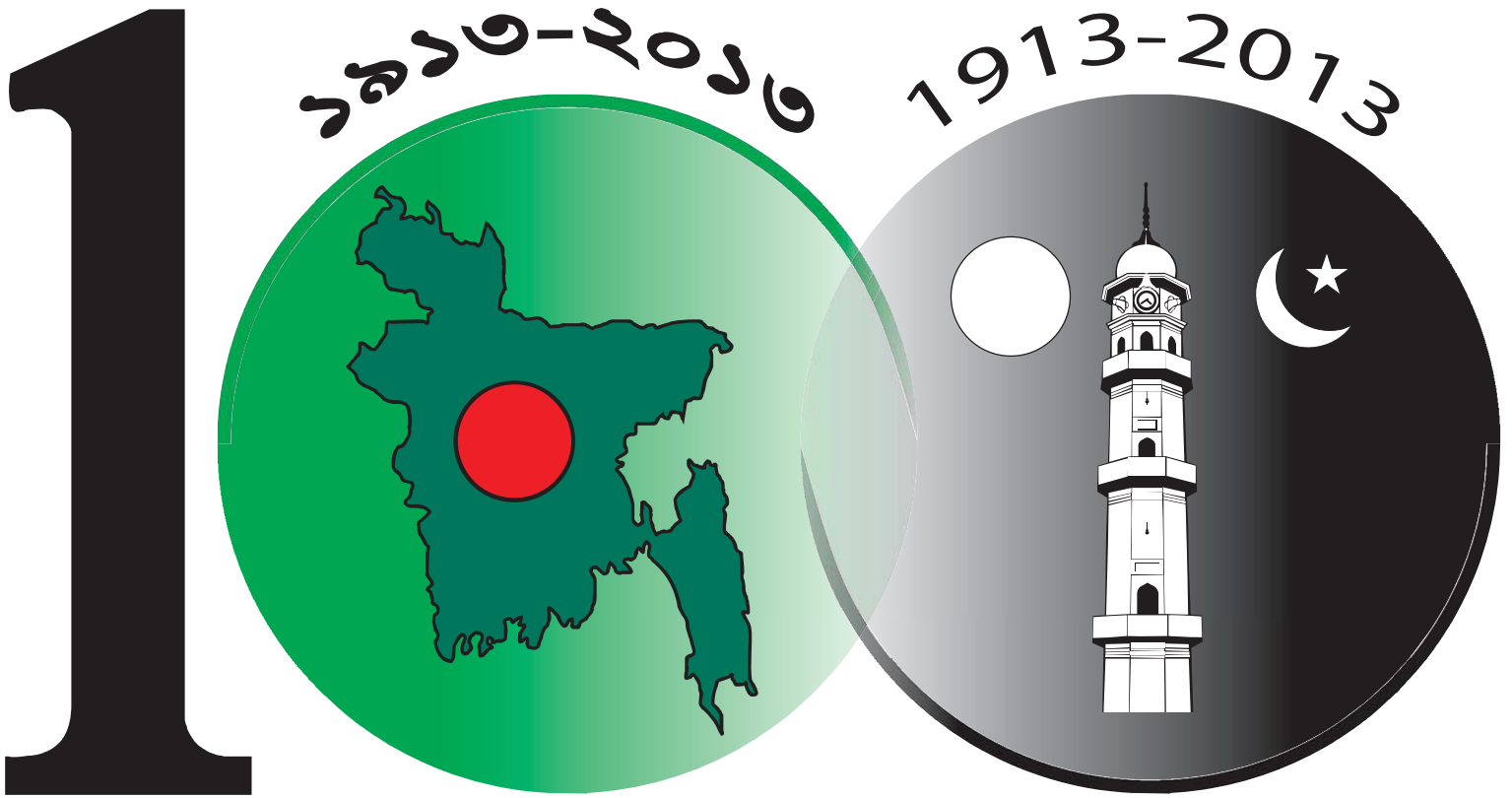

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর শতবার্ষিকী

স্মরণিকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশক : মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারি ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

প্রকাশকাল : ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.

মুদ্রণে : বিকাশ মুদ্রণ

প্রচ্ছদ : এস এম সুমন আহমেদ

গ্রাফিক্স : এস এম সুমন আহমেদ
মো. জহির-উল-ইসলাম

সার্বিক সহযোগিতায় : মোহাম্মদ সোলায়মান

ফটোগ্রাফি : খালেদ আব্দুল বারী
সাইফুল ইসলাম সুমন
রবিউল ইসলাম
মাসুদ আহমদ কোরাইশী
এহতেশামুল বশীর
মোহাম্মদ ইকরাম উল হক
আহমদ তৌসিফ চৌধুরী
আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী আবের
আব্দুর রাফে খান চৌধুরী আমের
Makhzan-e-Tasaweer
রাহাত ফটোগ্রাফার্স

অন্যান্য সূত্র : www.alislam.org
www.ahmadiayyabangla.org
www.mta.tv

স্মরণিকা কমিটি : আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
নূরুল ইসলাম মিঠু
মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

প্রচ্ছদ পরিচিতি : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে হুযূর(আই.) কর্তৃক অনুমোদিত লোগো।

সম্পাদকীয়

আল্লাহ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছি। হুযূর(আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে জুবিলীর কর্মসূচি সম্পন্ন করতে আরও এক বছর সময় বৃদ্ধি করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে আমাদের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ব্যাপ্তি ২০১৪ সাল পর্যন্ত ছিল। আমরা ২০১৩ সালে পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় দু'টি বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখা আহবান করেছিলাম। তদনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা লেখা জমা দিয়েছেন তাদের লেখা আমরা এখানে ছাপানোর চেষ্টা করেছি। দু'একটি লেখা সময়ের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মূল বিষয়বস্তু সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা করেছেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেব ও মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন সাহেব এবং টেকনিক্যাল কাজে সার্বিক সময় ও শ্রম দিয়েছেন জনাব এস এম সুমন আহমেদ এবং মোয়াল্লেম রবিউল ইসলাম সাহেব। ভাষা পরিমার্জনের কাজ করেছেন জনাব এহসানুল হাবীব জয় ও মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ সুমন সাহেব। এই স্মরণিকাকে শতবর্ষের একটি দর্পন হিসেবে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর পাশাপাশি বিবিধ বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.) পূর্ববর্তী স্মরণিকার ছবিগুলো ছোট আকারের বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাই এই স্মরণিকাতে ছবিগুলো অপেক্ষাকৃত বড় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শত চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আল্লাহর কাছে এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আশা করছি আপনারাও আমাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এ স্মরণিকা পূর্ববর্তী নাম জানা-অজানা আহমদী বুযুর্গদের জন্য দোয়ার আবেদন হিসেবে আমরা প্রকাশ করছি। আশা করি এটি বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের দায়-দায়িত্ব স্মরণ করানোর মাধ্যম হিসেবেও কাজ করবে।

এই লোগোটি প্রস্তাবিত তিনটি লোগোর মধ্য থেকে হুযূর(আই.) কর্তৃক চয়নকৃত ও অনুমোদিত। কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন পরিশ্রম করে জনাব তারেক আহমদ সবুজ এই লোগোটি প্রস্তুত করেছেন। লোগোর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, একশ' বছর পূর্তি। এর মধ্যে আহমদীয়াতের পতাকা এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা মিলিয়ে একাকার করে উভয়ের মাঝে সংহতি বুঝানো হয়েছে। দু'টি শূন্যকে দু'টি চাকা হিসেবে দেখানো হয়েছে যেগুলো সমান গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়া দু'টি বৃত্তের ডিজাইনিং-এ হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে চলার বিষয়টিও বুঝানো হয়েছে। বাংলাদেশকে গাঢ় সবুজ এবং বাংলাদেশের বাইরের অংশ হালকা সবুজ দিয়ে বুঝানো হয়েছে, এখানে আহমদীয়াতের সূচনালগ্নে বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকার অধিবাসীরা এক্ষেত্রে সহযাত্রী ছিল।

সূচিপত্র

- পবিত্র কুরআনের বাণী ৫
- হাদীস শরীফ ৫
- অমৃত বাণী ৬
- শেষ যুগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিশ্রুত ঐশী খিলাফত ৭
- স্মরণিকার জন্য হুযূর(আই.)-এর বিশেষ বাণী ১০
- জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী ১২
- শতবার্ষিকী উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস(আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ১৩
- ফিরে দেখা বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষের তথ্যপুঞ্জী ১৯
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- ন্যাশনাল আমেলা ৩৪
- ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে স্থানীয় জামা'তের আমীর ও প্রেসিডেন্টবৃন্দ ৩৫
- বাংলাদেশে কর্মরত মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান ৩৬
- মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর আমেলার সদস্যবর্গ ৩৭
- মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের আমেলা ৩৮
- জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের সূচনা ও অগ্রযাত্রা ৩৯
- বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত মোয়াল্লেম কোর্সের চিত্র ৪০
- জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ ৪১
- যেখান থেকে বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আনুষ্ঠানিক সূচনা ৪৪
  সৈয়দ মমতাজ আহমেদ
- জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দশটি দিন ৪৫
  মনসুর আহমদ (নাদির)
- আমার ওয়াকফ জীবনের যৎসামান্য স্মৃতি কথা ৪৬
  আহমদ সাদেক মাহমুদ
- প্রিয়তম খলীফা আমার ৪৭
  সোগরা বেগম টুনী
- কিছু জানা-অজানা কথা এবং দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন ৪৮
  মাহমুদ হাসান সিরাজী
- মোলাকাত ৫০
- খলীফার সান্নিধ্যে ৫৯
  ফিরোজ আলম
- আমার পিতার আহমদীয়াত গ্রহণ ৬৬
  বেগম মাক্সুদা ফারুক
- আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার ভাষায় আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ৬৯
- চট্টগ্রামে আহমদীয়াত প্রচারে বরণীয় ব্যক্তিত্বের স্মরণীয় অবদান ৭০
  খালিদ আহমেদ সিরাজী
- সৎ মানুষের কথা ৭২
  প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী
- একজন মহীয়সী আহমদী মায়ের কথা ৭৫
  মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান
- আকাশীয় রথে সত্য প্রচারের ব্যবস্থা ৭৭
- আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী ও এর কয়েকটি ঝলক ৭৮
  হামিদুর রহমান
- আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবর্ষ উদ্‌যাপন ৮১
- শান্তির দূত খলীফা মাসরূর ৮৬
- ধর্মীয় উগ্রবাদ বনাম প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ৮৮
  আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
- কাদিয়ানের সাতজন বাঙালি দরবেশ ৯১
  মুহাম্মদ রাসেল সরকার
- গাজী ওমর ফারুক-এর স্বহস্তে লিখিত অমর প্রেমের কাব্য ৯৭
- পুরুলিয়া জামা'তের গোড়ার কথা ৯৮
  মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
- একই বৃন্তের দু'টি ফুল ১০০
- আলোর দিশারী ১০২
  আমাতুল শাফী জাকিয়া
- স্মৃতিতে ময়মনসিংহ জামা'ত ১০৫
  আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী
- বাংলাদেশের শহীদ আহমদী ১০৮
- দোয়ার কবুলিয়ত ১১০
  শামীম আরা বেগম
- শতবার্ষিকী উপহার 'বঙ্গের রত্ন' ১১১
  জি.এম. সিরাজুল ইসলাম
- The Centenary Souvenir ১১২
- বাংলার কৃতী সন্তান ১১৩
- শতবর্ষে আমাদের প্রকাশনার মাত্র একটি ঝলক ১১৪
- বাঙালি মন-মানসে ধর্ম ও মানবতা ১১৫
  মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়
- লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশ ১১৯
- হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুণ্যভূমি কাদিয়ানে ১২০
  মারুফ আহমদ
- রাজশাহী শহরে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণের নেপথ্যে ঐশী সাহায্যের অভিজ্ঞতা ১২৩
  এম. আরিফ-উজ্-জামান
- একটি সতর্কবাণী! ১২৬
- আর্ত মানবতার সেবায় আহমদীয়া জামা'ত ১২৮
- শত বছরের বিরোধিতা এবং পত্র-পত্রিকায় আহমদীয়াত ১৩০
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- একটি দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা ১৩৩
  কে এম নজিবুল্লাহ হোসেন
- আহমদীয়া জামা'ত মহারাজপুরের পরিচিতি ১৩৪
  এনামুল হক রনি
- সুরভিত এক ফুল ইসহাক লস্কর স্মরণে ১৩৬
  বিলকিস বেগম
- Narrative of an Ahmadi doctor who served the Nusrat Jahan Scheme in Ghana ১৩৮
  Dr. Golam Kabir
- আমার স্মৃতি কথা ১৪২
  আলহাজ্জ সালেহ আহমদ
- স্মৃতির পাতা থেকে ১৪৮
  এহসান উল আলম
- নূরুদ্দীন আফ্রাদ একটি উজ্জ্বল তারকা ১৪৯
  আমাতুস সামী রহমান (বেবী)
- হে প্রিয় খলীফা ১৪৯
  সিবগাতুর রহমান
- আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আহমদীয়া মসজিদের কয়েকটি ১৫০
- খলীফা মোদের প্রাণ ১৫৬
  আহমদ তারেক মুবাশ্বের
- মুহাম্মদী মসীহর আদি পুরুষের দেশে ১৫৮
  শেখ মোস্তাফিজুর রহমান
- যে স্মৃতি ভুলবার নয় ১৬১
  এন এন মোহাম্মদ সালেক
- বাংলাদেশের আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন ১৬৩
- স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ২২২
  সংগ্রহ ও সংকলন: মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- আমাদের ভবিষ্যৎ ২২৮

পবিত্র কুরআনের বাণী

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থ: আর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলেও তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বারবার কৃপাকারী। *(সূরা আন্-নাহল: ১৯)*

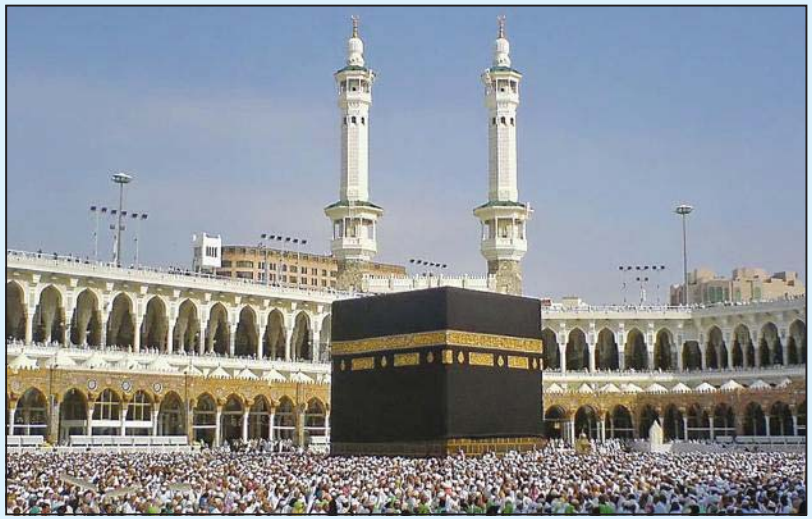

হাদীস শরীফ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالفَخْرُ وَالخُيَلاَءُ فِي أَصْحَابِ الإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ»،

অর্থ: আবূ হুরায়রাহ(রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস, নবী করীম(সা.) বলেছেন, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ঈমান হল ইয়ামানীদের, হিকমত হল ইয়ামানীদের, আত্মম্ভরিতা ও অহংকার রয়েছে উট পালক বেদুঈনদের মাঝে আর মেষপালকদের মাঝে আছে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব: আশআরী এবং ইয়ামেনবাসীদের আগমন)

হকীকাতুল ওহী পুস্তকে বর্ণিত ১২৮ নম্বর নিদর্শন :

"১৯০৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারিতে বাংলা প্রদেশ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যার শব্দমালা ছিল– 'পূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যেসব আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে।' এর ব্যাখ্যা হল, সরকার বাংলা প্রদেশ বিভক্তিকরণ বিষয়ে একটি আদেশ জারী করেছিল, যা সকলেরই জানা। এ আদেশ বাঙালিদের জন্য এতখানি মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল, যেন তাদের গৃহে শোকের ছায়া নেমে আসে। তারা বাংলার বিভক্তিকরণকে রহিত করতে অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে সরকারের কর্মকর্তারাও তাদের এই আন্দোলনকে পছন্দ করে নি।

শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাদের বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এখানে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার আমার প্রয়োজন নেই। বিশেষভাবে লেফটেনেন্ট গভর্নর ফুলারকে তারা নিজেদের জন্য মূর্তিমান যমদূত বলে মনে করল। কিন্তু সে সময় যখন বাঙালিরা নিজেদের শাসকগোষ্ঠীর হাতে কষ্ট পাচ্ছিল এবং স্যার ফুলারের অধীনে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল তখন আমার কাছে উপরোল্লিখিত ইলহাম হল। অর্থাৎ 'পূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যেসব আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে।' আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী সে সময়েই প্রকাশ করে দিই। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হল– বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্নর ফুলার সাহেব, যার হাতে বাঙালিরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং এমন আহাজারি করছিল, তাদের আর্তনাদ উর্দ্ধোলোকে গিয়ে পৌঁছল, তিনি হঠাৎ তার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন।

যে কারণে তিনি ইস্তফা দিলেন সে সম্পর্কিত নথিপত্র প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু বাংলা পত্র-পত্রিকা থেকে প্রতীয়মান হয়, ফুলার সাহেবের পদত্যাগে বাঙালিরা মহা আনন্দের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছে।

অমৃত বাণী

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী(আ.)-এর ইলহাম

''پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب اُن کی دلجوئی ہوگی۔''

'ইতোপূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যেসব আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে।'

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, ফুলারের অপসারণের ফলে বাঙালিরা স্বস্তি পেয়েছে। ফুলারের পদত্যাগ করাতে তাদের আনন্দ-সমাবেশ এবং বিপুল জয়ধ্বনি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে, ফুলারের অপসারণে প্রকৃতপক্ষেই তাদের মনস্তুষ্টি হয়েছে। বরং যথাযথভাবে মনস্তুষ্টি হয়েছে। ফুলারের অপসারণকে তারা নিজেদের জন্য সরকারের বড় অনুগ্রহ বলে মনে করেছে। অতএব যে উদ্দেশ্যে সরকার ফুলারের পদত্যাগের কারণ গোপন করে সেই উদ্দেশ্য বাঙালিদের সীমাহীন উল্লাস দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? সরকারের এই পদক্ষেপের দরুন বাঙালিরা তাদের মনস্তুষ্টি হবার কথা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে এবং যারপরনাই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল আমাদের সাময়িকী রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সেই প্রকাশ করা হয় নি বরং পাঞ্জাবের অনেক পত্র-পত্রিকাও এটি প্রকাশ করেছিল। এমনকি বাংলার কোন কোন নামী-দামী পত্রিকাও এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিল।

এই ভষ্যিদ্বাণী পূর্ণ হবার আরও একটি প্রমাণ হল, বাঙালিদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ খবরের কাগজ কোলকাতা হতে প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকার একটি লেখার অংশ লাহোরের 'সিভিল এণ্ড মিলিটারি গেজেট' পত্রিকায় ১৯০৬ সালের ২২শে আগস্টের সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। অংশটি ছিল-"আশা করা যায়, তার– অর্থাৎ ফুলারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি (নতুন লেফটেনেন্ট গভর্নর) বিশেষ মনস্তুষ্টির নীতি অবলম্বন করবেন। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ।"

উপরোক্ত পত্রিকার এই কথা থেকেও প্রতীয়মান হয়, এটি এ বিষয়ে নিজের স্বস্তি প্রকাশ করে বলছে, বাঙালিদের মনস্তুষ্টি করা নিশ্চয় লেফটেনেন্ট গভর্নরের কর্তব্য হবে। অতএব উল্লেখিত পত্রিকাও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার একটি সাক্ষী।

অবশেষে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার ব্যাপারে আরও একটি শক্তিশালী প্রমাণ লিখছি। তা হল, একজন ইংরেজ অফিসার, যিনি ৫০ বছর সরকারের একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি লাহোরের 'সিভিল এণ্ড মিলিটারি গেজেট' পত্রিকায় ১৯০৬ সালের ২৪শে আগস্ট এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেন, স্যার ফুলারের পদত্যাগ হুবহু বাঙালি-বাবুদের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়েছে। আরও লিখেন, এতে কোন সন্দেহ নেই, তার– অর্থাৎ ফুলারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে এই মর্মে নির্দেশ (সরকারের পক্ষ হতে) দেয়া হয়েছে এবং তিনি আন্দোলনকারী বাবুদের সাথে মনস্তুষ্টির পথ অবলম্বনের জন্য এ নির্দেশ গ্রহণ করেছেন।

এখন দেখ, কত সুস্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে! খোদা নিজের নিত্য-নতুন নিদর্শন দেখিয়ে যাচ্ছেন। হায়! এরা কত উদাসীন, এরপরও সত্য গ্রহণ করে না। আমি এই অবিরাম নিদর্শনাদির কারণে আত্মবিশ্বাসে সেভাবে পরিপূর্ণ হয়ে গেছি যেভাবে সমুদ্র পানিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পরিতাপ! এই স্বচ্ছ ও শীতল পানির এক ফোঁটাও আমার বিরুদ্ধবাদীদের ভাগ্যে জুটল না। এই মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তাও করা যায় না।

এমন কোন জাতি নেই যাদের মাঝে আমার নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যারা আমার নিদর্শনাবলির সাক্ষী নয়। যদি এসকল নিদর্শনের সাক্ষী দশ কোটিও বলা হয় তবে মোটেও তা অতিরঞ্জন করা হবে না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা দেখে কান্না পায়। এরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করল না। যেসব নিদর্শন তাদের দেখানো হয়েছে যদি এগুলো হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম-এর সময়ে ইহুদীদের দেখানো হত তাহলে তারা **'যুরেবাত আলাইহিমুয্ যিল্লাহ'**-এর প্রতীক হত না। যদি লূতের জাতি এসব নিদর্শন দেখতে পেত তাহলে তারা এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে মাটির নীচে চাপা পড়ত না। কিন্তু পরিতাপ সেই সব হৃদয়ের জন্য যারা পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন প্রতীয়মান হয়েছে। তাদের হৃদয়ের আঁধার যে কোন অন্ধকারকে হার মানায়।"*(হকীকাতুল ওহী)*

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে আরেকবার পূর্ণতা লাভ করে যখন জর্জ ৫ম ব্রিটিশ-ভারত পরিদর্শনে এসে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী বারবার নানা আঙ্গিকে পূর্ণ হয়ে থাকে।

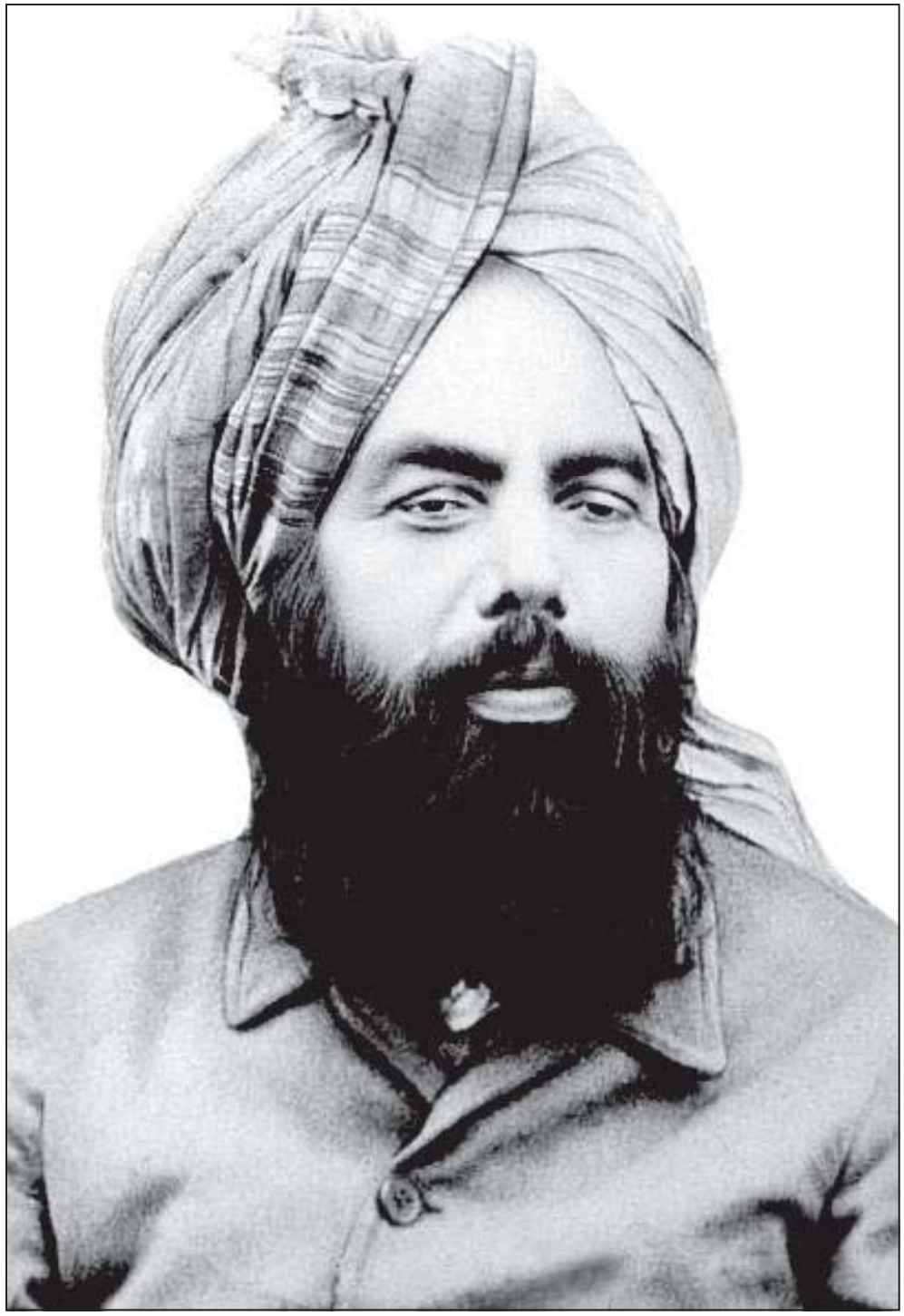

كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ
فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ

মহানবী(সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষযুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (হি. ১২৫০-১৩২৬ / খ্রি. ১৮৩৫-১৯০৮)

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى
لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

ইসলামের নবজাগরণের নতুন অধ্যায় ‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুয়্যত’ অর্থাৎ নবুওতের পদাঙ্ক অনুসরণে খিলাফত

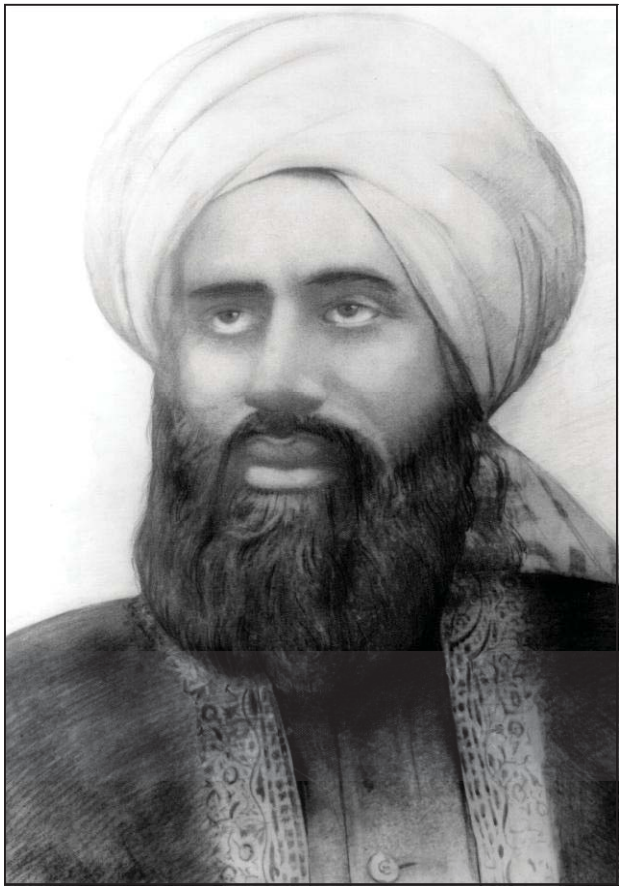

হযরত আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন(রা.)
খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (১৯০৮-১৯১৪)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ(রা.)
খলীফাতুল মসীহ সানী (১৯১৪-১৯৬৫)

“তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে এবং তাদের ভীতিপ্রদ অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ
ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ

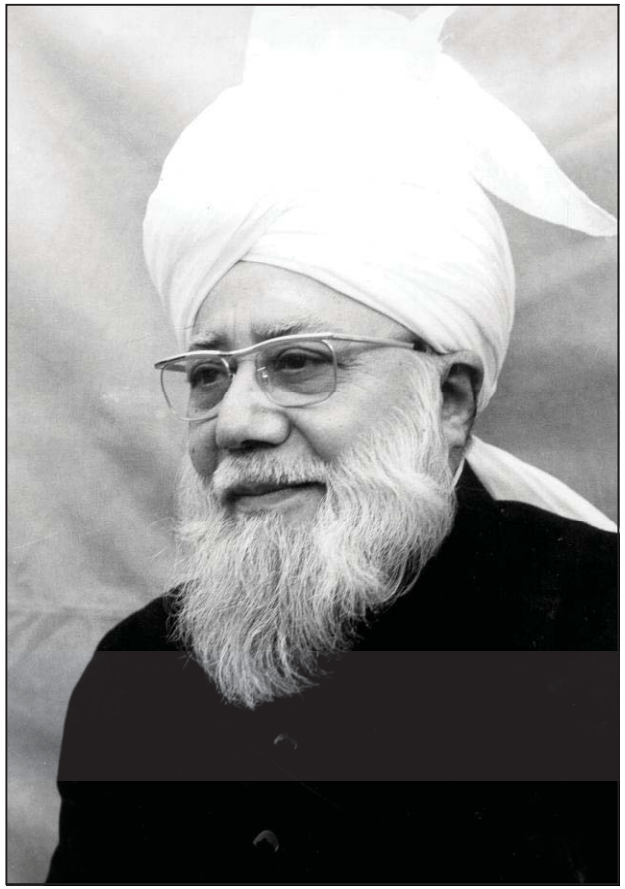

হযরত মির্যা নাসের আহমদ(রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ সালেস (১৯৬৫-১৯৮২)

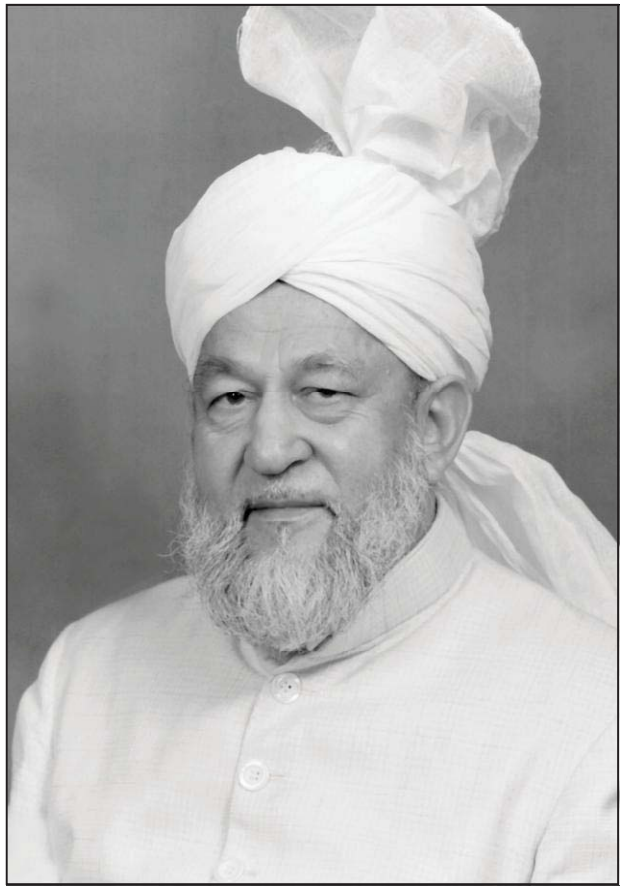

হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ রাবে (১৯৮২-২০০৩)

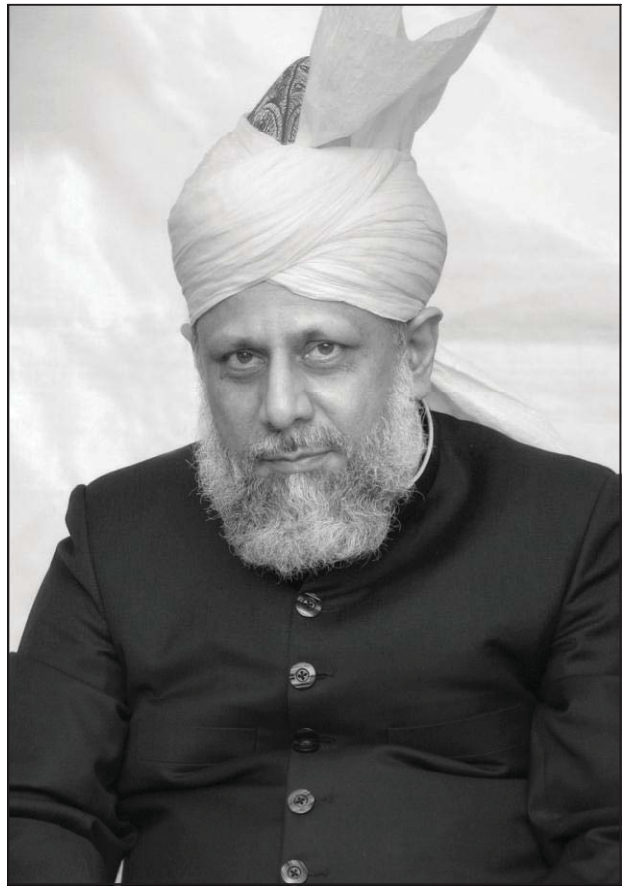

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)
খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (২০০৩ -)

পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন করবে না। আর এরপরও যারা অস্বীকার করবে তারাই দুষ্কৃতিকারী।" *(সূরা নূর: ৫৬)*

শতবার্ষিকী স্মরণিকার জন্য খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত গুরুত্বপূর্ণ বাণী

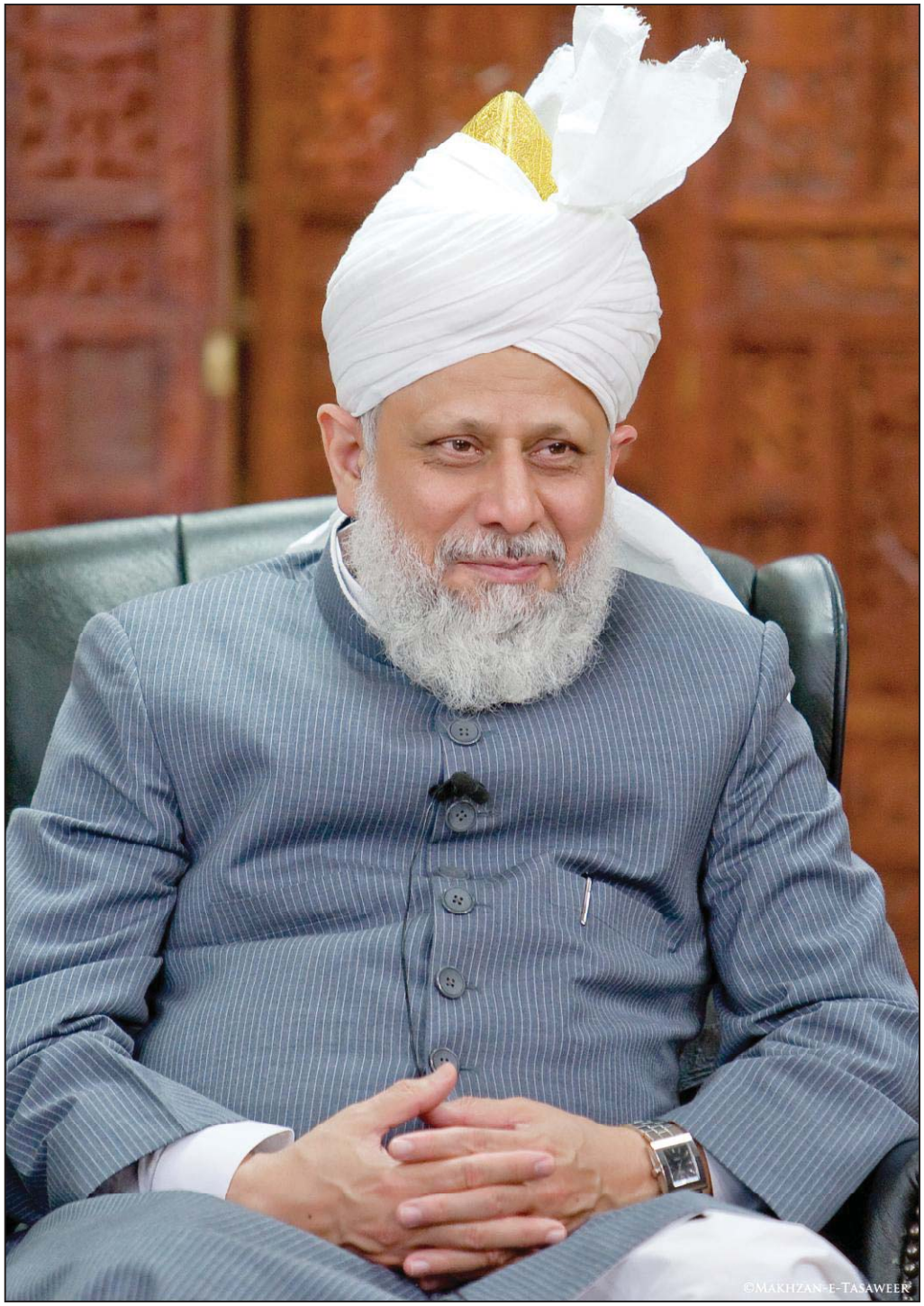

وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَنًا نَصِيْرًا
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وعلى عبدهِ المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو النّاصــــر

লন্ডন
৭ই মার্চ ২০১৪

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ, শতবার্ষিকী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্মরণিকা প্রকাশের যে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হবে; এটিই আমার প্রত্যাশা। এ উপলক্ষ্যে বাণী প্রেরণ করতে গিয়ে বাংলার কৃতি সন্তান হযরত মৌলানা আবদুল ওয়াহিদ সাহেব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল সে কথা আমার মনে পড়ছে। মৌলানা আবদুল ওয়াহিদ সাহেবের প্রতি ১৯০৫ ও ১৯০৬ সনে প্রেরিত দু'টো পত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যথাক্রমে লিখেছিলেন—'আপনার লেখায় পুণ্য ও সত্যানুসন্ধিৎসা অতি স্পষ্ট' এবং 'আপনার লেখায় সঠিক চিন্তা-চেতনা ও পুণ্যের সৌরভ পাওয়া যায়'। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি বা ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর তিরোধানের স্বল্পকাল পরই পূর্ণতা লাভ করেছে আর গত ১০০ বছরে পুণ্য বা ঈমানের এই সৌরভ সহস্র সহস্র হৃদয়কে সুরভিত করেছে। সত্যিকার অর্থে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই প্রতীতি বাংলার মানুষের নির্মল হৃদয়েরই চিত্র। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খলীফাদের বিভিন্ন বক্তব্যেও বাঙ্গালী আলেমদের এমন সৎ ও সাধু প্রকৃতির প্রশংসা করা হয়েছে। বাংলার খোদাভীরু এক আলেম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ঐতিহাসিক মন্তব্য মহানবী (সা.)-এর সেই অমর উক্তির স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত করে যা হযরত ওয়ায়েস করণীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল আর এতে সমগ্র ইয়েমেনের জন্য সুসংবাদ ছিল। তিনি (সা.) বলেন, 'ইন্নি আজেদু রীহার্ রহমানে মিন কিবালিল ইয়ামান' (অর্থাৎ আমি ইয়েমেন থেকে রহমান খোদার সৌরভ পাচ্ছি)। রহমানের সৌরভ ও পুণ্যের সৌরভ একই বিষয় প্রকাশের জন্যে দু'টো ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার মাত্র। আমরা জানি, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের স্বল্পকালের মধ্যেই পুরো ইয়েমেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল আর এ বাস্তবতার মাঝে রয়েছে বাংলার জন্যও আশার আলো। এক সময় ইনশাআল্লাহ্ সমগ্র বাংলা ইয়েমেনের মত সত্যের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সাহাবীদের ন্যায় আপনাদেরও কাটাতে হবে বিনিদ্র রজনী। দিনেও সত্যের প্রচার করতে হবে আর রাতেও। প্রকাশ্যেও মানুষকে বোঝাতে হবে আর গোপনেও। কালক্ষেপণের সময় নেই, তবলীগের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার এখনই উপযুক্ত সময়। বাংলার আকাশে-বাতাসে ঈমানের সৌরভ ছড়িয়ে দিতে হলে মানুষের কাছে যেতে হবে; এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু তবলীগ ও প্রচারের কাজ কোনদিন ফলপ্রসূ হবে না যদি খোদার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি আমরা বলতে না পারি যে, খোদাকে আমরা দেখেছি তাহলে আমাদের চলার পথ নিরাপদ নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে পরিবর্তন আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন, তা যদি সাধিত না হয় তাহলে আমাদের সকল কাজই বৃথা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার আগমনের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাসীদের এমন এক জামাত গঠন করা, যারা হবে সত্যিকার মু'মিন। খোদার সত্তায় থাকবে তাদের প্রকৃত ঈমান আর তাঁর সাথে থাকবে তাদের সত্যিকার সম্পর্ক বন্ধন। ইসলাম হবে তাদের পরিচিতি আর মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ অনুসরণ হবে তাদের রীতি। তারা সংশোধন ও তাক্ওয়ার পথ অনুসরণ করবে এবং উন্নত নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে; যেন জগদ্বাসী এমন জামাতের মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পায় আর খোদার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। যদি এ লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে যুক্তি প্রমাণের জোরে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হলেও বা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করলেও অর্থাৎ আমরা যদি জয়ীও হই আমাদের এ বিজয় হবে অর্থহীন। আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্যই যদি অর্জিত না হয়, তাহলে আমাদের সকল কর্মকান্ডই বৃথা..এই উৎকণ্ঠাই আজকাল আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। সেই চিন্তা এমনভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এক মূহূর্তের জন্যও আমি তা কাটিয়ে উঠতে পারছি না"। তিনি জামাতকে সম্বোধন করে আবার বলেন,"যদি ঐক্য না থাকে আর বিভেদ দেখা দেয়, তাহলে তোমরা হতভাগাই হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হও এবং একে অন্যের জন্য নিভৃতে দোয়া কর। কোন ব্যক্তি যদি নিভৃতে (ভাইয়ের জন্য) দোয়া করে, ফিরিশতা বলে, তোমার পক্ষেও এমনটিই (গৃহীত) হোক। এটি কত মহান একটি কথা! মানুষের দোয়া গৃহীত না হলেও ফিরিশতার দোয়া অবশ্যই গৃহীত হয়"। তিনি (আ:) পুনরায় বলেন," আমি এমন ব্যক্তিবর্গকে জামাত থেকে বহিস্কার করব যারা নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না আর পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের সাথে জীবন যাপন করতে জানে না। এমন লোকদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা কয়েকদিনের অতিথি মাত্র। যতক্ষণ উত্তম আদর্শ স্থাপন না করবে আমি কারো জন্য আপত্তির কারণ হতে চাই না। যে ব্যক্তি আমার জামাতভূক্ত হয়ে আমার ইচ্ছানুসারে চলে না সে শুষ্ক শাখা বৈ কিছু নয় ; মালি তা না কেটে কী করবে? শুষ্ক শাখা অন্য শাখার সাথে পানিতে ভাগ বসায় ঠিকই কিন্তু এতে সে সজীব হয় না বরং সে শাখা অন্য শাখাকেও বিনষ্ট করে। সুতরাং সাবধান! যে নিজের চিকিৎসা করবে না সে আমার সাথে থাকবে না"।

তিনি আরো বলেন, "পুণ্যবান ছাড়া আল্লাহতা'লা কারো জন্য ভ্রুক্ষেপ করেন না। পরস্পর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি কর আর পাশবিকতা ও বিভেদ পরিহার কর। হাসি-বিদ্রুপ ও তিরস্কার সম্পূর্ণভাবে বর্জন কর। কেননা হাসি-বিদ্রুপ মানুষকে সত্য থেকে বঞ্চিত করে ভয়াবহ পরিণতির মুখে ঠেলে দেয়। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। প্রত্যেকেই নিজের আরামের চেয়ে ভাইয়ের আরামকে প্রধান্য দাও"।

আল্লাহ্তা'লা, আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ:) এর উল্লেখিত অমূল্য নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করার সামর্থ দান করুন। জামাতকে শুভ সংবাদ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেছেন, "স্মরণ রেখো, যদি তোমরা আল্লাহ্তা'লার নির্দেশ মেনে চল আর তাঁর ধর্মের কাজে সক্রিয় হও তাহলে খোদা সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেবেন এবং তোমরা সাফল্য লাভ করবে। তোমরা কি দেখ নি যে, কৃষক ভাল চারার রক্ষণাবেক্ষণ কল্পে জমি থেকে আগাছা উপড়ে ফেলে একে নয়নাভিরাম চারাগাছ ও ফলবতী বৃক্ষে সজ্জিত করে, এর তদারক করে আর সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে একে বাঁচিয়ে রাখে?...... সুতরাং তোমাদের উচিত খোদার প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া যেন কোন মহামারী বা বিপদ-আপদ তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে; কেননা খোদার ইচ্ছা ব্যতিত ধরাপৃষ্ঠে কোন কাজ হতে পারে না। তোমরা নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা পরিহার কর, কেননা এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন তোমাদের উচিত হীন কর্মকান্ড পরিহার করে অর্থবহ ও সুমহান কাজে ব্রতী হওয়া।

আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ:) এর নির্দেশাবলী শতভাগ মেনে চলার তৌফিক দিন। প্রত্যেক আহমদী হযরত মসীহ মওউদ (আ:)- এর চিরহরিৎ বৃক্ষের চিরসবুজ শাখা হিসেবে এই বৃক্ষের সৌন্দর্য বর্ধন করবে; এটিই আমার প্রত্যাশা। শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খিলাফতের মত অমূল্য নিয়ামতে ধন্য করেছেন। এই ঐশী অনুকম্পার জন্য খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত; আর খিলাফতের প্রতি নিঃশর্ত ও অর্ন্তদৃষ্টির ভিত্তিতে আনুগত্যই হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম ভাষা ।

ওয়াস্সালাম

খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ খামেস

Message of Janab National Amir Sb.

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী

খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণতার শতবর্ষ আমরা দেখেছি দু'চোখ ভরে। দেখেছি তাঁর ক্ষমা, কৃপা ও অপার দয়া। আমরা যতই দুর্বল হই না কেন আমাদের খোদা বড়ই শক্তিশালী। আমরা আমাদের পাপ ও দুর্বলতার জন্য তাঁর সমীপে বিগলিত চিত্তে ক্ষমাপ্রার্থী এবং তাঁর অপার অনুগ্রহের জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ২০১৩ সনে বাংলাদেশের আহমদীরা আনুষ্ঠানিকভাবে এদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী পালন করেছে। বাজামাত তাহাজ্জুদ, নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা, দোয়া, সদকাসহ নানাবিধ আধ্যাত্মিক কর্মসূচির পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, কুরআন প্রদর্শনী, দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্বদের অভ্যর্থনা, কেন্দ্রীয় আর্কাইভ স্থাপন ও মূল স্মারক মসজিদসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ নির্মাণ এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশও এই একই কর্মসূচির একটি অংশ।

বাংলার মাটি ধন্য। ধন্য প্রধানত ৩টি কারণে। ১. ১৯০৬ সনে পরপর দু'বার ইলহামযোগে আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী(আ.)-কে 'বাংলার মনস্তুষ্টি করা হবে' বলে জানিয়েছেন। ২. এ মাটির দুই মহান সন্তান হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাদী(আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে সরাসরি বয়াত করার মহাসৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বনামধন্য আলেম ও বুযুর্গ মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব(রহ.) যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাদী(আ.)-এর সাথে তাঁর জীবদ্দশায় পত্রালাপ করার সৌভাগ্য লাভ করেন যার একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন বারাহীনে আহমদীয়ার ৫ম খণ্ডে অমর হয়ে আছে। এ মাটির সন্তান হিসেবে এসব অমূল্য সৌভাগ্য ও সম্মানের অংশীদার হয়ে আমরাও গর্বিত ও ধন্য। কিন্তু একথাও অকপটে স্বীকার করতে হয় আমাদের যা করার ছিল, যেটুকু অগ্রগতি ও প্রসার লাভের সুযোগ ছিল তদনুযায়ী আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারি নি। কিন্তু 'সাত্তারুল উয়ূব' ও 'গাফফারুয যুনূব' খোদা নিজ অনুগ্রহে আমাদের মত দুর্বলদের তাঁর ছায়ায় পার করে দিচ্ছেন।

স্মরণিকাটি মূলত আগামী প্রজন্মের কাছে দোয়ার জন্য একটি আকুতি। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের আধ্যাত্মিক উচ্চতা ও যোগ্যতা বলে যেসব মহান কাজ সমাধা করে গেছেন তাঁদের জন্য আমরাও দোয়া করছি। আপনারাও দোয়া করবেন। আমরা যৎকিঞ্চিৎ ধর্মসেবায় অংশ নিতে চেষ্টা করেছি মাত্র। এরই কিছু ঝলক স্মরণিকাতে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ কবুল করুন আর আগামী প্রজন্মকে আরও বেশি আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ধর্মসেবার সুযোগ দিন, আমীন। আগামী প্রজন্মের কাছে স্থায়ী দোয়ার আবেদন করে লেখাটি শেষ করছি।

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
ঢাকা, ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৪

যাঁর প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ

Hazrat Hakim Muhammad Hussain Qureishi[ra]

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী(আ.)-এর একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী(রা.) হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যার মাধ্যমে আহমদীয়াতের সংবাদ প্রথম বাংলাদেশে পৌঁছে। ১৯০২ সনের ২৭শে অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারের এডভোকেট মুন্সি দৌলত আহমদ খাঁ লাহোরের হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী(রা.)-এর নিকট মুফাররাহে আম্বারী নামক হেকিমী হালুয়া প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। উর্দূতে এ পত্রটি লিখে দেন মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে হেকিম সাহেব এডভোকেট সাহেবের নিকট ভিপি যোগে প্রেরিত হেকিমী ঔষুধের সাথে হযরত ইমাম মাহ্দী(আ.)-এর শুভাগমনের সুসংবাদসমৃদ্ধ 'তফসীরে সূরা জুমুআ' নামক এক বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেন। এর লেখক ছিলেন হযরত মওলানা হেকিম হাফেয নূরুদ্দীন(রা.), যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল হিসেবে খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন। যোগাযোগের এই সূত্র ধরেই বাংলার মাটিতে আহমদীয়াতের আনুষ্ঠানিক সূচনা। ফাজাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

মূল আকর্ষণ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী (১৯১৩-২০১৩) উপলক্ষে যুগ-খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর

ঐতিহাসিক ভাষণ

১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৯তম বার্ষিক জলসায় হুযূর আকদাস(আই.)-প্রদত্ত সমাপনী ভাষণ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

কলেমা শাহাদাত, তা'উয, তাসমিয়াহ্ ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আক্‌দাস(আই.) বাংলাদেশের আহমদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন:

বাংলাদেশের আহমদীদেরকে শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাই, আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে বাংলাদেশে আহমদীয়াতের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আহমদীয়াতের চারাগাছ যদিও হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর জীবদ্দশাতেই এখানে রোপিত হয়েছিল, কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সৌভাগ্যবান সাহাবীদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দূরে-দূরে বসবাস করার কারণে তখন আনুষ্ঠানিকভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। কিন্তু পূর্ববাংলায় তথা বাংলাদেশে যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর জীবদ্দশাতেই আহমদীয়াতের শুভ সূচনা হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানকার দুই বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব **হযরত আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ সাহেব এবং মৌলভী রইস উদ্দীন খান সাহেব** হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-কে স্বচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন, তাই এই দুই বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিশ্চয় এই দুই বুযুর্গের প্রচেষ্টা আর দোয়ার কারণেই সেখানে ধীরে-ধীরে জামা'ত গড়ে ওঠে এবং প্রথম খিলাফতের যুগে জামা'তের সদস্য সংখ্যা পাঁচশ' ছাড়িয়ে যায়। ১৯১৩ সনে মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়, নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামা'তের ব্যবস্থাপনা সেখানে রূপ লাভ করে।

অতএব বাংলাদেশের প্রত্যেক আহমদীকে মনে রাখতে হবে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার দিক থেকে আপনারা যদিও এবছর দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করছেন কিন্তু এই ভূখণ্ডে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর বাণী পৌঁছানোর দিক থেকে এবং সেখানকার দু'জন বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর হাতে হাত দিয়ে বয়াত করার আঙ্গিকে এই (নতুন) শতাব্দী কয়েক বছর আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে। যাহোক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করা আমি আবশ্যক বলে মনে করেছি যেন আগামী প্রজন্ম এসব বুযুর্গকে স্মরণ রাখে যারা আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি একটু আগেই দু'জন ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেছি এবং একজন মহিলাও ছিলেন। এঁরা দশ বছরের মধ্যে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পাঁচশ'তে উন্নীত করেছিলেন।

১৯১৩ সনে এই সংখ্যা পাঁচশ' ছিল। অর্থাৎ এই তিন ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৭ জন মানুষকে মহানবী(সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাকওয়ার এই মানদণ্ড আর এই প্রচেষ্টা যদি কেবল পাঁচশ' মানুষের মাঝেও বজায় থাকত তাহলে আপনাদের সংখ্যা আজ লক্ষ-লক্ষে উপনীত হবার কথা ছিল। অথচ আপনারা এখন পর্যন্ত হাজার-হাজার-এর কোঠাতেই রয়ে গেছেন। এ কারণেই বর্তমানে আপনাদের বিরুদ্ধবাদীরা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আপনাদেরকে আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে।

অতএব, এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান যেন কেবল আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান না হয় বরং এ অনুষ্ঠান যেন আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করার কারণ হয়। আমরা যেন যাচাই করে দেখি, বিগত একশ' বছরে আমরা কী অর্জন করেছি। গত শতাব্দীতে এমন অনেক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিগত কয়েক বছরেও কোন-কোন অঞ্চলে এমন অনেক সুযোগ এসেছে যখন এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করার সুযোগ ছিল। আমি কল্পনাপ্রসূত কোন কথা বলছি না, বরং আপনাদেরই প্রেরিত বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে বলছি। এখনও সময় আছে, আমাদেরকে ভালভাবে মূল্যায়ন করতে হবে– গত এক শতাব্দীতে আমরা কী অর্জন করেছি আর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কী কর্মসূচি প্রণয়ন করা উচিত। উন্নতি করতে হলে আমাদেরকে এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে কিছু লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আমাদের যেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে জগদ্বাসীর আজ এসবের ভীষণ প্রয়োজন। আর এগুলো লাভ করার জন্য জগতের মানুষ উদ্‌গ্রীব ও উন্মুখ হয়ে আছে। আমাদের লক্ষ্য হল, মহানবী(সা.)-এর দাসত্বে ইসলামের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আগত মহাপুরুষের সাহায্যকারী হিসেবে ইসলামের আকর্ষণীয় ও চমৎকার শিক্ষাকে এর সকল সৌন্দর্যসহ পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়া এবং প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। সেই উদ্দেশ্য হল, বর্তমানে তথাকথিত আলেম-উলামা ও সন্ত্রাসী দলগুলো ইসলামের যে সুন্দর ও সাবলীল শিক্ষাকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় ইসলাম ও মুসলমানদের পৃথিবীতে দুর্নাম করে রেখেছে, সেই শিক্ষাকে এর প্রকৃত সৌন্দর্যসহ জগতের সামনে উপস্থাপন করা। সেই লক্ষ্য হল, সরলমনা জনসাধারণকে আলেম-উলামারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে যেসব ভুল পথে পরিচালিত করছে সেসব ভুল পথ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা। আমাদের সম্মানিত নেতা ও অভিভাবক মহানবী(সা.) সমস্ত জগতের জন্য রহমতস্বরূপ আগমন করেছিলেন, যাঁর দয়ার কোন কূল-কিনারা নেই। কেননা তিনি আল্লাহ্ তা'লার 'রহমান' গুণের প্রকৃত প্রতিবিম্ব ছিলেন। সেই মহান নবী(সা.)-এর দয়া ও অনুগ্রহের বিস্তৃতি ও বিশালতা সম্পর্কে জগদ্বাসীকে অবহিত করতে হবে। কেবল অবহিতকরণ নয় বরং এক গভীর উদ্বেগের সাথে জগদ্বাসীকে সেই রহমতের ছায়াতলে সমবেত করার চেষ্টা করতে হবে। সেই রহমতুল্লিল আলামীন যিনি আপন-পর, শত্রু-মিত্র, মানুষ-পশু নির্বিশেষে সবার জন্য মূর্তিমান দয়া ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ইসলাম-বিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে আরোপিত অপবাদ ও অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদকে জগতে সাব্যস্ত করতে হবে এবং তাঁর একত্ববাদের বিষয়ে জগদ্বাসীর স্বীকৃতি আদায় করতে হবে– এসব হল আমাদের উদ্দেশ্য আর এগুলো হল আমাদের কাজ।

অতএব আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এটি কোন সামান্য বিষয় নয়। এটি বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ত্যাগে অর্জিত হবার মত তুচ্ছ কোন উদ্দেশ্য নয়। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে আমাদের নিজেদের কু-প্রবৃত্তিকেও বিসর্জন দিতে হবে, সম্পদের ত্যাগও স্বীকার করতে হবে আর জীবনের ত্যাগও স্বীকার করতে হবে।

আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশের জামা'ত হচ্ছে সেই জামা'ত যার মাঝে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর এসব উদাহরণ বিদ্যমান। কিন্তু এই উদ্দেশ্যটি এত বিশাল, যে কারণে এটি অর্জন করার জন্য অনেক বড় লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এসব ত্যাগ-তিতিক্ষা পূর্বের তুলনায় আরও অধিকহারে করতে হবে। এমনকি প্রত্যেক আহমদীকে এসবের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। কেবল তখনই আমরা এই উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে পারব বা এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব। নিঃসন্দেহে একদিন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মহানবী(সা.)-এর এই প্রকৃত প্রেমিকের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করবে ইনশা'ল্লাহ তা'লা। কেননা, এটি হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আর আহমদীয়া জামা'তের ১২৫ বছরের ইতিহাসে আল্লাহ তা'লা তাঁর অনেক প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে এভাবে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে যাওয়া এবং অব্যাহত ধারায় তা পূর্ণ করতে থাকা আমাদের জন্য তাঁর অমোঘ বাণী

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِیْ

[কাতাবাল্লাহু লা-আগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলী *(সূরা মুজাদালা: ২২)*]

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'লা শিরোধার্য করে রেখেছেন, আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হব'– এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সন্দিহান হবার কোন অবকাশ বাকী রাখে না। এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ থেকে থাকলে সেটা হল, আমাদের কর্মের দুর্বলতা যেন আমাদের জীবদ্দশায় এসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তাই প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, তারা যেন ব্যাকুল হৃদয়ে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করে।

বাংলাদেশকে এবং বিশ্বকে শান্তির নীড়ে পরিণত করতে চাইলে, নামসর্বস্ব আলেম-উলামা– যারা ধর্মের নামে রক্তপাত করে যাচ্ছে, তাদের কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চাইলে প্রত্যেক আহমদীকে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দেশের মানুষকে অবগত করতে হবে, এসব আলেম-উলামা সাধারণ সরলমনা মানুষকে সাথে নিয়ে যা উপস্থাপন করছে তা ইসলাম নয় বরং ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ।

শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কোন অনুষ্ঠানকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পণ্ড করে দেয়া, জলসাগাহ্ এবং আনুষাঙ্গিক জিনিষ-পত্র পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া বা লুট করে নিয়ে যাওয়া কোন ধরনের ইসলামী শিক্ষা? আক্ষেপ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্যও, যারা এ সবকিছু নির্বাক দর্শকের মত চেয়ে-চেয়ে দেখেছে। পুলিশ প্রশাসন সশস্ত্র অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। যাহোক, আমাদের অভিভাবক, আমাদের আশ্রয় হলেন একমাত্র আল্লাহ। এসব অত্যাচার-অনাচার সত্ত্বেও আহমদীদের সাহস ও আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই আর এসব মোল্লাদের সামনেও এরা নতজানু হবার পাত্র নয় আর সরকারের পক্ষ থেকে কোন কিছু আশাও করে না। আমরা আমাদের অভিভাবকের কাছেই বিনত হই আর খোদা তা'লা যখন অত্যাচারিত-নিপীড়িতদের সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন তখন সকল জাগতিক শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আমরা জানি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং স্বার্থসিদ্ধির কারণে আমাদের যতটা ন্যায়বিচার পাবার কথা ততটা আমরা পাব না। যদিও বাংলাদেশে এখন যেখানে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে সরকার নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে (আল্লাহ তা'লা তাদেরকে নিজ দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য দিন)। কিন্তু যে অঘটন ঘটে গেছে সময়ের বিবর্তনে সে বিষয়ে ধীরে-ধীরে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সুবিচারের সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করা হবে।

অতএব, আহমদীরা যদি সত্যিই ন্যায়বিচার চান সেক্ষেত্রে সমস্ত জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ও প্রতিপালক-প্রভুর কাছে বিনত হন। এসব আলেম-উলামার অপকর্মের দরুন আমাদেরকে যে অন্যায়-অনাচার সহ্য করতে হয়েছে, আমাদের জলসাগাহ্ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে– এটাই আমাদের একমাত্র কষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এ সমস্ত অপকর্ম সত্ত্বেও জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের প্রকৃত কষ্ট হল, এসব অত্যাচার-অনাচার রাহমাতুল্লিল আলামীন(সা.)-এর নাম ভাঙিয়ে করা হয়েছে। আর জগদ্বাসীর সামনে ইসলামকে দুর্নাম করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই অঘটন গোপন রাখা সম্ভব নয়। জগদ্বাসী জানে কী ঘটনা ঘটেছে আর পত্র-পত্রিকাতেও সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে! আহমদীরা সারা বিশ্বে ইসলামের শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যের ও প্রেম-প্রীতির অমোঘ শিক্ষা প্রচার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, আর এসব আলেম-উলামা ইসলামের পবিত্র রূপকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করছে! যাহোক, এরা কখনই তাদের এমন ঘৃণ্য অপচেষ্টায় সফলতা লাভ করতে পারবে না (ইনশা'ল্লাহ তা'লা)। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'লা যে আদেশ দান করেছেন এতে তিনি এমন সব শত্রুর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করার অনুমতি দান করেছেন যারা ইসলামকে উচ্ছেদ করার জন্য এগিয়ে এসেছিল তখনও অনুমতি প্রদানকালে আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ

[উযিনা লিল্লাযীনা ইউকাতালূনা বিআন্নাহুম যুলিমূ। ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাক্বাদীর] (*সূরা হাজ্জ: ৪০*)। অর্থাৎ 'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অন্যায়-অনাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান।' এরপর বলেছেন,

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ

[আল্লাযীনা উখরিজূ মিন দিয়ারিহিম বিগাইরি হাক্বিন ইল্লা আইঁ ইয়াকূলূ রাব্বুনাল্লাহ। *(সূরা হাজ্জ: ৪১)*]। অর্থাৎ 'যাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে কেননা তারা দাবি করে বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক-প্রভু।' আরও বলেছেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۙ

[ওয়া লাও লা দাফউ'ল্লাহিন্নাসা বা'যাহুম বিবা'যিন লাহুদ্দিমাত সাওয়ামিউ' ওয়া বিয়াউওঁ ওয়া সালাওয়াতুওঁ ওয়া মাসাজিদু ইউয্কারু ফীহাসমুল্লাহি কাসীরা। ওয়া লাইয়ান্সুরান্নাল্লাহু মাইঁ ইয়ান্সুরুহু। ইন্নাল্লাহা লাকাভিয়্যুন আযীয] *(সূরা হাজ্জ: ৪১)*। অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'লা মানুষের একাংশকে দিয়ে যদি তাদেরই আরেক অংশকে প্রতিহত না করতেন তাহলে সন্ন্যাসীদের সমস্ত বাসস্থান, গির্জা, ইহুদীদের মঠ এবং মসজিদ– যেগুলোতে আল্লাহর নাম বেশি-বেশি উচ্চারিত হয়– সব ধ্বংস করে দেয়া হত। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।'

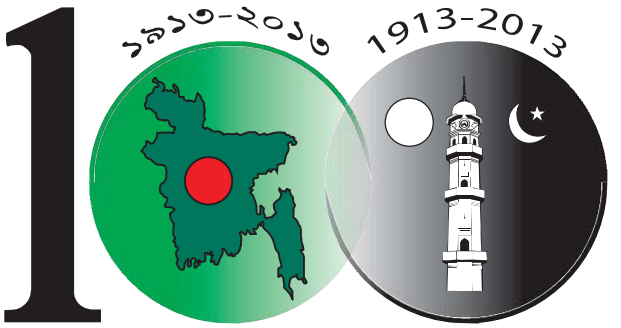

অতএব, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি কেবল অন্যায়-অনাচার থেকে সুরক্ষা লাভের জন্যই দেয়া হয়েছে, অত্যাচারীদের অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য দেয়া হয়েছে– কোন রকম অন্যায়-অত্যাচার করার জন্য দেয়া হয় নি। ইসলামী শিক্ষার আকর্ষণীয় দিকটি হল, এই যুদ্ধের অনুমতি শুধু মুসলমানদের রক্ষার্থেই ছিল না বরং সকল ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'লা বলেন, তিনি এই অত্যাচারিতদের সাহায্যের জন্য সব ধরনের ক্ষমতা রাখেন। কেননা তিনি ক্ষমতাধর এবং মহাপরাক্রমশালী খোদা। অতএব আমরা সকল ক্ষমতার অধিকারী, সকল শক্তির আধার এবং মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপেই বিনত হই, আর সর্বদা তাঁর কাছেই সমর্পিত থাকব, ইনশা'ল্লাহ্। বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশা'ল্লাহ্ তা'লা।

আজ আমরা সংখ্যায় অল্প এবং হে আহমদীয়া-বিরোধী চক্র! এখন তোমাদের যা ইচ্ছে তোমরা তাই করতে পার। কিন্তু মনে রাখবে, এই স্বল্প সংখ্যক মানুষ একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হবে এবং তোমাদের যাবতীয় অন্যায়-অনাচারকে জগৎ থেকে অপসারণ করবে। কিন্তু এই অন্যায়-অত্যাচার দূরীভূত করা কোন ধরনের নির্যাতন নিষ্পেষণের মাধ্যমে হবে না।

অতএব, আহমদীরা নিশ্চিত থাকুন, তথাকথিত এই আলেম-উলামাদের সৃষ্ট এসব দলের অপকর্ম ইতোপূর্বেও কখনও আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি আর আগামীতেও পারবে না। তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার কোন প্রয়োজন নেই। আপাতদৃষ্টিতে ধন-সম্পদের যদি ক্ষতি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে খোদা তা'লা এ ক্ষতি পুষিয়ে দিবেন, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেসব কাজ করণীয় সেগুলোর দিকে মনোযোগী হতে হবে। তাই নিজেদের দায়িত্বাবলী সঠিক ও সুচারূভাবে পালন করতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং তাঁর দরবারে স্থায়ীভাবে সমর্পিত থাকুন। নিজেদের মাঝে পূর্বের চেয়ে বেশি আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করুন। নিজেদের মাঝে উচ্চাঙ্গের চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ তা'লার আদেশ অনুযায়ী কোন দল বা গোষ্ঠীর শত্রুতা যেন আমাদেরকে অবিচারে প্রলুব্ধ না করে। আচরণগতভাবে আমাদের মাঝে যেন এমন বাস্তব বিপ্লব সাধিত হয় যার ফলশ্রুতিতে আমাদের কথা ও কাজে যেন কখনও বৈপরীত্য প্রকাশ না পায়। আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ তা'লাকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারি এবং একই সাথে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকারও যেন আমরা সুনিশ্চিত করতে পারি।

অন্যান্য দেশের আহমদীদের মত বাংলাদেশের আহমদীদেরও আবশ্যিক দায়িত্ব হল, তারা যেন সবার আগে স্বদেশবাসীর প্রাপ্য অধিকার আদায় করার চেষ্টা করে। আর এই প্রচেষ্টা একটি গভীর উদ্বেগের সাথে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদের জন্য নিয়মিত দোয়া করুন। নিজেদের দেশকে চরমপন্থিদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদী যেন নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে। আমি আগেও বলেছি, সরলমনা ও নিরীহ জনগণ নিজেদের সরলতা কিংবা অজ্ঞতার কারণে

এসব আলেমের অনুসরণ করে থাকে। এদেরকে এসব আলেম-উলামার খপ্পর থেকে রক্ষা করতে হবে। তাই এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য চেষ্টা করুন। এই অজ্ঞতা দূরীভূত করার লক্ষ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। মুসলমানদের মাঝে যদি অজ্ঞতা অনুপ্রবেশ না-ই করে থাকে সেক্ষেত্রে হুযূর(আ.)-এর আবির্ভাবের প্রয়োজন কী ছিল? আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এই বিরোধিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর যুগ থেকেই

চলছে। এটি আমাদের জন্য কোন নতুন বিষয় নয়। আর ঐশী জামা'তের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিরোধিতা হয়েই থাকে। কিন্তু এ কারণে তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে পিছপা হয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-কে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে এরা কি কখনও কোন সুযোগ হাতছাড়া করেছিল? কিন্তু প্রতিটি কষ্ট ও পরীক্ষার পর উন্নতি ও সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। পরবর্তীতে 'দ্বিতীয় কুদরতের' প্রকাশকালে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর খিলাফত যুগের সূচনা হল তখন আহমদীয়াতের বিরোধীরা কী-না করেছে? আহমদীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য এরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। দ্বিতীয় খলীফার যুগে আহমদীয়াতের প্রতিটি ইট খুলে নেয়ার দাবিদাররা পরিণামে আমাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির নতুন-নতুন পথই উন্মুক্ত করে গেল, যার ফলশ্রুতিতে এই জামা'ত হিন্দুস্তানের সীমানা ছাড়িয়ে বহিঃর্বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। তৃতীয় খলীফার যুগে পাকিস্তানে সাংবিধানিক মারপ্যাঁচে আহমদীদের ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত করার চেষ্টা করা হলে আহমদীয়াত বিশ্বে আরও বেশি প্রসার লাভ করে। জগৎ-পূজারী সরকার সাংবিধানিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে অথবা আইনের চাহিদা পূরণে আমাদের মুসলমান ঘোষণার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু আমাদের মন থেকে কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**-র প্রতি বিশ্বাস কখনও মুছে ফেলতে পারবে না। অবশেষে চতুর্থ খলীফার যুগে স্বৈরশাসকরা আরও কঠোর আইনী বিধি-নিষেধ আরোপ করার অপচেষ্টা চালায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে(রাহে.)-এর হিজরতের ফলশ্রুতিতে আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি ও সমৃদ্ধির গতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য সব কল্যাণের মাঝে সে যুগে 'এমটিএ' (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া)-র প্রবর্তনও একটি, যার ফলশ্রুতিতে আহমদীয়াতের বাণী পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশে পৌঁছানো সম্ভব হয়। বর্তমানে বিশ্বের খুব কম অঞ্চলই এমন হবে যেখানে এমটিএ সম্প্রচারিত হয় না। ডিশ এন্টেনার সাইজ বড় করে দেয়া হলে বলা যায়, পৃথিবীর সকল প্রান্তেই এই বাণী পৌঁছাচ্ছে। আমাদের পরস্পরকে দেখা এবং জলসার বক্তৃতাগুলোর সরাসরি সম্প্রচার এখন আমাদের জন্য সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে সহস্র-সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করেও আমি বাঙালিদের– অর্থাৎ, আপনাদেরকে দেখছি আর আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। পরস্পরকে দেখা এবং জলসার বক্তৃতাগুলো সরাসরি শোনায় এখন আমরা অভ্যস্থ। বর্তমানে আহমদীয়াত পৃথিবীর প্রায় ২০২টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এমটিএ-তে যে বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় এ থেকে শুধু যে বাংলাদেশের ও পশ্চিম বাংলার এবং অন্যান্য দেশের বাঙালি আহমদীরাই উপকৃত হচ্ছেন তা কিন্তু নয়, বরং অ-আহমদীরাও এ থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

আজ বাংলাদেশে যদি আহমদীয়াতের বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে এক বড় ধরনের উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছেন। অতএব, আপনারাও নব উদ্যমে এই অসাধারণ উন্নতির অংশ হবার চেষ্টা করুন। আমি আগেও বলেছি, বাংলাদেশ সরকার সম্ভবত বড় কোন স্বার্থে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু তাদের অন্তরে এতটুকু সদগুণ অবশ্যই রয়েছে যার ফলে এরা আমাদের প্রতি কিছুটা হলেও সহমর্মিতা রাখে। একইভাবে সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমগুলোও আমাদের জন্য সহানুভূতি রাখে আর এঁরা আমাদের জলসায় অংশগ্রহণও করে থাকে। তাই এদিক থেকে আমাদের উচিত তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অপরদিকে দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসার দায়িত্ব পালন করে তাঁদেরকে অবগত করা প্রয়োজন, আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বিরোধিতা শুধু এই জামা'ত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আগামীতে এরাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। শুধু তাই নয়, দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে এরা হুমকি-স্বরূপ। অতএব আমরা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসার প্রেরণায়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলছি, এসব উগ্রপন্থিদের কবল থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এখনই কার্যকর পরিকল্পনা হাতে নিন।

বাকি থাকল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রসঙ্গ! এ বিষয়ে আমি আগেই বলে দিয়েছি, আমাদের জন্য প্রতিটি বিরোধিতা সার হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক বিরোধিতার পর আহমদীয়াতের বাগান ফুলে-ফলে আরও বেশি সুশোভিত হয়। বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের ধারণায় আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এসব করেছে, আমাদের জলসা বন্ধ করার জন্য এসব করেছে, আমাদেরকে হতাশ করে দেয়ার জন্য এসব করেছে। কিন্তু এরা জানে না, আমরা 'মুহাম্মদী মসীহ্'-কে মান্য করেছি যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা 'আখারীন' (পরবর্তী)-দের মাঝে গণ্য করে মহাসম্মানে ভূষিত করেছেন। আর 'আউয়ালীন' (পূর্ববর্তী)-দের যেসব পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন এদেরকেও তা–ই প্রদান করেছেন। আর 'আউয়ালীন'-রা যে অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন সেই একই অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এরাও দিনাতিপাত করছে। ধর্মের উদ্দেশ্যে আজ কেবল আহমদীরাই জীবন, সম্পদ ও সময় বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা অঞ্চলে যতদিন এসব কুরবানী দেয়ার প্রয়োজন হবে আহমদীরা তা দিতে থাকবে, ইনশা'ল্লাহ্ তা'লা।

"ধর্মের উদ্দেশ্যে আজ কেবল আহমদীরাই জীবন, সম্পদ ও সময় বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা অঞ্চলে যতদিন এসব কুরবানী দেয়ার প্রয়োজন হবে আহমদীরা তা দিতে থাকবে, ইনশা'ল্লাহ্ তা'লা।"

লন্ডনের মসজিদ বাইতুল ফুতূহ্-এর তাহের হল থেকে বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে ভাষণরত আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা

বাংলাদেশ প্রান্তে জলসায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জলসায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জলসায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

অতএব, হে বাংলাদেশের আহমদীরা! বিরুদ্ধবাদীদের এসব ঘৃণ্য অপচেষ্টায় তোমরা ভীত হবে না, নিরাশও হবে না। বিরোধিতার এই ঝড়ো বাতাস তোমাদেরকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য প্রদানের জন্য প্রবাহিত হচ্ছে। এ সুযোগকে কাজে লাগাও। পূর্বের চেয়ে আরও বেশি আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে উপলব্ধি কর। মহানবী(সা.)-এর প্রেমে আগের চেয়ে বেশি বিলীন হয়ে যাও। জাগতিক সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর প্রতি ভালবাসাকে প্রাধান্য দাও। কেননা, এগুলো তোমাদের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে দিবে। এ যুগে তোমাদের পক্ষ থেকে ত্যাগ-তিতিক্ষার যে বিরল উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে এগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে। নৈরাশ্যকে নিজেদের ধারে-কাছেও ভিড়তে দিবে না। এক নব উদ্যমের সাথে তোমরা নিজ-নিজ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা কর!!

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন। আপনাদেরকে আপনাদের সকল মহৎ উদ্দেশ্যে সফল করুন। দেশের অনিষ্টকারী ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের এবং ক্ষতিসাধনকারী অন্যান্য অপশক্তিগুলোকেও নিঃশেষ করার উপকরণ সৃষ্টি করুন যেন দেশের উন্নতি অব্যাহত থাকে।

দেশবাসীর কাছে আপনাদের দেশপ্রেম এবং আপনাদের প্রকৃত মুসলমান হবার বিষয়টি যেন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের আহমদীয়াতের এই দ্বিতীয় শতাব্দী সীমাহীন কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনুক। আল্লাহ্ করুন–এমনই যেন হয়। আপনারা যারা দূর-দূরান্ত থেকে জলসার উদ্দেশ্যে এসেছেন আল্লাহ্ তা'লা যেন নিরাপদে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেন আর নিজ-নিজ অঞ্চলে আহমদীয়া-বিরোধীদের আক্রমণ এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনাদের রক্ষা করুন। এখানে অবস্থানকালে ও ফিরতি পথে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হাফেয ও নাসের হোন, আমীন। এখন চলুন আমরা দোয়া করে নিই। (দোয়ার মাধ্যমে বক্তব্য শেষ হয়)।

[হুযূর(আই.)-এর এই ঐতিহাসিক ভাষণটি এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২/০৪/১৩ তারিখে প্রকাশিত]

উল্লেখ্য, হুযূর(আই.)-এর এই ভাষণের মাত্র পাঁচ দিন আগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জলসা মৌচাকস্থ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী গ্রাউন্ডে আয়োজন করা হয়েছিল। প্যান্ডেল এবং সামিয়ানা ও অন্যান্য প্রস্তুতি শেষ হবার পর আকস্মাৎ বিরুদ্ধবাদীরা আগুন লাগিয়ে জলসাগাহ্ ভস্মীভূত করে দেয়। -সম্পাদক

ফিরে দেখা

বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষের তথ্যপুঞ্জী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

১৯০২

১। ২৭ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারের এডভোকেট মুন্সি দৌলত আহমদ খাঁ লাহোরের হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী(রা.)-এর নিকট মুফাররাহে আম্বারী নামক হেকিমী হালুয়া প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। উর্দু ভাষায় লিখিত এ পত্রটি লিখে দেন **মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ**(রাহে.)।

২। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে হেকিম সাহেব এডভোকেট সাহেবের নিকট ভিপি যোগে প্রেরিত হেকিমী হালুয়ার সাথে হযরত ইমাম মাহদী(আ.) জাহির হওয়ার সুসংবাদের তথ্যসমৃদ্ধ 'তফসিরে সূরা জুমুআ' নামক এক বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেন। এর লেখক হযরত মওলানা হেকিম হাফেজ নূরুদ্দীন(রা.)। যিনি পরবর্তীকালে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল হিসেবে খিলাফতের মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন।

১৯০৪

১। **হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ(রা.)** কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর হাতে ১৯০৪ কিংবা ১৯০৫ সালে বয়াত করেন। তিনি প্রথম বাঙালি আহমদী।

১৯০৫

১। দিল্লীর গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের আদেশ জারী করেন।

১৯০৬

১। ১১ ফেব্রুয়ারি হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর উপর ইলহাম হয়– ইতোপূর্বে বাংলা সম্মন্ধে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল, এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে (তাজকেরা)।

২। **হযরত রইস উদ্দিন খাঁ(রা.)** হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর হাতে কাদিয়ানে বয়াত করেন। তিনি দ্বিতীয় বাঙালি আহমদী।

১৯০৭

১। **সৈয়দা আজিজাতুন নেসা সাহেবা** হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর নিকট পত্রের মাধ্যমে বয়াত করেন। তিনি হযরত রইস উদ্দিন খাঁ(রা.)-এর সহধর্মিণী ছিলেন।

২। হযরত আহমদ কবীর নুর মোহাম্মদ(রা.)-এর জীবনের মোখালেফাতের ঘটনা কাদিয়ানের বদর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯০৮

১। হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রাহে.) ১৯০২ সাল থেকে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার উপর গবেষণায় প্রাথমিক অবস্থায় হযরত ঈসা(আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তাই বিরুদ্ধবাদী মওলানাদের সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ঈদগাহ ময়দানে বাহাস করেন।

১৯০৯

১। **খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী** কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হাতে বয়াত করেন।

১৯১০

১। ১৩ অক্টোবর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল(রা.) কাদিয়ানে ১২ জন যুবকের উপস্থিতিতে ভ্রাতৃ সংঘ (BROTHERS HOOD) গঠন করেন। এতে বাঙালি যুবক মৌলভী মোবারক আলী সদস্য হন।

১৯১১

১। ১১ ডিসেম্বর দিল্লীতে এক শাহী দরবারে বঙ্গভঙ্গের আদেশ রহিত করার ফরমান জারি হয়।

১৯১২

১। ১৪ অক্টোবর হযরত মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ(রাহে.) ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তাঁর তিন জন সফরসঙ্গী নিয়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সঙ্গীরা হলেন- (১) মৌলভী এমদাদ আলী চৌধুরী, (২) ক্বারী দেলওয়ার আলী এবং (৩) মুন্সি ধনু মিঞা।

২। ৮ নভেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল(রা.)-এর হাতে মওলানা সাহেব সফরসঙ্গীসহ বয়াত করেন।

৩। ২৫ নভেম্বর থেকে হযরত মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বয়াত গ্রহণ শুরু করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল(রা.) তাঁকে দাস্তি বয়াতের (হাতে হাত রেখে বয়াত) অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৯১৩

১। ২৪ মার্চ কাদিয়ান থেকে বিশিষ্ট সাহাবীর একটি প্রতিনিধিদল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আগমন করেন। সেই বুযুর্গগণ হলেন– (১) হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ(রা.), (২) হযরত মওলানা গোলাম রসুল রাজেকী(রা.), (৩) হযরত মৌলভী মোবারক আলী সিয়ালকোটি(রা.), (৪) হযরত মীর কাশেম আলী খাঁ(রা.), সম্পাদক আল-ফারুক কাদিয়ান, আল-হক দিল্লী, (৫) হযরত হাফেজ রৌশন আলী(রা.) এবং (৬) হযরত মৌলভী আবু ইউসুফ(রা.)। প্রথম জন ছিলেন প্রতিনিধি দলের আমীর।

হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)

২। হযরত ড. মুফতি মোহাম্মদ সাদেক(রা.)-এর উপস্থিতিতে এবং তাঁর তত্তাবধানে 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া' গঠিত হয়। এটা অবিভক্ত বাংলায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। এ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এবং জেনারেল সেক্রেটারি এডভোকেট মুন্সি দৌলত আহমদ খাঁ।

৩। আখাউড়ার খরমপুরের গোলাম মাওলা খাদেম সাহেব কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল(রা.)-এর হাতে বয়াত করেন।

১৯১৪

১। হযরত ইমাম মাহ্দী(আ.)-এর জাহির হওয়ার সুসংবাদ সম্বলিত বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞাপন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয়। মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের দিক-নির্দেশনায় সে সময় কিংবা পরে বিজ্ঞাপন লেখার কাজ করেন মুন্সি সাবের আলী চৌধুরী, মৌলভী আজিজ উদ্দিন আহমদ এবং উকিল আউসাফ আলী প্রমুখ।

২। হযরত হাফেজ রৌশন আলী(রা.)-কে নিয়ে খান সাহেব মোবারক আলী বঙ্গদেশের বিভিন্ন শহরে তবলীগি সফর করেন।

৩। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.) কাদিয়ানে জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণে মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের তবলীগি কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। উক্ত ভাষণটি 'মানসাবে খিলাফত' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯১৫

১। জানুয়ারি মাসে খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)-এর হাতে বয়াত করেন।

২। চট্টগ্রাম শহরে খান বাহাদুর এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেবের বাড়িতে চার দিনব্যাপী তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মওলানা খলিল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেব।

১৯১৬

১। চট্টগ্রামের প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব বয়াত করেন।

২। এপ্রিল মাসে কাদিয়ান থেকে চট্টগ্রামে আগমন করেন– হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ(রা.), হযরত মওলানা চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়্যাল(রা.) এবং হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান মিশরী(রা.)। তাদের অবস্থানরত ঘরে বিরুদ্ধবাদীরা ২৯ এপ্রিল রাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

৩। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। আমীর নিযুক্ত হন মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। এ জামা'তের বিস্তৃতি ছিল পূর্ববঙ্গ, আসাম এবং কোলকাতা শহর ব্যতিত পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল।

৪। আমারতের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী। তাঁর অধীনে চারজন বিভাগীয় সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তাঁরা হলেন– তালিম তরবিয়ত সেক্রেটারি মৌলভী গিয়াসউদ্দিন আহমদ মাষ্টার, সেক্রেটারি তবলীগ ও ইশায়াত মীর সেকান্দর আলী, সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি উকিল আউসাফ আলী এবং অর্থ সেক্রেটারি মৌলভী এমদাদ আলী চৌধুরী।

৫। কোলকাতা সিটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জামা'তের প্রথম আমীর ছিলেন মৌলভী লুৎফর রহমান সাহেব।

৬। 'বেঙ্গল ইয়ংম্যান'স আহমদীয়া এসোসিয়েশন' ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গঠিত হয়।

৭। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের বাইরে তারুয়া, ক্রোড়া, নাগেরগাও, দিগদাইড় (বগুড়া) প্রভৃতি স্থানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। শুভ সমাচার -লেখক : সৈয়দ সাঈদ আহমদ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৯১৭

১। 'ইসলামের জয় মসীহ্ ও মাহদী(আ.)-এর সমাগম' -লেখক : মৌলভী গিয়াস উদ্দিন আহমদ মাস্টার, পূণ্য আহ্বান-লেখক : খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, কুহলুল এরফান (উর্দূ ভাষায়) -লেখক : মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ এবং 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে বঙ্গানুবাদ করেন মুন্সি সাবের আলী চৌধুরী পুস্তক প্রকাশিত হয়।

২। বিভিন্ন পাড়া ও গ্রামে জামা'তের ইমাম নিয়োগ করা হয়। তখন স্থানীয় জামা'তের প্রধানকে ইমাম বলা হত।

৩। ১৯-২১ অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গনে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তখন জলসা সাধারণত দুর্গাপূজার ছুটির অবকাশে সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হত।

১৯১৮

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। কোলকাতার হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ বয়াত করেন।

১৯১৯

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। হযরত মোহাম্মদ ইব্রাহীম বাকাপুরী(রা.) তবলীগি সফরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আগমন করেন।

১৯২০

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চতুর্থ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থানীয় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী মিশনারি হিসেবে লন্ডন গমন করেন।

১৯২১

১। ফেব্রুয়ারি থেকে ত্রৈ-মাসিক 'আল বুশরা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চারটি সংখ্যা প্রকাশের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এটিই প্রথম প্রকাশিত মুখপত্র।

২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পঞ্চম সালানা জলসা অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। মহিলারা প্রথম বঙ্গীয় জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

৩। সেপ্টেম্বর মাসে হযরত রইস উদ্দিন খাঁ(রা.) ইন্তেকাল করেন।

৪। সত্য সোপান- লেখক : মৌলভী আজিজ উদ্দিন আহমদ এবং আহমদ চরিত -অনুবাদক : আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দিন হায়দার প্রকাশিত হয়।

১৯২২

১। জানুয়ারি থেকে কোলকাতা হতে 'মাসিক আহমদীয়া বুলেটিন' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন চিফ সেক্রেটারি খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী।

২। বেঙ্গল ইয়ংম্যান'স আহমদীয়া এসোসিয়েশন পুনঃগঠিত হয় এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় এর প্রধান দপ্তর স্থানান্তর করা হয়।

৩। খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী প্রথম মিশনারি হিসেবে জার্মানিতে গমন করেন।

৪। আহমদী মহিলারা প্রথম ঈদের নামাযে (ঈদুল আযহা) শরীক হন।

৫। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসুদেব গ্রামের মৌলভী হায়দার আলী ভূঞার স্ত্রীর মৃত্যুতে স্থানীয় কবর স্থানে কবর দিতে মোখালেফাত সৃষ্টি হয়। পরে মামলার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ষষ্ঠ সালানা জলসা ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২৩

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সপ্তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ কোলকাতা জামা'তের দ্বিতীয় আমীর নিযুক্ত হন।

১৯২৪

১। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাইতলা নিবাসী হাজী আব্দুল করীম সাহেবের উপর প্রচণ্ড মোখালেফাত হয়। পরে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

২। ৯-১১ অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

অষ্টম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শেষ দিন মহিলাদের অধিবেশন হয়।
৩। 'আল হেদায়াত' নামে পত্রিকা ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ সাঈদ আহমদ।
৪। 'ওফাতে মসীহ' -লেখক : মৌলভী মোহাম্মদ আজিম উদ্দিন প্রকাশিত হয়।

১৯২৫

১। মে মাস থেকে আহমদীয়া বুলেটিন মাসিক আহমদী হিসেবে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম এবং ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নবম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.) লন্ডনে যে ভাষণ প্রদান করেন তা 'আহমদীয়া মতবাদ' নামে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক: আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দিন হায়দার।
৪। মৌলভী আব্দুল গফুর ও মৌলভী গোলাম আহমদ বদুমলি বঙ্গদেশে আগমন করেন।

১৯২৬

প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান

১। ১৮ মার্চ হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রাহে.) ইন্তেকাল করেন।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর নিযুক্ত হন প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান।
৩। বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দশম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৪। বঙ্গীয় জামা'তে লোকসংখ্যা ১২০০ জন, জামা'তের সংখ্যা ২৬টি এবং আয় তিন হাজার টাকা মাত্র।
৫। হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কুরাইশী(রা.) এবং হযরত মালিক গোলাম ফরিদ(রা.) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শুভাগমন করেন।
৬। কাট মোল্লার দুঃসাহস -লেখক : মৌলভী আজিজ উদ্দিন আহমদ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৯২৭

১। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.) হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী(রা.) -কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোবাল্লেগ হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জামা'তের বিশেষ সেবা করেছেন।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জামা'তের এগারতম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। কাদিয়ানী বাচালতা নামক পুস্তিকার প্রতিবাদ –লেখক : সৈয়দ সাঈদ আহমদ প্রকাশিত হয়।

১৯২৮

১। ২০ মে সুফি মতিউর রহমান বাঙালি মিশনারি হিসেবে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জামা'তের বারোতম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। নেহেরু রিপোর্ট ও মুসলমান –লেখক : দৌলত আহমদ খান খাদেম প্রকাশিত হয়।
৪। মৌলভী আব্দুল মুগনি খাঁ বঙ্গদেশে আগমন করেন।
৫। হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী(রা.) চট্টগ্রামে টাউন হলে তবলীগি সভায় বক্তৃতা প্রদানের সময় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমনে আহত হন। এটা সম্ভবত ১৯২৮-১৯৩০ সালের ঘটনা।

১৯২৯

১। বঙ্গীয় জামা'তের তেরতম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। তারুয়া জামা'তের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। হেকিম মওলানা খলিল আহমদ মুঙ্গেরী বঙ্গদেশে আগমন করেন।

১৯৩০

১। কংগ্রেস ও মোসলেম সমাজ নং ১-অনুবাদক : আল্লামা জিল্লুর রহমান প্রকাশিত হয়।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩১

১। ৩০ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় দ্বিতীয় আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান ইন্তেকাল করেন।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। চশমায়ে মসীহ্ -অনুবাদক : মৌলভী মোহাম্মদ আজিম উদ্দিন প্রকাশিত হয়।

১৯৩২

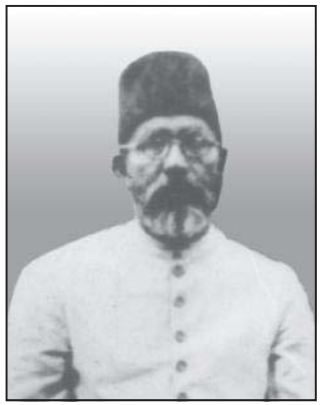
হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ

১। হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ বঙ্গীয় জামা'তের তৃতীয় আমীর নিযুক্ত হন।
২। হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর আবির্ভাব –লেখক আল্লামা জিল্লুর রহমান প্রকাশিত হয়।
৩। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩

১। সমস্যা ও সমাধান –লেখক : মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর আবির্ভাবের সময় অতীত –লেখক : সৈয়দ সাঈদ আহমদ প্রকাশিত হয়।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.) বাঙালিদের উদ্দেশ্যে এক বাণী প্রেরণ করেন এবং **সাহেবযাদা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ(রা.)**-এর শুভাগমন হয়।

১৯৩৪

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

১। হায় নাদির শাহ কোথায়? -অনুবাদক : দৌলত আহমদ খান খাদেম প্রকাশিত হয়।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চতুর্থ আমীর নিযুক্ত হন।

১৯৩৫

১। জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত চিহ্ন –লেখক : মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান এবং প্রীতি সম্ভাষণ ও কোয়েটার ভূমিকম্প পুস্তক প্রকাশিত হয়।

২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। মওলানা আব্দুর রহিম নাইয়ার ও মওলানা খলিল আহমদ মুঙ্গেরী বঙ্গদেশ সফরে আসেন।

১৯৩৬

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হেডকোয়ার্টার্স ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় এবং মাসিক আহমদী কোলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।
২। ২৮-৩০ অক্টোবর বঙ্গীয় ২০তম জলসা অন্নদা হাই স্কুল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন মহিলাদের অধিবেশন হয়। খান সাহেব আলহাজ্জ ফরজন্দ আলী এ জলসায় আগমন করেন।
৩। সুফি আব্দুল কাদির, মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী বঙ্গদেশে সফরে আসেন।
৪। হাজী সাহেবের ফতোয়া –লেখক : আবুল আসেম খান চৌধুরী, উপহার –লেখক : আল্লামা জিল্লুর রহমান, Qadian and the Ahmadies –লেখক : খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী প্রকাশিত হয়।
৫। বঙ্গীয় জামা'তের অধীনে মসজিদের সংখ্যা ৭টি।

১৯৩৭

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনে স্থানীয় জামা'তের সংখ্যা ৩৫টি।
২। হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর আগমন –অনুবাদক : রৌশন এবং মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ প্রকাশিত হয়।
৩। মার্চ মাসে কোলকাতায় শ্রী রাম কৃষ্ণের Centenary উপলক্ষে Parliament of Religions নামে সাতদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। আল্লামা জিল্লুর রহমান আহমদীয়া জামা'তের পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা প্রদান করেন।
৪। ৪ সেপ্টেম্বর হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ প্রাক্তন বঙ্গীয় আমীর ইন্তেকাল করেন।
৫। বকশী বাজার দারুত তবলীগে হোমিও দাতব্য চিকিৎসা চালু করা হয়।
৬। ১৪-১৬ অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ২১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব শুভাগমন করেন।

১৯৩৮

১। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মাসিক আহমদী পাক্ষিক আহমদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
২। ১৫ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া গঠিত হয়। এর প্রেসিডেন্ট বা সদর নিযুক্ত হন সৈয়দ সাঈদ আহমদ।
৩। ৫ অক্টোবর মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক জামা'ত ছয়টি জেলা আঞ্জুমানে বিভক্ত করা হয়।
৪। ৬-৮ অক্টোবর মসজিদুল মাহদী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রাঙ্গনে ২২তম বঙ্গীয় জামা'তের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় সর্বপ্রথম জামা'তের পতাকা উত্তোলন করা হয়।
৫। মওলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ ও আব্দুর রহিম নাইয়ার আগমন করেন।
৬। কিশতিয়ে নুহ –অনুবাদক : আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি, আল ওসিয়্যাত –অনুবাদক : এ. এইচ. এম. আলী আনোয়ার, যুগবতার –লেখক : মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী, মহানবী হযরত মোহাম্মদ(সা.) –লেখক : মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী প্রকাশিত হয়।
৭। মওলানা মোহাম্মদ সেলিম সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত এক বাহাসের অনুষ্ঠানে দুই দিনব্যাপী অনবরত ১৮ ঘণ্টা আরবী ভাষায় বক্তৃতা করেন।
৮। বঙ্গদেশে ৪০টি জামা'ত এবং ২৭টি জেলার মধ্যে ২৩ জেলায় আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে।
৯। মসজিদুল মাহদী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংস্কার করা হয়।

১৯৩৯

১। আহমদীয়া জামা'তের ধর্মবিশ্বাস ও কর্তব্য –লেখক : আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি, আসমানী আওয়াজ বা স্বর্গের ডাক –লেখক : আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি এবং খিলাফত জুবিলী ফান্ড –লেখক : খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী প্রকাশিত হয়।
২। ২৭-২৯ অক্টোবর বঙ্গীয় ২৩তম জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.)-কে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত জুবিলী জলসায় একটি অভিনন্দন পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে সে অভিনন্দন পত্রটি গৃহীত হয়।

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

৩। স্থানীয় জামা'তের সংখ্যা ৪৩টি।

১৯৪০

১। হাদীসুল মাহদী –লেখক : আল্লামা জিল্লুর রহমান প্রকাশিত হয়।
২। ১ মে খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী বঙ্গীয় আমীর হিসেবে যোগদান করেন।
৩। বঙ্গীয় ২৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪১

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জামা'তের ২৫তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪২

১। ফতেহ ইসলাম –অনুবাদক : আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি প্রকাশিত হয়।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ২৬তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৩

১। মহা সমরের অবসানে এবং হাদিসের দোয়া –লেখক : আল্লামা জিল্লুর রহমান, পয়গামে সুলেহ –অনুবাদক : আল্লামা জিল্লুর রহমান প্রকাশিত হয়।
২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জামা'তের ২৭তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৪

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ২৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৫

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ২৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৬

১। ২৩ জানুয়ারি ঢাকার বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগের ভূমি খরিদ করা হয়।
২। ১৭ জুন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী কাদিয়ানে ইন্তেকাল করেন।
৩। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৪। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় বকশী বাজার দারুত তবলীগে বিরুদ্ধবাদীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১৯৪৭

১। আখেরী জামানার হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর আবির্ভাব –লেখক : দৌলত আহমদ খান খাদেম প্রকাশিত হয়।
২। অবিভক্ত বাংলায় পঞ্চাশটি জামা'ত ছিল। তন্মধ্যে ৩৫টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ১৫টি পশ্চিমবঙ্গে। আহমদীর সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে চার হাজার এবং পশ্চিমবঙ্গে এক হাজার।
৩। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.) বলেন– যদি বাঙালিদের উপর উর্দুকে চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে দেশটি পৃথক হয়ে যাবে। কেননা সেখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। *(দৈনিক*

আল-ফযল: ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭)।

১৯৪৮

১। তাজাল্লিয়াতে ইলাহীয়া– অর্থাৎ ঐশী বিকাশ –অনুবাদক : মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব প্রকাশিত হয়।
২। ওফাতে ঈসা (আ.) –লেখক : মৌলভী মোহাম্মদ প্রকাশিত হয়।

১৯৪৯

মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ

১। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। ৪ ডিসেম্বর মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর হিসেবে যোগদান করেন।
৩। আহমদীয়াতের পয়গাম- অনুবাদক : মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ প্রকাশিত হয়।

১৯৫০

১। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫১

১। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৩তম সালানা জলসা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এটা ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সালানা জলসা। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় জলসা ঢাকায় অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে।

১৯৫২

১। মৌলভী জালাল উদ্দিন শামস ও মৌলভী আব্দুর রহিম দর্দ পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আসেন।
২। ওহী হামারা কৃষ্ণ– অর্থাৎ, তিনিই আমাদের কৃষ্ণ –অনুবাদক : মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী, পাকিস্তান কোন পথে- –লেখক : মৌলভী বদরউদ্দিন আহমদ, জরুরতুল ইমাম –অনুবাদক : মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, মুসলিম লীগের খেদমতে কতিপয় নিবেদন –অনুবাদক : আল্লামা জিল্লুর রহমান, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামা'তের দান –অনুবাদক : আল্লামা জিল্লুর রহমান, খাতামান নবীঈন –লেখক : মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ প্রকাশিত হয়।

১৯৫৩

১। মৌলভী মোহাম্মদ ওমর শর্মা ও মৌলভী মোহাম্মদ আজমত এদেশে সফরে আসেন।
২। ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪

১। মওলানা মাওদুদী ও আহমদীয়া জামা'ত : লেখক মওলানা মমতাজ আহমদ প্রকাশিত হয়।
২। মওলানা রহমত আলী সাহেব বিদেশী মিশনারি এদেশে সফরে আসেন।
৩। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৫

ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোরশেদ আহমদ বাজওয়া

১। নেজামে বায়তুল মাল –অনুবাদক : দৌলত আহমদ খান খাদেম প্রকাশিত হয়।
২। ৩০ অক্টোবর সুফি মতিউর রহমান বাঙালি রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন।
৩। মোহতরম ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোরশেদ আহমদ বাজওয়া পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর হিসেবে যোগদান করেন।
৪। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৬

১। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

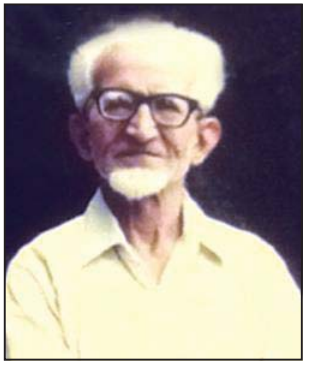

শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব

১৯৫৭

১। মোসলেহ মাওউদ –লেখক : মোহাম্মদ মোস্তফা আলী প্রকাশিত হয়।
২। মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর নিযুক্ত হন।
৩। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৮

১। ২৪-২৬ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৯

১। ২০-২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)-এর ঢাকায় শুভাগমন হয়।
৩। নজমুল মাহদী –লেখক : মৌলভী মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ প্রকাশিত হয়।

১৯৬০

১। ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.) এবং মওলানা আবুল আতা জলন্ধরীর শুভাগমন হয়।
৩। নামায শিক্ষা ও বাগে আহমদ- লেখক : এএইচএম আলী আনোয়ার প্রকাশিত হয়।

১৯৬১

১৯৬১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)

১। ২১-২৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪২ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.) এবং মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এদেশে সফরে আসেন।
৩। তাহরিকে জাদিদের সার কথা –অনুবাদক : মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব প্রকাশিত হয়।

১৯৬১ সালে উথলীতে অন্যান্যদের মাঝে হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)

৪। মহাসুসংবাদ- লেখক : মৌলভী আহসান উল্লাহ সিকদার প্রকাশিত হয়।

১৯৬২

১। ১৪-১৬ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিছন সারিতে দাঁড়ানো ১. মৌলভী সলিমউল্লাহ; ২. জনাব ফরিদ আহমদ; ৩. জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস; সামনের চেয়ারে বসা– ১. হযরত কুদরত উল্লাহ সানোরী(রা.) এবং ২. মওলানা ফারুক আহমদ

৪৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– (১) হযরত কুদরত উল্লাহ সানোরী(রা.), (২) হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.), (৩) মওলানা জালাল উদ্দিন শামস, (৪) আব্দুল হক রামা, (৫) চৌধুরী জহুর আহমদ, (৬) মির্যা মোবারক আহমদ এবং (৭) সৈয়দ দাউদ আহমদ সাহেব।

৩। হযরত কুদরত উল্লাহ সানোরী(রা.) এর নিকট আহমদনগরে ইলহাম হয়– ইযা জাআ নাসরুল্লাহে ওয়াল ফাতহু।

৪। মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর নিযুক্ত হন।

৫। ৪-৫ নভেম্বর ব্রাহ্মবাড়িয়ায় লোকনাথ ট্যাংকের পাড় পূর্ব পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

৬। কলেমা দর্শন– লেখক : মৌলভী মোহাম্মদ– প্রকাশিত হয়।

৭। আহমদীর সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে ছয় হাজার এবং জামা'তের সংখ্যা ৭০টি।

১৯৬৩

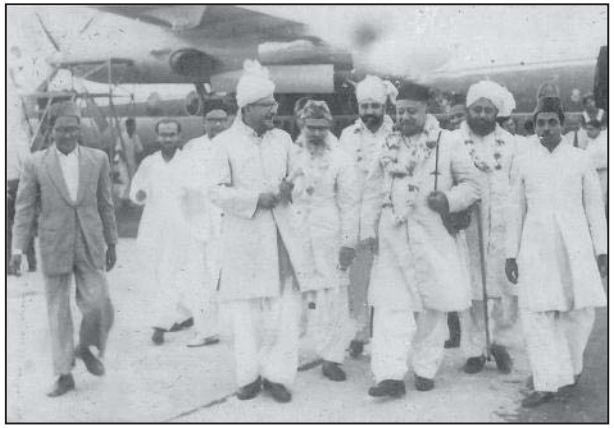

১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অন্যান্য আহমদীদের মাঝে হযরত মির্যা নাসের আহমদ(রাহে.)

১। ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– (১) সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.), (২) বিচারপতি শেখ বশির আহমদ, (৩) মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, (৪) শেখ মোবারক আহমদ, (৫) চৌধুরী জহুর আহমদ এবং (৬) মাহমুদ আহমদ আনোয়ার হায়দারাবাদী সাহেব।

৩। ২-৩ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

৪। ৩-৪ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া জামা'তের ৪৭তম সালানা জলসা ৩ নভেম্বর বাদ মাগরিব থেকে শুরু হলে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে। ফলে মোহাম্মদ ওসমান গনি ও আব্দুর রহিম শহীদ হন এবং শতাধিক আহত হয়।

৫। রাহে ইমান- অনুবাদক : মৌলভী এএইচএম আলী আনোয়ার– প্রকাশিত হয়।

১৯৬৪

১। ৬ মার্চ আল্লামা জিল্লুর রহমান এবং ১২ মে আবু মোহাম্মদ হোসাম উদ্দীন হায়দার ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৫

১। ৫-৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– (১) মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, (২) মোহতরম শেখ মোবারক আহমদ এবং (৩) মির্যা আব্দুল হক সাহেব।

৩। আমাদের শিক্ষা- অনুবাদক : আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি প্রকাশিত হয়।

১৯৬৬

১। ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– (১) সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.), (২) তাঁর সহধর্মিণী আসেফা বেগম সাহেবা, (৩) মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, (৪) মির্যা আব্দুল হক, (৫) মওলানা মোহাম্মদ সাদেক এবং (৬) শেখ মোবারক আহমদ।

৩। ১১ ফেব্রুয়ারি বকশী বাজার দারুত তবলীগে দ্বিতল পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)।

১৯৬৭

১। ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২। রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– (১) সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), (২) মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এবং (৩) মওলানা শেখ মোবারক আহমদ।

৩। সুন্দরবন জামা'তের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

৪। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসজিদে মোবারক পাকা করার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।
৫। মজলিসে আনসারুল্লাহর প্রোগ্রামে রাবওয়া থেকে সফরে আসেন– (১) কাজী মোহাম্মদ নাজির আহমদ, (২) ফজল আহমদ এবং (৩) সাব্বির আহমদ সাহেব।
৬। মোহাম্মদী মসীহ (আ.)- লেখক : মৌলভী মোহম্মদ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৮

১। ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসজিদে মোবারক (পাকা মসজিদ) উদ্বোধন করা হয়।
২। ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– মোহতরম মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সদর মুরুব্বী এবং কাজী মোহাম্মদ নাজির আহমদ নাযের ইসলাহ ও এরশাদ।
৪। হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফর উল্লা খান(রা.) ঢাকায় আগমন করেন।

১৯৬৯

১। সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.) পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আসেন।
২। ১ নভেম্বর খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী ইন্তেকাল করেন।

১৯৭০

১। ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– (১) মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, সদর মুরুব্বী এবং (২) কাজী মোহাম্মদ নাজির আহমদ, নাযের ইসলাহ ও এরশাদ।
৩। মিশনারি ইনচার্জ আমেরিকা আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালিকে আমেরিকার ক্লিভল্যান্ডের মেয়র Key of City of Cleaveland উপহার প্রদান করেন।

১৯৭১

১। ২৬ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর বাঙালিদের মনস্তুষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী পুনরায় পূর্ণতা লাভ করে।

১৯৭২

১। ১৬ মে মোহতরম আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি আমেরিকার মিশনারি ইনচার্জ আমেরিকায় ইন্তেকাল করেন।

১৯৭৩

১। ৬-৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা। তখন রাবওয়ার সাথে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না বিধায় কাদিয়ান থেকে মোহতরম মির্যা ওয়াসিম আহমদ এক পয়গাম প্রেরণ করেন।

১৯৭৪

১। ৬-৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫১তম জলসা।
২। পাকিস্তানের ভুট্টো সরকার আহমদীদের অমুসলমান ঘোষণা করে নির্যাতন শুরু করলে তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব এর প্রতিবাদে মেমোরেন্ডাম রচনা করে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট এবং জাতিসংঘে প্রেরণ করেন।

১৯৭৫

১। ১৪-১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসা। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।

১৯৭৬

১। ৫-৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৩তম সালানা জলসা। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস(রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।

১৯৭৭

১। ৪-৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৪তম সালানা জলসা। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস(রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।
২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস(রাহে.) বাংলাদেশী আহমদীদের উদ্দেশ্যে বলেন- আপনারা যদি ধনী হতে চান জামা'তে বেশি করে চাঁদা দিন।
৩। ইসলামী নীতি দর্শন-অনুবাদক : এএইচএম আলী আনোয়ার প্রকাশিত হয়।

১৯৭৮

১। ৩-৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৫তম সালানা জলসা। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।
২। লাহোর হাইকোর্টের রায়– জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসি।
৩। বকশী বাজার দারুত তবলীগের মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হয়।

১৯৭৯

১। ৯-১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে

১৯৭৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনে স্থানীয় আহমদীদের মাঝে সর্বজনাব ১. মৌলভী মোহাম্মদ; ২. চৌধুরী জহুর আহমদ; ৩. মির্যা আব্দুল হক; ৪. মওলানা আব্দুল মালেক খান এবং ৫. এডভোকেট মুজিবুর রহমান।

আহমদীয়ার ৫৬তম সালানা জলসা।
২। রাবওয়া থেকে জলসায় স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শুভাগমন করেন– (১) মোহতরম এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, (২) মওলানা আব্দুল মালেক খান, (৩) চৌধুরী জহুর আহমদ এবং (৪) এডভোকেট মুজিবুর রহমান।
৩। বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবে মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি নিযুক্ত হন।

১৯৮০

১। ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭তম সালানা জলসা। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস(রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।
২। রাবওয়া থেকে জলসায় শুভাগমন করেন– (১) মোহতরম এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক, (২) মওলানা আব্দুল মালেক খান এবং (৩) চৌধুরী সাব্বির আহমদ।

১৯৮১

১। প্রফেসর আব্দুস সালাম সাহেব বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি ১৮ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জামা'তের মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
২। ৮-১০ মে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৮তম সালানা জলসা। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।
৩। বাংলাদেশ জামা'তের শুরায় রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন– (১) মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, (২) মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ এবং (৩) এডভোকেট

মুজিবুর রহমান।
৪। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিমরাইলকান্দীস্থ পৌর কবর স্থানে আহমদীদের কবর দিতে বিরাট মোখালেফাত সৃষ্টি হয় এবং তা কয়েক বছর পর্যন্ত বিরাজ করে।

১৯৮২

১। ঢাকা দারুত তবলীগে রাতে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে। এতে ২৫/৩০ জন আহত হন।
২। বাংলাদেশ জামা'তের ৫৯তম সালানা জলসা ১২-১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হুযুর সালেস(রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।
৩। জলসায় রাবওয়া থেকে আসেন মোহতরম চৌধুরী আহমদ মোখতার, করাচী জামা'তের আমীর।

১৯৮৩

১। বাংলাদেশ জামা'তের ৬০তম সালানা জলসা ৪-৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।
২। রাবওয়া থেকে জলসায় আসেন– (১) মোহতরম মির্যা আব্দুল হক, (২) মওলানা মাহমুদ আহমদ এবং (৩) মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ।

১৯৮৪

১। বাংলাদেশ জামা'তের ৬১তম সালানা জলসা ৯-১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।
২। রাবওয়া থেকে জলসায় আসেন-(১) মির্যা আব্দুল হক, (২) মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার এবং (৩) মওলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ।
৩। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার চাঁনতারা গ্রামে আহমদীদের উপর আক্রমণ হয়। মসজিদ দখল করে ক্লাব তৈরী করে।

১৯৮৫

১। বাংলাদেশ জামা'তের ৬২তম সালানা জলসা ১-৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।
২। রাবওয়া থেকে জলসায় আসেন (১) এডভোকেট চৌধুরী আনোয়ার হোসেন, (২) চৌধুরী সাব্বীর আহমদ এবং (৩) মির্যা মোহাম্মদ দিন নাজ।
৩। বাংলাদেশের ঘূর্ণি দুর্গতদের সাহায্যার্থে রাষ্ট্রপতির ত্রাণ তহবিলে এক হাজার ষ্টার্লিং পাউন্ডের একটি চেক আহমদীয়া জামা'ত লন্ডনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের লন্ডনস্থ দুতাবাসের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ জামা'তের পক্ষ থেকেও বিশ হাজার টাকা দান করা হয়।
৪। আহমদীয়া জামা'তের প্রকাশিত 'ইসলামেই নবুওয়াত' পুস্তক সরকার বাজেয়াপ্ত করে।
৫। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর গ্রামের উত্তর মহল্লার আহমদীদের বয়কট করে পানি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তা মাসাধিককাল বিরাজ করে।

১৯৮৬

১। ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৬৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হুযূর রাবে(রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন।
২। রাবওয়া থেকে জলসায় আসেন– (১) মোহতরম মির্যা আব্দুল হক, (২) এডভোকেট মুজিবুর রহমান এবং (৩) বশির আহমদ তারেক।
৩। ১৮ ডিসেম্বর চাঁনতারা মজলিসের কায়েদ মোহাম্মদ ইব্রাহীম হোসেনকে মারধর করা হয়।

১৯৮৭

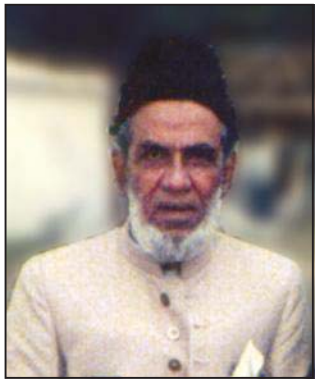
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব

১। ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৬৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। রাবওয়া থেকে জলসায় যোগদান করেন হাফেজ মোজাফফর আহমদ ও এডভোকেট মালিক মাহমুদ মজিদ।
৩। ২৭ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদ মোবারক বিরুদ্ধবাদীরা দখল করে নেয়। স্থানীয় আহমদীদের বাড়িতে আক্রমণ করে মালামাল লুটপাট করা হয়। পুলিশসহ প্রায় ২০ জন আহত হন।
৪। ঘাটুরা, খড়মপুর, শালগাঁও, বিষ্ণুপুর ও ভাদুঘর জামা'তের মসজিদ জোরপূর্বক দখল করে নেয়া হয়। শালগাঁও ও কালীসীমা গ্রামের ১২টি বাড়িতে আক্রমণ করে এবং তাদের জমি থেকে ফসল কাটায় বাধা সৃষ্টি করা হয়। নাটাই জামা'তের আহমদীদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়।
৫। ২৯মে নাটোর জেলার পুরুলিয়া জামা'তের ৪ জন আহমদীকে ধরে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হয়।
৬। ২২ জুন মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর নিযুক্ত হন।
৭। ২৬ আগস্ট টাঙ্গাইলে বন্যার্তদের নিকট রিলিফ বিতরণে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা মামলায় আহমদীয়া জামা'তের পাঁচ জন কারাবরণ করেন।
৮। ৫ অক্টোবর মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব আহমদনগরে ইন্তেকাল করেন।

১৯৮৮

১। ১৮-২০ মার্চ বাংলাদেশ জামা'তের ৬৫তম সালানা জলসার কর্মসূচি গ্রহণের পর রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে স্থগিত করা হয়।
২। ১০ সেপ্টেম্বর বন্যার্তদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বাংলাদেশ জামা'ত থেকে এক লক্ষ টাকা দান করা হয়।
৩। ১৮ সেপ্টেম্বর হুযূর রাবে(রাহে.) জুমুআর খুতবায় বাংলাদেশে মোখালেফাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন জামা'তের মসজিদ বেদখল হওয়ার কারণে আর কোন মসজিদ হাত ছাড়া না হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন।
৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) মুবাহেলার চ্যালেঞ্জ দেন এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মৃত্যু হয়।

১৯৮৯

১। আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন উপলক্ষে ৩১ মার্চ-৩ এপ্রিল ৪ দিনব্যাপী বাংলাদেশ জামা'তের ৬৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। জামালপুর সরিষাবাড়িতে ঈদের দিন বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদের উপর আক্রমণ করে।
৩। প্রথমবারের মত আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা এটা বাজেয়াপ্ত করার জন্য মোকদ্দমা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়।
৪। এদেশে স্থানীয় জামা'তের সংখ্যা ৯৩টি।
৫। দেশব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী (১৮৮৯-১৯৮৯) পালিত হয়।

১৯৯০

১। ২-৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৬৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) বাণী প্রেরণ করেন।
২। রাবওয়া থেকে মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ও মওলানা মাহমুদ আহমদ জলসায় আসেন।
৩। ৫ মার্চ হুযূর রাবে(রাহে.) এক পত্রে বলেন, আল্লাহ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন- বাংলাদেশে যত পরিবর্তন আসবে তা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

১৯৯১

১। ৮-১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৬৭তম সালানা

জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর রাবে(রাহে.) বাণী প্রেরণ করেন।
২। জলসায় রাবওয়া থেকে আসেন মোহতরম চৌধুরী সাব্বির আহমদ এবং মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন।
৩। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মুখপত্র মাসিক আহ্বান এর প্রকাশনা জুন মাস থেকে শুরু হয়।
৪। চাঁদপুরের চরদুখিয়া গ্রামে বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদের মসজিদ দখল ও বাড়িতে আগুন দেয় এবং শেরপুর জেলার বকশীগঞ্জে আহমদীদের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয় ।
৫। বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মওলানা ওবায়দুর হক জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহমদীদেরকে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণা করার দাবি জানান।

১৯৯২

১। ৭-৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৬৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

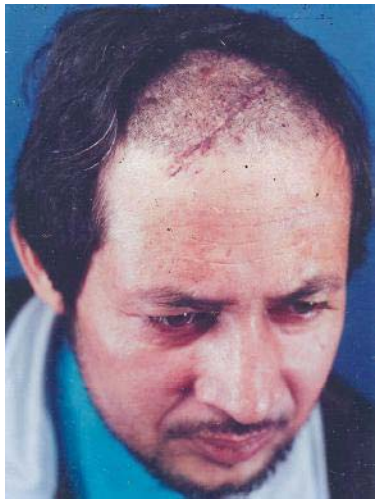

২৯ অক্টোবর ১৯৯২ তারিখ দারুত তবলীগে আক্রমণে আহত জনাব কাওসার আহমদ

২৯ অক্টোবর ১৯৯২ তারিখ দারুত তবলীগে আক্রমণে ভস্মিভূত পবিত্র কুরআনসহ মূল্যবান বই-পুস্তক

২। ২৯ ফেব্রুয়ারি খুলনা মসজিদে বিরুদ্ধবাদীরা হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। লাইব্রেরী লুট ও গাড়ির ক্ষতি সাধন করা হয়।
৩। ২৯ অক্টোবর ৪ নম্বর বকশী বাজার রোড দারুত তবলীগে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে। ৭৫ বছরের পুরাতন লাইব্রেরী ও জামা'তের অফিস কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআন শরীফ ও জামা'তের মূল্যবান পুস্তক এবং মাইক্রোবাসসহ কোটি টাকার সম্পদ ভস্মীভূত করা হয়। এতে ৩৫ জন আহত হন।
৪। ২৭ নভেম্বর রাজশাহীতে নির্মাণাধীন মসজিদে আক্রমণ করে এবং মসজিদ নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং মালামাল লুট করা হয়।

১৯৯৩

১। ১০-১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৬৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) ১২ ফেব্রুয়ারি জুমুআর খুতবায় লন্ডন মসজিদ থেকে উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। এটি এমটিএ-মাধ্যমে বাংলাদেশ জলসায় হুযুর(রাহে.)-এর প্রথম ভাষণ।
২। জাতীয় সংসদে মওলানা মতিউর রহমান নিজামী কুক্ষাত ব্লাসফেমী আইন পাশের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।
৩। আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার জন্যে সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়। পরে কোর্ট তা খারিজ করে দেয়।
৪। ২৪ ডিসেম্বর মজলিসে তাহফফুজে খতমে নবুওয়াত ও জামা'তে ইসলামী ঢাকার মানিক মিঞা এভিনিউতে এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করে আহমদীদের অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানায়। এতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস উপস্থিত হওয়ার কর্মসূচি থাকলেও তিনি দেশের বুদ্ধিজীবিদের সমালোচনায় উপস্থিত হননি।

১৯৯৪

১। ৭ জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন ১২ ঘন্টা করে MTA অনুষ্ঠানমালা শুরু হয় এবং এর মধ্যে এক ঘন্টা বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়।
২। ৪-৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আহমদীয়া জামা'তের ৭০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। ৩১ মে জামালপুরের বকশীগঞ্জে দুই জন মোয়াল্লেমকে মারধর করা হয়।
৪। ৬ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া জামা'তকে অমুসলমান করার আন্দোলনের বিরুদ্ধে আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়।
৫। আমরা ঢাকাবাসী সংগঠন আহমদীদের অমুসলমান ঘোষণার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করে।
৬। আহমদী বিরোধীরা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সাপ নিয়ে মিছিল করে। তারা বকশী বাজার দারুত তবলীগে বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। ২৫ নভেম্বর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)-এর কুশপুত্তলিকা দাহ করার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং হরতাল পালনের ঘোষণা করে।
৭। মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ থেকে ত্রৈমাসিক আনসারুল্লাহ্ বুলেটিন প্রকাশনা শুরু হয়।

১৯৯৫

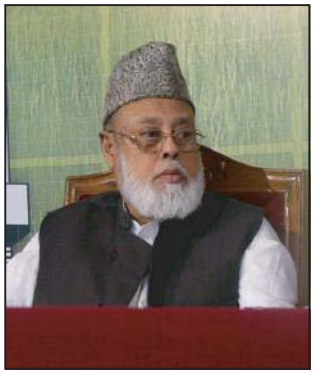

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

১। ২০-২২ জানুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৭১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। ৩১ মার্চ আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণার দাবিতে মানিক মিঞা এভিনিউতে মহাসমাবেশ করা হয়।
৩। ২১ মে আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর নিযুক্ত হন।
৪। ২১ মে জামা'তের কাজে সড়ক দুর্ঘটনায় জনাব এটিএম হক ও মোহাম্মদ মোস্তফা আলী নান্নু শাহাদত বরণ করেন।

আমরা ঢাকাবাসী কর্তৃক বকশী বাজার দারুত তবলীগ দখল করার কর্মসূচির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মৌলবাদবিরোধী সংগঠন মিছিল বের করে

৫। ২৯ জুন আমরা ঢাকাবাসী নামে মোল্লাদের এক লাঠিয়াল বাহিনী বকশী বাজার দারুত তবলীগ দখল করার ঘোষণা দেয়। দেশের সুশীল সমাজের অনেকে এর প্রতিবাদ জানায়। বুদ্ধিজীবিরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করে এবং তারা মিছিল করে বকশী বাজার এসে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

১৯৯৬

১। ৫-৬ জানুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৭২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় চৌধুরী মোবারক মুসলেহ উদ্দীন আহমদ সাহেব আগমন করেন।
৩। ইসলামগঞ্জ জামা'তে আহমদীদের উপর মোখালেফাত সৃষ্টি করা হয়।

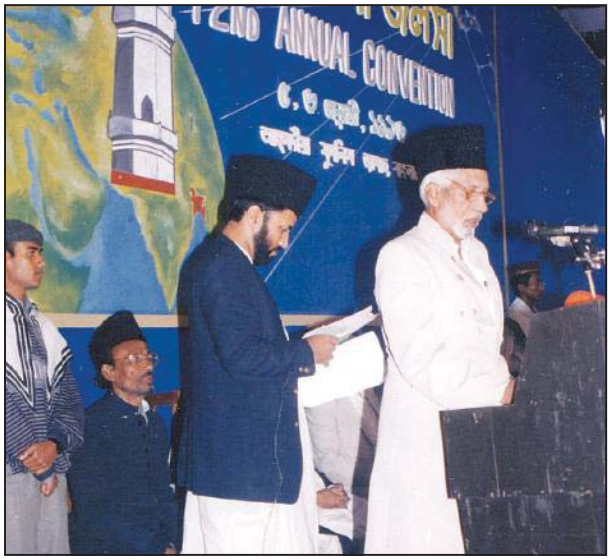

৭২তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় হযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি চৌধুরী মোবারক মুসলেহ উদ্দীন আহমদ ভাষণ দিচ্ছেন

৪। বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মওলানা ওবায়দুল হককে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে।
৫। ৯ জুলাই MTA বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে তৈরী অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়।
৬। ৬ অক্টোবর সরিষাবাড়ীতে আহমদীদের বাড়ি লুটতরাজ ও ভাংচুর করা হয়।

১৯৯৭

আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব

১। ৩-৫ জানুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৭৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। জলসায় হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।
৩। ৩১ মে আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর নিযুক্ত হন।
৪। ৩ জুলাই আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার দাবিতে জাতীয় সংসদের স্পিকারের নিকট বিরুদ্ধবাদীরা স্মারকলিপি পেশ করে।

১৯৯৮

১। ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৭৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর রাবে(রাহে.) এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সরাসরি জলসায় উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন।
২। জলসায় হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হাই।
৩। ৫ জুলাই গাইবান্ধা জেলার পূর্ব মদনপাড়া মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। এক আহমদীর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।
৪। ৬ জুলাই শেরপুর জেলার রাংটিয়া গ্রামে আহমদীয়া মসজিদ ভেঙে নদীতে ফেলে দেয়া হয়।
৫। ২২ জুলাই মংলায় আহমদীদের উপর আক্রমণ হয় এবং নামাযঘর ধ্বংস করে।
৬। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যায় প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর পক্ষ থেকে এক লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করা হয়।

১৯৯৯

১। ৭ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার নাসেরাবাদ জামা'তের মসজিদ ভাংচুর এবং আহমদীদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়। এতে ৫০ জন আহত হন।
২। ৫-৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৭৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। হুযূর রাবে(রাহে.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় আগমন করেন– মোহতরম মওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন।
৪। ১০ জুন নিলফামারীর চড়াইখোলার মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়।
৫। ২৪ সেপ্টেম্বর তাহাফফুজে খতমে নবুয়াত পল্টন ময়দানে আহমদীদের আস্তানা ধ্বংস করার ঘোষণা দেয়।
৬। ৮ অক্টোবর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ করে সাত জন নামাযীকে শহীদ করা হয়। মসজিদের ইমাম মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকীসহ ৩০ জন আহত হন এবং অনেকে পঙ্গু হয়ে যান।
৭। ১০ অক্টোবর ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদে দু'টি শক্তিশালী বোমা পেতে রাখা হয়। আল্লাহ্ তা'লার মহিমায় বিস্ফোরণের পূর্বেই তা দৃষ্টিগোচর হয়। সেনাবাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞরা এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
৮। ১৫ অক্টোবর, ১৩ নভেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর নাটোরের আহমদীয়া মসজিদে আক্রমণ করে অনেককে মারধর করা হয়। মসজিদ ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।
৯। বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ কর্তৃক ষান্মাসিক লাজনা ইমাইল্লাহ্ বুলেটিন প্রকাশনা শুরু হয়।

২০০০

১। ৪-৬ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৭৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। জলসায় হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন মোহতরম রাজা নাসির আহমদ।
৩। ১২ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ক্রোড়া জামা'তের মসজিদ দখল এবং ক্রোড়া ও বাসুদেব গ্রামের আহমদীদের বাড়িতে লুটপাট, মারধর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ৮ মে মসজিদের দখল ছেড়ে দেয়।

২০০১

১। ৯-১১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৭৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
২। সৈয়দপুরের মেনানগর ও সাতক্ষীরার খেলাডাঙ্গায় আহমদীদের উপর আক্রমণ হয় এবং অনেকে আহত হন।
৩। ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ হাইকোর্ট রায় প্রদান করে।
৪। ২৪ জুন জামালপুর আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ ভাংচুর করে।

২০০২

১। জানুয়ারি থেকে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর

যাত্রা শুরু হয়। প্রথম প্রিন্সিপাল মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ।
২। ৬-৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৭৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। হুযূরের প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় আগমন করেন সুলতান মাহমুদ আনোয়ার।
৪। ১১ মে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুরে জামা'তের তবলীগি বিজ্ঞাপন বিতরণ করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খাদেম মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান ও মোহাম্মদ তৌফিক সরকার আহত হন এবং তাঁরা তিন দিন থানা ও জেল হাজতে ছিলেন।
৫। ২৮ মে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহ.) বলেন, বাঙালি আহমদীরা উন্নত দেশে হিজরত করুন, যেন আর্থিকভাবে সমৃদ্ধশালী হন।

২০০৩

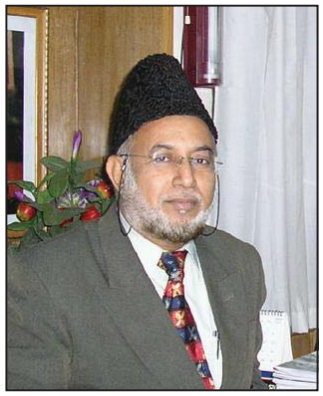
মোবাশশেরউর রহমান সাহেব

১। ৩ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করার দাবি করা হয়।
২। ৫-৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৭৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
৩। জলসায় হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে মোহতরম সৈয়দ কমর সোলায়মান আগমন করেন।
৪। ২১ মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর নিযুক্ত হন মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব।
৫। ২১ অক্টোবর থেকে কুষ্টিয়া জেলার উত্তর ভবানীপুর জামা'তে মোখালেফাত সৃষ্টি হয়। ১৭টি আহমদী পরিবারকে একমাস অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। তাদের জমির ফসল কেটে নিয়ে যায়।
৬। ৩১ অক্টোবর যশোরের রঘুনাথপুরবাগ জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহতরম মোহাম্মদ শাহ আলম এর উপর আক্রমণ করে তাঁকে শহীদ করা হয় এবং ১০ জন আহত হন। তিনি পঞ্চম খিলাফতের প্রথম শহীদ হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।
৭। ২১ নভেম্বর খতমে নবুওয়াত সংগঠনের নেতৃত্বে হাজার হাজার বিরুদ্ধবাদী নাখালপাড়া মসজিদ দখল করতে আসে। পুলিশ তা প্রতিহত করে। এতে ১৭ জন পুলিশসহ ১৫০ জন আহত হন। এর নেতৃত্বে ছিলেন মৌলভী মাহমুদুল হাসান মোমতাজী।
৮। ৫ ডিসেম্বর নাখালপাড়া মসজিদ দখলের জন্য অনুরূপভাবে পুনরায় আক্রমণ করা হয়।

২০০৪

১। ৮ জানুয়ারি সরকার জামা'তের প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। পবিত্র কুরআনসহ অনেকগুলি পুস্তক ও পাক্ষিক আহমদী প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।
২। ১১ জানুয়ারি আহমদীয়া জামা'তের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য প্রদান করেন।
৩। ১৬-১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮০তম সালানা জলসা। এ জলসায় সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।
৪। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় আগমন করেন মোহতরম নওয়াব মনসুর আহমদ খান।
৫। ১৯ মার্চ বিরুদ্ধবাদীরা বরগুনার কুকুয়া, কৃষ্ণনগর ও খাকদান জামা'তের তিনটি মসজিদ দখলের চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়।
৬। ৯ জানুয়ারি ও ১৭ এপ্রিল খতমে নবুওয়াত সংগঠনের নেতৃত্বে ঢাকার নাখালপাড়া মসজিদ দখলের জন্য আক্রমণ করে। পরে পুলিশ তা প্রতিহত করে। ১৭ এপ্রিল মসজিদ হতে পবিত্র কুরআন ও হাদিস গ্রন্থ পুলিশ নিয়ে আন্দোলনকারীদের হাতে তুলে দেয়।
৭। ১২ মে বিরুদ্ধবাদীরা পটুয়াখালীর মসজিদ দখলের চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এডিসি এসে মসজিদ থেকে পবিত্র কুরআন ও হাদিস জব্দকরে নিয়ে যায়। মসজিদে সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়- 'পটুয়াখালীস্থ কাদিয়ানী উপাসনালয়, কোন মুসলমান মসজিদ মনে করে ধোঁকায় পড়বেন না।'
৮। ১৩ মে রংপুরের বদরগঞ্জে মৌলবাদীরা আক্রমণ করে আটটি আহমদী পরিবারের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।
৯। ২৮ মে চট্টগ্রাম জামা'তের মসজিদ দখল করতে চেষ্টা করে বিরুদ্ধবাদীরা ব্যর্থ হয়। পরে মসজিদে কাদিয়ানী উপাসনালয় সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেয়।
১০। ৭ ও ১৩ আগষ্ট খুলনায় মৌলবাদীরা আমাদের মসজিদ দখল করতে আসে। তারা কাফন মিছিল করে। পরে মসজিদে কাদিয়ানী উপাসনালয় সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেয়।
১১। ২৭ আগস্ট বকশী বাজার দারুত তবলীগ দখল করতে বিরাট মিছিল আসে। গেটের সামনে ইট, পাথর ও লাঠি মারে। পুলিশের হস্তক্ষেপে তা প্রতিহত হয়।
১২। ৮ অক্টোবর বিরুদ্ধবাদীরা নারায়ণগঞ্জ জামা'তের মসজিদ দখল করতে আক্রমণ করে। পরে পুলিশ ও বি.ডি.আর.-এর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হয়।
১৩। ২৯ অক্টোবর বিরুদ্ধবাদীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর মসজিদে আক্রমণ করে। ফলে ১৫ জন নারী-পুরুষ আহত হন।
১৪। ৫ নভেম্বর নাখালপাড়া মসজিদ দখলের জন্য পুনরায় আক্রমণ করলে পুলিশ তা প্রতিহত করে। তখন নাখালপাড়া মসজিদে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছয়টি দেশের

৫ নভেম্বর ২০০৪ নাখালপাড়া মসজিদে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৬টি দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন

রাষ্ট্রদূতরা এসে আহমদীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে। এছাড়া বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনও উপস্থিত হয়ে একাত্মতা জানান এবং প্রতিবাদ করে।
১৫। ২০ ডিসেম্বর প্রকাশনা নিষেধাজ্ঞার উপর হাইকোর্টে রিট করা হয়। ৬টি মানবাধিকার সংগঠন এবং আহমদীয়া জামা'তের পক্ষে জনাব এ. কে. রেজাউল করিম রিট দাখিল করেন। পরে নিষেধাজ্ঞা স্থগিত হয়।

২০০৫

১। ৬ জানুয়ারি রাতে একদল সশস্ত্র বিরুদ্ধবাদী নাখালপাড়া মসজিদে পুনরায় আক্রমণ করে। পুলিশের বাধার মুখে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। পরদিন রহিম মেটাল

বগুড়া আহমদীয়া কমপ্লেক্সের সামনে পুলিশ কর্তৃক সাইনবোর্ড লাগানো হচ্ছে

মসজিদ থেকে আবার মিছিল আসে এবং কাদিয়ানী উপাসনালয় সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর চেষ্টা করে। কিন্তু প্রশাসনের বাধার কারণে পারে নাই।

২। ১৪ জানুয়ারি বগুড়ায় বিরুদ্ধবাদীরা বিরাট মিছিল করে আমাদের মসজিদ দখল করতে আসে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাধা সৃষ্টি হয়। তখন তারা কমপ্লেক্সের সামনে 'এটা কাদিয়ানী উপাসনালয়, ধোঁকায় পরে কেউ আসবেন না' লেখা সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেয়।

৩। ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৮১তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

৪। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় আগমন করেন মওলানা ফিরোজ আলম।

৫। ১৭ এপ্রিল খতমে নবুওয়াতের নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক সুন্দরবন জামা'তের মসজিদ এবং আহমদীদের বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালায়। ফলে নারী-পুরুষ অনেকে গুরুতর আহত হন।

৬। ২৪ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদে এবং এর পার্শ্বে টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলে টিনের তৈরী মসজিদের কিছু অংশ আগুনে পুড়ে যায়।

৭। ১০ আগস্ট মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর ইন্তেকাল করেন।

৮। ১৫ আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘরে রাতে টাইম বোমা বিস্ফোরণে হোসেনা বেগম নামে এক আহমদী মহিলার হাত উড়ে যায়।

২০০৬

১। ১০-১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮২তম সালানা জলসা। সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

২। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় যোগদান করেন মওলানা ফিরোজ আলম।

৩। ১৬ জুন নাখালপাড়া মসজিদ দখল ও সরকারি ভাবে অমুসলমান ঘোষণার দাবিতে বিরুদ্ধবাদীরা সমাবেশ করে।

৪। ২৩ জুন ঢাকার আশকোনায় নির্মাণাধীন মসজিদে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে ভেঙ্গে ফেলে।

২০০৭

১। ৯-১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮৩তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.) বাণী প্রেরণ করেন। বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল আমীরগণ শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

২। হুযুর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় আগমন করেন মওলানা মাহমুদ আহমদ, আমীর এবং মিশনারি ইনচার্জ, অস্ট্রেলিয়া।

৩। ১২ মে মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর ইন্তেকাল করেন।

৪। বাংলাদেশের উপকূলে ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত আনে। হুযূর(আই.)-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ তহবিলে দশ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ জামা'ত এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট থেকে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

৫। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোখালেফাতের কারণে ২১ বছর জলসা বন্ধ থাকার পর ২১ ফেব্রুয়ারি ৬১তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৮

১। ১-৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জামা'তের ৮৪তম সালানা জলসা। এ জলসায় সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

২। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় আগমন করেন মওলানা মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব।

৩। ২৭ মে আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী সারা দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পালিত হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং তাদেরকে স্মারক উপহার প্রদান করা হয়। সেদিন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে আন্তর্জাতিকভাবে লন্ডনে জলসা শুরু হয়। এটা এমটিএ-এর মাধ্যমে একযোগে প্রচারিত হয়। ঢাকার দারুত তবলীগের জলসার শ্রোতারা তা শ্রবণ করেন এবং হুযূর(আই.)-এর সাথে অঙ্গীকারনামা পাঠ ও দোয়া করেন।

৪। এদেশে স্থানীয় জামা'তের সংখ্যা ৯৯টি। তমধ্যে ৭টি স্থানীয় জামা'তে আমারত কায়েম আছে।

২০০৯

১। ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৮৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা প্রথমবারের মত ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি দেখানো হয় এবং সমাপ্তি অধিবেশনে হুযূর(আই.) সরাসরি MTA-এর মাধ্যমে সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

২। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় কাদিয়ান থেকে আগমন করেন মওলানা এনাম ঘৌরী।

৩। বাংলাদেশের উপকূলে সামুদ্রিক ঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে আহমদীয়া জামা'ত ত্রাণ বিতরণ করে।

৪। MTA-তে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' ২৯ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর প্রথমবার শুরু হয়।

২০১০

১। ৫-৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৮৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি সমাপ্তি অধিবেশনে হুযূর(আই.)-এমটিএ এর মাধ্যমে সরাসরি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। জলসায় সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

২। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন।

৩। ৭ আগস্ট টাঙ্গাইল জেলার চাঁনতারায় সশস্ত্র বিরোধীরা মসজিদে আক্রমণ করে ভেঙ্গে ফেলে। মসজিদ ও আহমদীদের বাড়িঘরে লুটপাট করে। এতে তিন জন গুরুতর আহত হন।

২০১১

১। ৬-৮ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৮৭তম সালানা জলসা গাজীপুরের রোভার স্কাউটস ট্রেনিং ক্যাম্পে শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে হুযূর(আই.) ইউ.কে. থেকে সরাসরি এমটিএ-এর মাধ্যমে ভাষণ প্রদান করেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের বাধার কারণে প্রশাসন জলসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ফলে পরের দুই দিনের জলসা বকশী বাজার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়।

২। এ জলসায় হুযূর(আই.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে শুভাগমন করেন মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন। বিভিন্ন দেশে থেকে আহমদীরা আসেন এবং বক্তব্য রাখেন। সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান

১৪ অক্টোবর ২০১১ চট্টগ্রাম বাঁশখালীর আসীরানে রাহে মাওলা ৪ জন, ১. আলহাজ্জ শাহাবুদ্দিন খালেদ; ২. মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন; ৩. সৈয়দ আমিন আহমদ ও ৪. মোহাম্মদ আলী

করেন।
৩। চট্টগ্রামের বাশখালীতে বিরুদ্ধবাদীদের দাবির প্রক্ষিতে ৪ জন আহমদীকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়।

২০১২

১। ৩-৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জামা'তের ৮৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে হযরত আমীরুল মোমেনীন হুযূর(আই.) লন্ডন থেকে ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। সুশীল সমাজের আগত ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।
২। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় মোহতরম মাওলানা মাহমুদ আহমদ, আমীর এবং মিশনারি ইনচার্জ, অস্ট্রেলিয়া আগমন করেন।
৩। ৭ নভেম্বর রংপুর জেলার কিসমত মেনানগরে বিরুদ্ধবাদীরা নির্মাণাধীন মসজিদে আক্রমণ করে ভেঙ্গে ফেলে। আহমদীদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।
৪। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে ২৫ নভেম্বর রাতে এবং পরের দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মৌলভীপাড়াস্থ মসজিদুল মাহদীতে তাহাজ্জুদ নামায, দোয়া, কবর জিয়ারত, শতবার্ষিকী লোগো উম্মোচন এবং সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।
৫। ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাত বকশী বাজার দারুত তবলীগে তাহাজ্জুদ ও ফজর নামাযের পর শতবার্ষিকী লোগোর পর্দা উম্মোচন করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

২০১৩

১। ৩ জানুয়ারি দিবাগত রাত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর শতবার্ষিকী জুবিলী (১৯১৩-২০১৩) উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রত্যেক জামা'তে তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সকালে মিষ্টি বিতরণসহ উৎসব মুখর পরিবেশে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়।
২। ১৮ জানুয়ারি শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান পালিত হয়। সুশীল সমাজের যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আহমদীয়া জামা'তের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এমন ৩৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়।
৩। বাংলাদেশ জামা'তের ৮৯তম সালানা জলসা ৮-১০ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের মৌচাকে স্কাউট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ৬ ফেব্রুয়ারি বিরুদ্ধবাদীরা জলসার জন্য নির্মিত প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয়; মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পরে প্রশাসন জলসার অনুমতি বাতিল করে। এতে প্রায় চার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। পরবর্তীতে নির্ধারিত তারিখে জলসা বকশীবাজার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়।
৪। এ জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৩০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন মাওলানা মাহমুদ আহমদ আমীর ও মিশনারি ইনচার্জ অস্ট্রেলিয়া। বিদেশ থেকে আগত অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। হুযূর(আই.) সমাপ্তি অধিবেশনে লন্ডন থেকে এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি ভাষণ দান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা জলসায় বক্তব্য রাখেন।

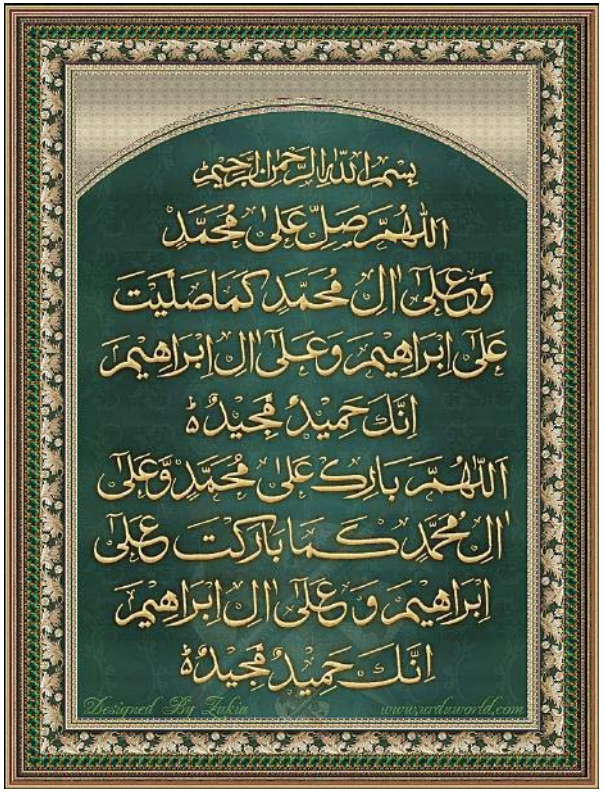

'হে আল্লাহ্! আশিস বর্ষণ কর মুহাম্মদ(সা.) এবং মুহাম্মদ(সা.)-এর বংশধরদের প্রতি যেভাবে তুমি আশিস বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম(আ.) এবং ইবরাহীম(আ.)-এর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসাময়, মহা মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! কল্যাণ বর্ষণ কর মুহাম্মদ(সা.) এবং মুহাম্মদ(সা.)-এর বংশধরদের প্রতি যেভাবে তুমি কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম(আ.) এবং ইবরাহীম(আ.)-এর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি মহা প্রশংসাময়, মহা মর্যাদাবান।'

(Photo: Brahmanbaria, 1926)

Standing from left to right: 1. Janab Mizanur Rahman Bhuiyan (Bashudeb), 2. Maulvi Syed Sayeed Ahmad (B.Baria), 3. Hafez Tayyebullah, (Bhorotpur, West Bengal), 4. Munshi Azharuddin, (Deora-Shahbazpur, B. Baria) 5. Qazi Merajuddin (Shondadil, Qazi Bari), 6. Khan Sahib Maulvi Mubarak Ali (Bogra), 7. Maulvi Rahmat Ali (Basharuk), 8. Allama Zillur Rahman (Kasait), 9. Syed Azizul Huq (Tatarkandi), 10. Janab Abdur Rahman Pehlwan (Lahore), 11. Maulvi Azizuddin (Bhadugarh), 12. Maulvi Nazaratullah (Sohelpur).

Chairs from L to R: 1. Janab Mir Sikanadar Ali (Shorail), 2. Khan Bahadur Abul Hashem Khan Chowdhury (Natore), 3. Hazrat Hakim Muhammad Hussain Qureshi Sahib(ra) of Lahore, 4. Professor Abdul Latif Khan (Chittagong), 5. Hazrat Maulvi Malek Ghulam Farid Sahib(ra) of Qadian, 6. Janab A. H. M. Ali Anwar (Tatarkandi).

Sitting on the ground from L to R: Janab Ghulam Ahmad Khan (Falu Mian of Chittagong), 2. Janab Shafiul Alam Athar (Shandwip) and other two.

(Photo: Qadian, 1939)

Standing from Left to right: 1. Maulana Syed Ejaz Ahmad, 2. Janab Siddiqur Rahman Khurshid, 3. Janab Mir Abdus Sattar (Morail), 4. Janab Zafree Sahib, 5. Janab Abul Hussain (Sub-registrar, Mymensingh), 6. Chowdhury Asab Ali (Puniot), 7. An Ahmadi of Basharuk, 8. Master Rajab Ali Munshi (Basharuk). ***2nd row stading from L to R:*** 1. Hafez Abdul Qayyum, 2. Dr. Muhammad Musa (Bakura, W. Bengal), 3. Maulvi Shujaat Ali, Inspector Baitul Mal (Dhaka), 4. Janab A. H. M. Ali Anwar (Tatarkandi), 5. Maulvi Rahmat Ali (Basharuk), 6. Maulvi Ahmad Ali (Tarua), 7. Janab Muhammad Yaqub (B. Baria) 8. Janab Maulvi Abdur Rahman Khan (Puniot), 9. Janab Muzaffaruddin Chowdhury (Debogram), 10. Janab Hamdu Mian (Bashudeb). ***Chairs from L to R:*** 1. Salahuddin Khan s/o Abdur Rahman Khan Sahib, 2. Maulvi Muhammad Sahib, 3. Khan Bahadur Abul Hashem Khan Chowdhury Sahib (Provincial Amir of Bengal), 4. Hazrat Dr. Mufti Muhammad Sadeq(ra), 5. Hazrat Seth Muhammad Siddique Bani (Kolkata), 6. Allama Zillur Rahman Sahib (B. Baria), 7. Janab Mujeebur Rahman (s/o Allama Zillur Rahman) ***Kids sitting in the front row:*** 1. Rokeya Khatun (d/o Abul Hussain Sahib), 2. Rafia Khatun (d/o Same), 3. Ahmad Sadeq Mahmud Sahib, 4. Abdur Rab (Basharuk), 5 & 6. Unknown, 7. Janab Ataur Rahman (s/o Allama Zillur Rahman), 8. Muhammad Ashraf Hussain (s/o Abul Hussain Sb.).

সামনের সারিতে বসা বাম হতে : ১. জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩ ও ন্যাশনাল সেক্রেটারি জায়দাদ; ২. জনাব আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ ও আমীর, ঢাকা জামাত; ৩. জনাব অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১; ৪. জনাব আলহাজ্জ মোবাশ্শেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর; ৫. জনাব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ; ৬. জনাব আলহাজ্জ আবুল খায়ের, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪; ৭. জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫ ও ন্যাশনাল সেক্রেটারি উমুরে খারেজা; *মাঝখানের সারিতে বসা বাম হতে :* ৮. জনাব শহীদুল ইসলাম বাবুল, ন্যাশনাল সেক্রেটারি ওয়াকফে জাদীদ; ৯। জনাব মাহবুবুর রহমান, ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি; ১০. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, ন্যাশনাল সেক্রেটারি ফাইনান্স; ১১. আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্; ১২. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, ন্যাশনাল সেক্রেটারি রিশ্তানাতা; ১৩. জনাব মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারি ইশায়াত; ১৪. জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, সদর, আনসার; *পিছনের সারিতে দাঁড়ানো বাম হতে* : ১৫. জনাব ইনসান আলী ফকির, ন্যাশনাল সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ; ১৬. জনাব হাসিব আহসান রতন, ইন্টারনাল অডিটর, ১৭. মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ্; ১৮. মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ্; ১৯. জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহি, ন্যাশনাল সেক্রেটারি তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজি; ২০. জনাব হালিম আহমদ হাজারি, ন্যাশনাল সেক্রেটারি ওয়াকফে নও; ২১. জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ, ন্যাশনাল সেক্রেটারি ওসীয়্যত; ২২. জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান, ন্যাশনাল সেক্রেটারি সানাত ও তেজারত; ২৩. জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ , ন্যাশনাল সেক্রেটারি উমুরে আমা; ২৪. জনাব খায়রুল হক, ন্যাশনাল সেক্রেটারি অডিও-ভিডিও এবং এমটিএ ইনচার্জ; ২৫. জনাব মোতাহার আহমদ চৌধুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারি জিরাত; ২৬. জনাব মোসলেহ উদ্দিন, এডিশনাল ন্যাশনাল সেক্রেটারি ওয়াকফে জাদীদ নও মোবাইন; ২৭. মওলানা আরিফুর রহিম, মুরব্বী সিলসিলাহ্

ন্যাশনাল আমীর সাহেব, স্থানীয় জামা'তের আমীর ও প্রেসিডেন্টবৃন্দ

উপরের সারিতে বাম হতে ১. মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, ন্যা.সে. ২. খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম, প্রে. ৩. আবু বকর সিদ্দীক সাদেক, য.আন. ৪. শামীম আহমদ, সে. ৫. মোতালেব হোসেন খান, ভা.প্রে. ৬. মাহবুবুল আলম, য. আ. ৭. ছলিম উদ্দীন, প্রে. ৮. আতিয়ার রহমান, প্রে ৯. মোহাম্মদ শহীদ উদ্দিন, প্রে. ১০. হাফিজুর রহমান, সে. ১১. মোস্তফা এহতেশামুল , প্রে. ১২. মোহাম্মদ শওকত আলী, প্রে. ১৩. এহতেশামুল বশির, মোয়া. ১৪. মোহাম্মদ ওয়াক্কাসুর রহমান, প্রে. ১৫. আব্দুল হান্নান, প্রে. ১৬. মোহাম্মদ মুছা মিয়া, প্রে. ১৭. জামাল উদ্দিন প্রামানিক, প্রে. ***২য় সারি বাম হতে*** ১. মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, স.আন. ২. মাহবুবুর রহমান, জি.এস.বাং. ৩. মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মো.ই. ৪. মোহাম্মদ ইয়াকুব লস্কর, প্রে. ৫. আব্দুস সাত্তার, প্রে. ৬. খালেদুল ইসলাম, ভা.প্রে. ৭. কে.এম. রফিকুল ইসলাম, প্রতি. ৮. আব্দুর রহিম ভূইয়া, প্রে. ৯. এস.এম. নসরুল্লাহ্, প্রে. ১০. ডা. মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্, প্রে. ১১. জিন্নাত আলী, প্রতি. ১২. মঞ্জুর হোসেন, আ. ১৩. আনোয়ার হোসেন, প্রে. ১৪. মোশারফ হোসেন, প্রে. ১৫. নজরুল ইসলাম সরকার, সে. ১৬. বশির আহমদ, প্রে. ১৭. মোসলেহ্ উদ্দিন, ন্যা.সে. ১৮. বদরুল ইসলাম, ভা.প্রে. ১৯. আব্দুল হামিদ, প্রে. ২০. মোর্শেদ আলম চৌধুরী, প্রে. ২১. মোতাহার মৃধা, প্রে. ২২. আব্দুল মজিদ সরদার, আ. ২৩. মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, প্রে. ২৪. ডা. আব্দুল খালেক, প্রে. ২৫. শহিদুল ইসলাম বাবুল, ন্যা.সে. ২৬. নঈম আলম খান, ন্যা.সে. ২৭. সারোয়ার মোরশেদ, ন্যা.সে. ২৮. আহমদ তবশির চৌধুরী, না.ন্যা.আ. ২৯. মোহাম্মদ শামসু মিয়া, প্রে. ৩০. ফারুক আহমদ মুক্তা, ভা.প্রে. ৩১. মোহাম্মদ রশিদুজ্জামান, প্রে. ৩২. আশরাফ আলী, প্রে. ৩৩. মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, ন্যা.সে. ৩৪. মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, ন্যা.সে. ৩৫. গাজী মাজহারুল খোকন, প্রে. ৩৬. মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, প্রে. ৩৭. নূর মোহাম্মদ, প্রে. ৩৮. মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যা.সে. ৩৯. সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রে. ৪০. হালিম আহমদ হাজারী, ন্যা.সে. ৪১. মোতাহার আহমদ চৌধুরী, ন্যা.সে. ***চেয়ারে বসা বাম দিক থেকে*** ১. আলী আহমদ মাস্টার, প্রে. ২. হাফেজ আব্দুল আলীম, প্রে. ৩. মোহাম্মদ মঞ্জুর আনাম, প্রে. ৪. মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, প্রে. ৫. কামাল উদ্দিন, প্রে. ৬. ডা. রুহুল আমীন, প্রে. ৭. মোবাশ্শেরউর রহমান, ন্যা.আ. ৮. মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, না.ন্যা.আ. ৯. মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্, না.ন্যা.আ. ১০. আবুল খায়ের, না.ন্যা.আ. ১১. মোস্তফা পাটোয়ারী, আ. ১২. --- , প্রে. ১৩. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, ন্যা.সে. ১৪. মাজহারুল ইসলাম, প্রে. ১৫. ইসরাইল দেওয়ান, প্রে. ১৬. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, আ. ১৭. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, প্রে. ***বসা সারিতে বাম হতে*** ১. হাজী শহীদুজ্জামান, সে. ২. আব্দুল ওয়াদুদ, প্রে. ৩. মহিউদ্দিন আহমদ, সে. ৪. মসিউর রহমান, প্রে. ৫. মুহিবুর রহমান, প্রে. ৬. ড. আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক, প্রে. ৭. মিরাজুল ইসলাম, প্রে. ৮. মোহাম্মদ নাসির সরকার, প্রে. ৯. মজিবর রহমান, প্রে. ১০. ডা. শফিকুর রহমান, প্রে. ১১. মোহাম্মদ আলী, প্রে. ১২. শামসুর রহমান চৌধুরী, প্রে. ১৩. সালাহ্ উদ্দিন আহমদ, প্রে. ১৪. আব্দুল কাইয়ুম, প্রে. ১৫. নুরুদ্দিন মামুন, সে. ১৬. আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রে. ১৭. আবু সাঈদ মিলন, প্রে. ১৮. নজিবুর রহমান, প্রে.

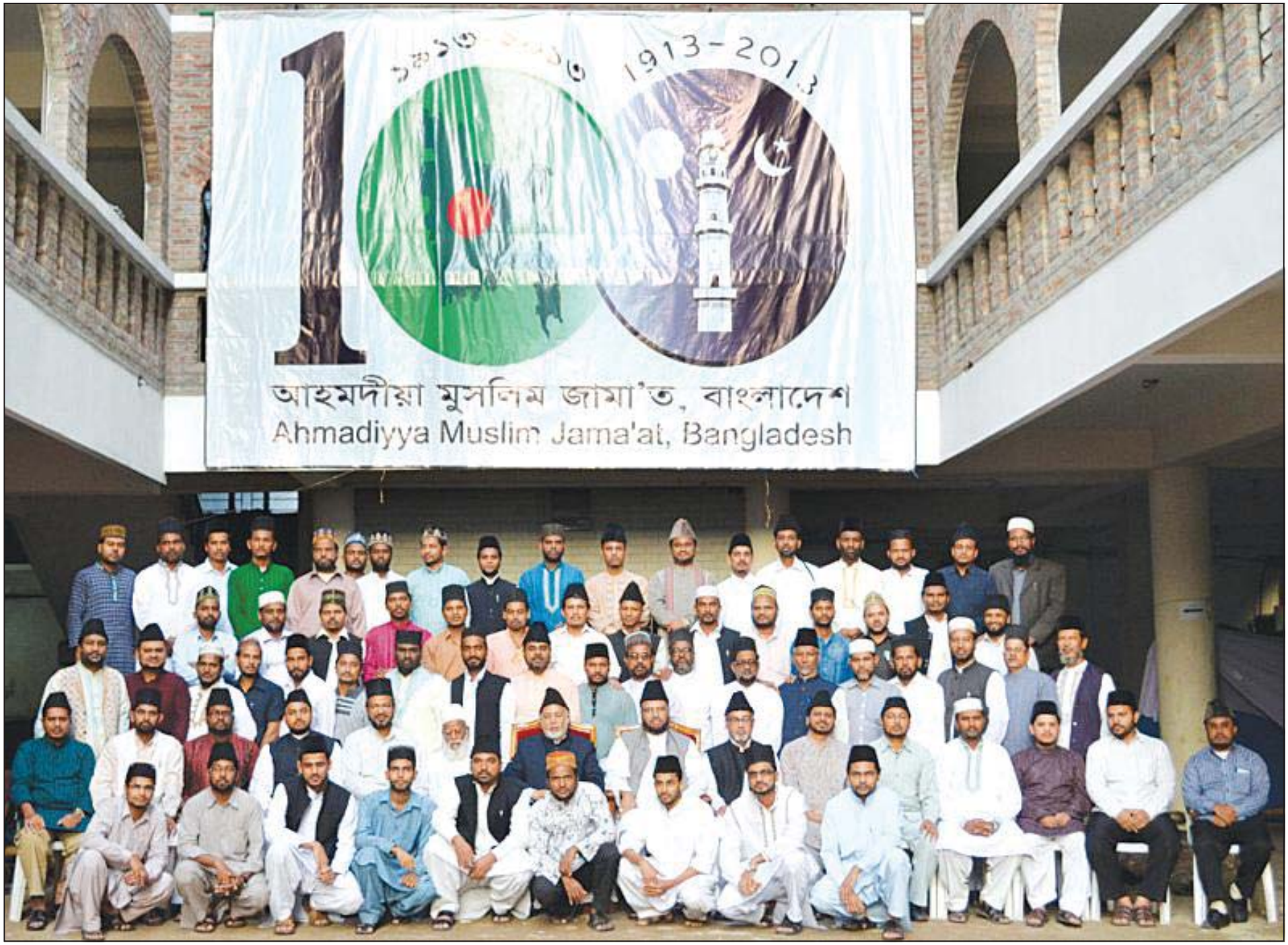

জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবগণ (২০১৩)

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর আমেলার সদস্যবর্গ

বসা- ডান থেকে বামে : সর্বজনাব আখতারুজ্জামান, নঈম আলম খান, মোহতরম মওলানা ক্বারী নওয়াব আহমদ (সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত), মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ (সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ), আব্দুল জলিল, শহিদুল ইসলাম বাবুল, ফজলুর রহমান।

দাড়ানো- ডান থেকে : সর্বজনাব আবু তারেক, শফিকুল হাকিম আহমদ, মাকসুদুল হক, আব্দুর রহিম, আব্দুর রশিদ, আব্দুস সামী, মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ, আব্দুস সোবহান, নাসির উদ্দিন মিল্লাত, এনাম আহমদ, মিজানুর রহমান, মোহম্মদ আবুল কাসেম ভূইয়া, অধ্যাপক ফয়জুদ্দিন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের আমেলার সদস্যবর্গ

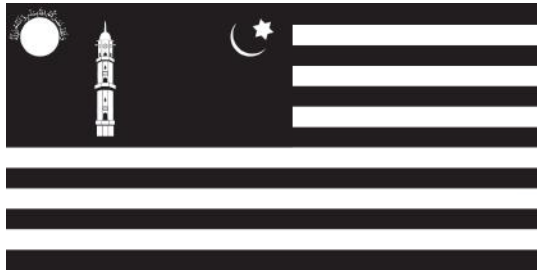

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা

“যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতির সংশোধন হতে পারে না”

—হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.)
খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা

প্রথম সারিতে নীচে বসা : ১. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান; ২. ফারুক হোসেন; ৩. গোলাম রাব্বি; ৪. আহসানুল্লাহ সৈকত; ৫. তারেক আহমেদ সবুজ।

দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ানো : ১. মঞ্জুর আহমেদ; ***চেয়ারে :*** ১. মনোয়ার হোসেন; ১. শাহান শাহ আজাদ জুম্মান; ৩. জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন (সদর, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ), ৪. ইউনুস আলী।

তৃতীয় সারিতে বাম দিকে দাঁড়ানো : ১. মাহবুব হাসান কোয়েল; ২. শাহিনুর রহমান; ৩. ফারেজুল হক; ৪. মাহবুবার রহমান; ৫. কাওসার আহমদ; ৬. ইমতিয়াজ আলী; ৭. মাহমুদ আহমদ বিপ্লব।

চতুর্থ সারির বাম দিকে : ১. আমানুর রহমান পলাশ; ২. মুনাদিল ফাহাদ; ৩. মোহাম্মদ জাহেদ আলী; ৪. সাইদুর রহমান; ৫. ফাহিম মিয়াজি; ৬. হাজারী আল মুনিম; ৭. গোলাম মুর্তজা।

জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশের সূচনা ও অগ্রযাত্রা

২০০৫ সালে উত্তীর্ণ জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ-এর প্রথম ব্যাচ (মুবাশ্বের)

মোহতরম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে
জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ-এর শিক্ষকবৃন্দ (২০১৩)

২০১৩ সালে উত্তীর্ণ জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ-এর প্রথম শাহেদ ব্যাচ

২০১৪ সালে উত্তীর্ণ জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ-এর দ্বিতীয় শাহেদ ব্যাচ

বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত মোয়াল্লেম কোর্সের চিত্র

মোয়াল্লেম কোর্স (১৯৮৮-১৯৮৯)

মোয়াল্লেম কোর্স (২০০০-২০০১)

মোয়াল্লেম কোর্স (২০০৬-২০০৭)

মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেবের সাথে মোয়াল্লেম কোর্স (২০০৭-২০১০)-এর ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ

পিছনের সারির বাম থেকে : ১. আব্দুল্লাহ্ সুমন ২. সাব্বির আহমদ মুত্তাকী ৩. তাহের আহমদ ৪. আশরাফুল ইসলাম ৫. মোহাম্মদ কামরুজ্জামন ৬. আবু সালেহ্ ৭. আব্দুল আলীম সানী ৮. বিপ্লব শাহ্ ৯. সালমান আহমেদ ১০. আফজাল আহমদ ইয়াসিন ১১. মেহদী সুলমান ১২. ফালাহ্ উদ্দীন সাদেক ১৩. নজরুল ইসলাম ১৪. সালেহ্ আহমদ খান ১৫. আল হক ১৬. মুস্তাফিজুর রহমান ১৬. জাহিদুল ইসলাম শুভ ১৭. আশরাফুদ্দীন। ***পিছন থেকে দ্বিতীয় সারির বাম থেকে :*** ১. ফুরাদ আহমদ ২. মুহিবুল্লাহ্ ৩. আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী ৪. জাফর ইকবাল ৫. জুনায়েদ ইসলাম ৬. মারুফ আহমদ ৭. রিফাত হোসেন শিশির ৮. শোয়েব আহমদ ৯. মুহাম্মদ সালেহ ১০. সৈয়দ মুজাফ্ফর আহমদ ১১. শেখ আহবাব হোসেন শামস ১২. মোহাম্মেদ এহসান আসিফ ১৩. কাশেম হোসেন পিয়াস ১৪. সোহাগ মিয়া। ***পিছন থেকে তৃতীয় সারির বাম থেকে :*** ১. সিদ্দীক হোসেন (ডাইনিং স্টাফ) ২. ফরিদ হোসেন (ডাইনিং স্টাফ) ৩. রাসেল আহমদ ৪. সোহেল আহমদ ৫. শামসুল ইসলাম মুকুল ৬. মুদাস্‌সের রহমান ৭. খালিদ মুসনাদ খান ৮. রুহুল আমীন রিয়ন ৯. এনামুল হক ১০. গোলাম রসূল ১১. জামিল হোসেন ১২. আসাদুজ্জামান ১৩. মোহাম্মদ আতাউর রহমান ১৪. মোমিন হোসেন ১৫. মাসুদ আহমদ ১৬. নাসের আহমদ ১৭. জুবায়ের আহমদ বিপু ১৮. ইমরান আহমদ (অফিস স্টাফ) ১৯. জাহিদুল ইসলাম (ডাইনিং স্টাফ) ২০. হাফিজ আহমদ (অফিস ষ্টাফ)। ***সামনের দিক থেকে দ্বিতীয় সারিতে বাম দিক থেকে চেয়ারে উপবিষ্ঠ শিক্ষক মণ্ডলী :*** ১. শেখ মোস্তাফিজুর রহমান ২. মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম ৩. মোহাম্মদ সোলায়মান ৪. সালেহ্ আহমদ ৫. নাযির আহমদ ভূইয়া ৬. মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ৭. বশীরুর রহমান ৮. শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন ৯. ফয়জুদ্দীন আহমদ ১০. আহমদ জাকির হোসেন ১১. মোবারিজ আহমদ সানী ১২. রশীদ আহমদ ১৩. মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম (অফিস সহকারী)। ***প্রথম সারির বাম দিক থেকে :*** ১. মোহাম্মদ রুহুল বারী ২. কাওসার আলী মোল্লা ৩. সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ৪. সজিব আহমদ হারুন ৫. সাকিবুল হাসান ৬. ইসমাঈল হাজারী ৭. মুহাম্মদ আনিসুল ইসলাম ৮. মসিউর রহমান ৯. শাহ্ এহসান উদ্দীন ১০. নাসের আহমদ দোলন ১১. নাভিদুর রহমান।

আহমদীয়া কিণ্ডার গার্টেন, শালসিঁড়ি, পঞ্চগড় (স্থাপিত-২০০৭)। হুযূর(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ ২০১২ সালে এই স্কুলটি পরিদর্শন করেন

মাহিল্লা আহমদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাঙামাটি। স্থাপিত- ২০০৬

যেখান থেকে বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আনুষ্ঠানিক সূচনা

সৈয়দ মমতাজ আহমেদ

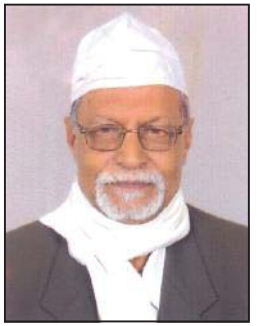

সৈয়দ মমতাজ আহমেদ সাহেব অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)-এর পৌত্র ছিলেন। তিনি মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের বড় ছেলে ছিলেন। লেখাটি জমা দেয়ার বছর খানেক পর লেখক ইন্তেকাল করেছেন।

মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব বঙ্গীয় আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ও অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক আমীর ছিলেন। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। তদানীন্তন ব্রিটিশ-ভারতের অবিভক্ত বাংলার ত্রিপুরা জেলার [সাবেক বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা] ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে বড় মওলানা নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এদেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রচার ও প্রসারে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। ধর্মের জন্য কীভাবে অনিত্য সংসারে মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ ত্যাগ করে অম্লান বদনে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট মাথায় বইতে হয়– তিনি ছিলেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি স্থাপন করেছেন আমাদের সামনে এক অনুপম আদর্শ। শুধু আহমদীয়া মতবাদ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে যে কত প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল– তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর নামে পরিচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে মৌলভীপাড়ার 'মসজিদুল মাহদী' প্রাঙ্গণে তাঁর কবর বিদ্যমান এবং কাদিয়ানের বেহেশ্‌তী মাকবারাতেও তাঁর নামফলক (কৃতবা) স্থাপিত আছে।

শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর সাথে তিনি সরাসরি পত্রালাপের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই চিঠিপত্রের আদান-প্রদানকালে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) তাঁর এক চিঠিতে মৌলভী সাহেবকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, "যেহেতু আপনার লেখার মধ্যে সত্যান্বেষী এবং সৌভাগ্যবানের সুগন্ধ অনুভব করছি তাই আপনার ন্যায় একজন 'রাশেদের' (পুণ্যবান ব্যক্তির) জন্য কিছু ব্যয় করাকে আমি অত্যন্ত সওয়াবের এবং আখিরাতের জন্য উত্তম পুরস্কারযোগ্য বিষয় বলেই মনে করি। আপনি অবশ্যই উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করবেন।" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড)

যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) তার মাঝে যে সাধুতা ও আধ্যাত্মিকতার সৌরভ অনুভব করেছিলেন তা তিনি বঙ্গদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমৃত্যু চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি বাঙালি সমাজে আহমদীয়াতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছিলেন। ঐশী সুগন্ধির সুবাতাসে মোহিত করেছেন অসংখ্য জনপদ। ফলে কিংবদন্তি হয়ে আছে তার ধ্রুবতারাসম বর্ণাঢ্য জীবন। বাংলার আকাশে প্রতিনিয়ত জ্বলজ্বল করছে আব্দুল ওয়াহেদ নামক একটি তারকা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া এদিক থেকে একটি ঐতিহাসিক জনপদ। ১৯১৩ সালে এখান থেকেই বঙ্গদেশে আহমদীয়াতের সাংগঠনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। বহু বছর এ 'মসজিদুল মাহদী'র প্রাঙ্গণেই জামা'তের বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বোপরি বাংলাদেশে আহমদীয়াতের সঙ্গে এই স্থানটির রয়েছে একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্র এবং ঐতিহ্যের গৌরবময় স্মৃতিগাঁথা।

জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দশটি দিন

মনসুর আহমদ (নাদির)

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে একমাত্র তাঁর নির্দেশিত পথে চলার কারণে এই অধম জীবনের দশটি দিন বন্দিশালাতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছে। তাঁর অশেষ কৃপায় তিনি আমাকে 'আসীরে রাহে মওলা' হবার পুরস্কার দিয়েছেন। আমি চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে খোদার নিকট এই মিনতি করি, তিনি যেন আমাকে আমৃত্যু তাঁর ধর্মের সেবকরূপে গ্রহণ করে নেন।

১৯৯৯ সনের ৮ই অক্টোবর, শুক্রবার। খুলনায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিরালাস্থ মসজিদে 'এতায়াতে নেযাম' বিষয়ে জুমুআ'র খুতবা দিচ্ছিলেন মোহতরম মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ। (বর্তমানে প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ)। বেলা ১.২০ মিনিটে মসজিদে পৌঁছে দেখি মুসল্লিতে মসজিদ ভরপুর। আনুমানিক বেলা ১.৩৫ মিনিটে বিকট শব্দে পুরো মসজিদ কমপ্লেক্স প্রকম্পিত হয়ে উঠে। ধোঁয়ার কারণে এবং কানে তালা লেগে যাওয়াতে প্রথম কয়েক মিনিট চোখেও কিছু দেখি নি, কানেও কিছু শুনি নি। মসজিদ থেকে কীভাবে বের হয়েছি তাও বলতে পারব না। খোদ্দামের তৎকালীন কায়েদ জনাব রেজওয়ানুল হক রাজু (অকাল প্রয়াত) এবং আমি ছুটাছুটি করছি ও পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছি। আমার সর্বপ্রথম মনে হয়েছে, সম্ভবত আমাদের মসজিদ কমপ্লেক্সটি উগ্র ধর্মান্ধ স্বার্থান্বেষীরা তাদের দখলে নিতে চায়।

তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা রেখে পুরো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যেই মসজিদের বাইরে অসংখ্য লোকের উপস্থিতি দেখতে পাই। ততক্ষণে মসজিদ থেকে আহতদের বের করে আনা হচ্ছে। সর্বপ্রথমে বোমায় আহত মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবকে বের করে পরবর্তীতে তাঁর একটি পা ক্ষতের কারণে কেটে ফেলতে হয়েছিল। এরপর একে-একে অন্যান্যদেরও বের করে আনা হয়। সেই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে খোদার পথে ক্রমান্বয়ে শহীদ হন আমাদের সাত ভাই। যারা হলেন- (১) মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, (২) মুহাম্মদ নুরুদ্দীন আহমদ, (৩) মুহাম্মদ জি.এম. মুহিবুল্লাহ, (৪) ডা. এম. এ. মাজেদ, (৫) আব্দুস সোবহান মোড়ল, (৬) আকবর হোসেন, (৭) ডা. মুমতাজ উদ্দীন।

যারা আল্লাহর রাস্তায় অঙ্গ কুরবানী এবং রক্ত দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তারা হলেন– (১) মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব (২) মো. আব্দুর রাজ্জাক (বর্তমান আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা), (৩) গাজী ওমর ফারুক, (৪) শেখ মোহায়মেন চঞ্চল, (৫) শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম, (৬) হাফেজ মনসুর আহমদ (৭) এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম, (৮) মুহাম্মদ নুরুল্লাহ্, (৯) আহসান জামিল (বর্তমান নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা), (১০) মোহাম্মদ আলী মৃধা, (১১) শেখ আলী আকবর, (১২) আমিনুল ইসলাম এবং (১৩) শহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

এক পর্যায়ে দেখতে পাই একমাত্র আমি ছাড়া মজলিসে আমেলার অন্যান্য সব সদস্য নিহত এবং আহতদের নিয়ে ব্যস্ত। দায়িত্বশীলদের মধ্যে আমি একাই ছিলাম। অথচ মসজিদ কমপ্লেক্সে তখন সাধারণ জনগণ, পুলিশ আর গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনে ভরপুর। বাধ্য হয়েই জামা'তের নিয়মানুসারে কর্মকর্তা হিসেবে আমাকেই দায়িত্ব নিতে হয়েছে এবং সে দায়িত্ব আমি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি।

পুলিশ, সংবাদ মাধ্যম এবং গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্ন জন আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং ঐ দিন বিবিসিতেও তা প্রচারিত হয়েছিল।

রাতে ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে সন্দেহবশত পুলিশ আমাকে ও সাঈদুর রহমান (সাঈদ)-কে ধরে খুলনা থানায় নিয়ে যায়। সাঈদকে রাতেই ছেড়ে দিলেও আমাকে বন্দি করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে কোর্টের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়। জামা'ত, পরিবার ও অফিস সহকর্মীদের সহায়তায় আমার বিরুদ্ধে কোনরূপ সন্দেহ প্রমাণিত না হওয়ায় দশ দিন পর আমি জামিনে মুক্তি পাই। বর্তমানে চাকুরিতে বদলিজনিত কারণে নোয়াখালীতে অবস্থান করছি। এছাড়া এই অধমকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, অম্বরনগরের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও দেয়া হয়েছে।

পার্থিব লোকেরা বন্দিশালাকে দুর্ভোগ মনে করে। তাদের কাছে বন্দিশালার দিনগুলো দুর্বিসহ মনে হয়। কিন্তু আমি এটিকে আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি; যে সৌভাগ্যকে আমি সারা জীবন গর্বের সাথে লালন করে যাব। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর পবিত্র হাতে প্রতিষ্ঠিত এই ঐশী জামা'তের উত্তম সেবক হবার সৌভাগ্য দান করুন' (আমীন)।

খুলনার মসজিদ 'বায়তুর রহমান' যেখানে ১৯৯৯ সনের ৮ই অক্টোবর বোমা বিস্ফোরিত হয়।

যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাঁদের কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী ১০৮-১০৯পৃষ্ঠায় দেখুন।

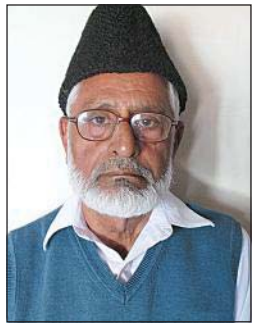

আমার ওয়াকফ জীবনের যৎসামান্য স্মৃতি কথা

আহমদ সাদেক মাহমুদ

আমি আমার পিতার একমাত্র সন্তান। আমার জন্ম ১৯৩৩ সালে। তখন থেকেই আমার পিতা মরহুম মৌলভী আবু হামেদ মুহাম্মদ আলী আনওয়ার সাহেবের প্রবল ইচ্ছা ছিল, তিনি আমাকে আহমদীয়া জামা'তের ঐশী ব্যবস্থাধীন ধর্ম সেবায় জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ এর অন্তর্ভুক্ত করবেন। তাই শৈশবকাল থেকেই তিনি আমাকে শিক্ষা-দীক্ষায় সেভাবে গড়ে তোলার যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। সে এক দীর্ঘ কাহিনী। ১৯৩৯ সালে ওয়াকফে জিন্দেগীর জন্য তিনি আমাকে কাদিয়ানে নিয়ে যান এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)-এর সমীপে আমাকে পেশ করেন। হুযূর(রা.) বলেন, সে এখন অনেক ছোট। মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার জন্য প্রথমে তাকে মিডিল পাশ করতে হবে। তাই দেশে ফিরে এসে মিডিল তথা ষষ্ঠ শ্রেণি পাশ করলে, ১৯৪৫ সালে আমার পিতা পুনরায় আমাকে কাদিয়ান নিয়ে যান। হুযূর(রা.) আমার ওয়াকফে জিন্দেগীর আবেদন গ্রহণপূর্বক আমাকে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। তখন থেকে আমার ওয়াকফে জিন্দেগীর যাত্রা শুরু হয়। দেশ বিভাগ এবং কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানে হিজরতের কষ্টসাধ্য জীবন অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে অবশেষে রাবওয়ার জামেয়া আহমদীয়া থেকে পাঞ্জাব ইউনির্ভাসিটির মৌলভী ফাযিল ও বি.এ. পাশ করি এবং জামেয়াতুল মুবাশ্ শেরীন থেকে শাহেদ ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৫৭ সাল থেকে মুরুব্বী সিলসিলাহ হিসেবে ইসলাম সেবায় আমার কর্ম জীবন শুরু করি। সর্বপ্রথম ফয়সালাবাদে লোয়েলে লনুরন এরপর ১৯৫৮-১৯৬০ সিন্ধু প্রদেশের শুক্কুর ও খায়রপুরে কাজ করি। ১৯৬১ সালে আমি ঢাকায় কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে নিযুক্ত হই। ৮৭-৯০ চট্টগ্রামে এবং ১৯৯১ সালে বগুড়ায়, অতঃপর ৯২ সাল থেকে পুনরায় ঢাকায় কর্মরত থাকি এবং ২০০১ সালে অবসর প্রাপ্তির পর অতিরিক্তভাবে (এক্সটেনসনে) আরও ৫ বছর কাজ করি। এরপর আমি ২০০৬-২০০৯ পর্যন্ত আমেরিকা (নিউইয়র্কে) ও কানাডায় ভেন্‌কুভর, টরেন্টো) প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে আসি।

বিগত ১৯৫৭ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে নিয়মিত বিভিন্ন কাজ করি (১) নিয়মিত কেন্দ্রীয় মসজিদে দরসে কুরআন, দরসে হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুস্তকাবলির দরস ছাড়াও প্রত্যেক জুমুআ'র নামাযে যুগ খলীফার খুতবাসমূহের অনুবাদ বা সার সংক্ষেপ উপস্থাপন ও জামা'তের জরুরী বিষয়াবলির ওপর গুরুত্ব আরোপ (২) প্রায় প্রত্যেক দিন হালকাগুলোতে তরবিয়তী ও তবলীগি সভায় অংশগ্রহণ (৩) কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক, বার্ষিক জলসাসমূহে বক্তৃতা প্রদান (৪) ঢাকায় ইসলামী একাডেমির সাপ্তাহিক সভায় এবং বিশেষ সেমিনারে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান (৫) ঢাকার খ্রিস্টান চার্চসমূহে গিয়ে প্রত্যক্ষ আলোচনা ও পুস্তক বিতরণ এবং ১৯৭০ সালে নটরডেম কলেজে ১৫দিন ব্যাপী আন্ত চার্চ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন এবং অবশেষে শেষ দিনে মহানবী(সা.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করি (৬) প্রায় ৩৫ বছরব্যাপী 'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার সম্পাদনা ও যুগ খলীফাগণের অসংখ্য খুতবার অনুবাদ ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশনা, (৭) বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি খণ্ডনে নিম্ন লিখিত পুস্তিকা প্রণয়ন: ১। খতমে নবুওত ও হযরত ঈসা(আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন ২। হযরত ইমাম মাহদী(আ.) কোথায় আবির্ভূত হবেন? ৩। কয়েকটি আপত্তি খণ্ডন ও সত্যের প্রতি উদাত্ত আহ্বান ৪। সর্বমান্য বুযুর্গানে উম্মত কর্তৃক খতমে নবুওতের ব্যাখ্যা ও অভিমত।
৮। নিম্নবর্ণিত পুস্তক অনুবাদ: ১। দায়ী কে? ২। স্মারকলিপি (মাহযার নামা) ৩। একটি সদুপদেশ (এক হারফে নাসেহানা) ৪। হযরত খাতামান্নবীয়ীন(সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা।
৯। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুস্তকাবলীর অনুবাদ: ১। হযরত মসীহ(আ.) ভারতবর্ষে (মসীহ হিন্দুস্থান মে) ২। প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন (রাযে হাকীকাত) ৩। হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর পত্রাবলী ১ম খণ্ড, (১ম অধ্যায় আর্য, ব্রাহ্মসমাজী ও সাধারণ হিন্দুদের নামে) ৪। ইমাম মাহদী(আ.)-এর পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায় (খ্রিস্টান পাদ্রীদের নামে), ৫। ইমাম মাহদী(আ.)-এর পত্রাবলী ১ম খণ্ড ৩য় অধ্যায় (মৌলভী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবীর নামে)। অনুবাদটি প্রকাশিত এবং ৬। ইমাম মাহদী(আ.)-এর পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায় (হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়ালের নামে)।

কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ: যৌথভাবে কমিটির সদস্য হিসেবে এবং এককভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় অনুদিত কুরআনে তাঁর প্রণীত বিষয়সূচি।

১৯৬৬ সালানা জলসা, রাবওয়ায় যোগদান

১৯৮২ সালানা জলসা রাবওয়ার সর্বশেষ জলসায় খলীফা রাবে(রাহে.)-এর খিলাফতকালের ১ম বছরের জলসায় যোগদান।

১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে কাদিয়ানের পর-পর দু'টি সালানা জলসায় যোগদান করি।

২০০৪ ও ২০০৫ সালে কাদিয়ানে পর-পর দু'টি সালানা জলসায় যোগদান করি।

১৯৮৬ সালে লণ্ডন, ইউ.কে. সালানা জলসায় যোগদান এবং খলীফা রাবে(রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাত।

২০০৩ সালে লণ্ডনে খলীফা খামেস(আই.)-এর খিলাফতকালে প্রথম ইউ.কে. সালানা জলসায় যোগদান।

২০০৬ সালে আমেরিকার ভার্জিনিয়ার সালানা জলসায় যোগদান করি।

২০০৭ সালে কানাডার টরেন্টোতে সালানা জলসায় যোগদান এবং খলীফাতুল মসীহ্ খামেস(আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত।

এছাড়া এম.টি.এ. চালু হওয়ার সূচনা লগ্নে এম.টি.এ-তে অনেক বিষয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ও চট্টগ্রামে শিখদের গুরু দুয়ারাতে গুরু নানক ও শিখ ধর্মের বিষয়ে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে।

বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত তবলীগি সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ 'পাক্ষিক আহমদী' ও 'আহ্বান' পত্রিকায় ছাপা হয়। 'হযরত ঈসা(আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন' বিষয়ে প্রবন্ধটি 'ওফাতে ঈসা(আ.)' পুস্তকে সংযুক্ত হয়।

১৯৯৪-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ মেয়াদে

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী(আ.) মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে বলেন :

"আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু কেবল সে ব্যক্তিই তাঁর আশ্চর্য লীলা দর্শন করতে পারে যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নয়, তাকে তিনি তাঁর আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি যে আজও জানে না, তাঁর এমন এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দর্শন করেছি। এবং তাঁকে সকল সৌন্দর্য্যের অধিকারী দেখতে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হয় তবুও তাই করা উচিত।

হে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই ঝরনার দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে। এটি জীবনের উৎস, এটি তোমাদেরকে রক্ষা করবে। আমি কী করব এবং কী উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেব? মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়ে আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করে বলব, 'ইনি হলেন তোমাদের খোদা' এবং আমি কী ঔষধ প্রয়োগ করব, যাতে শোনার জন্য তাদের কান উন্মুক্ত হয়?" *(কিশতিয়ে নূহ পুস্তক)*

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের মজলিসে আমেলায় 'কায়েদ ইশায়াত' এবং ত্রৈমাসিক 'আনসারুল্লাহ্'-এর সম্পাদক হিসেবে খেদমত করার তৌফিক লাভ করি। ১৫ বছর পর এখন পুনরায় 'কায়েদ ইশায়াত' হিসেবে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের মজলিসে আমেলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আনসারুল্লাহ্র মজলিসদ্বয়ে এবং আতফাল ও লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমা ও তরবিয়তী ক্লাসগুলোতে নিয়মিত বক্তা, শিক্ষক ও বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করি।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

'আমি যখন চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।'

—প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী(আ.)

প্রিয়তম খলীফা আমার

সোগরা বেগম টুনী

পৃথিবীর মাঝে খোদার নূরে আলোকিত এক নূর,
তুমিই আমার খলীফা খামেস হযরত মাসরূর।
তুমি যেন এক নিষ্পাপ শিশু, ফুলের মতো পবিত্র,
তোমার কাছে ম্লান হয়ে যায় সব মহতীর মাহত্ব্য।
তুমি যেন ওগো বিশালতা ভরা করুনাপূর্ণ সাগর,
তোমার পরশে দীপ্তি পায় যেন নিষ্প্রভ এ ভূ-ধর।
ন্যায়-নীতির এক উজ্জ্বল রূপ,
তোমার মাঝে জীবন্ত, তোমার মাঝে জীবন্ত,
তোমার মাঝেই খুঁজে পাই মোরা খাঁটি মোমেনের দৃষ্টান্ত।
তুমি যেন এক সদ্য ফোটা সুবাসিত কোন ফুল,
তোমার পরশে কেটে যায় যত গ্লানি, আঁধারের-ধুল।
আকাশের চেয়েও অসীম তোমার হৃদয়ের উদারতা,
তোমার সামনে কেটে যায় যেন সকল স্থবিরতা।
ঈমানী শক্তির মূর্ত প্রতীক তুমি আমির-উল-মোমেনীন,
ধনী ও গরিব এক সারিতে তোমার কাছে সার্বজনীন।
পৃথিবীর আর কোথাও নেই তোমার মতো এমন বীর ,
বিপদে মোদের আগ্‌লে রাখ যে, হয়ে তুমি শান্ত, স্থির।

পৃথিবীর কোন রাজা যদি থাকে বর্তমানে শীর্ষস্থানে,
বলবো আমি, "সে শুধু তুমি– নির্দ্বিধায়, বিনা সন্দিহানে।
বৃষ্টির মতো কর তুমি সবে সদা দান-খয়রাত,
সেই তো ধন্য যে পেয়েছে শিরে কিঞ্চিৎ তোমার হাত।
পাহাড়ের মতো অটল যেমনি-কুসুমের মতো তুমি কোমল,
দুঃখীর দুঃখ দেখলে তোমার চোখ যে গো হয় অশ্রুসজল।
তুমিই মোদের বেঁধে রেখেছো অদৃশ্য এক বন্ধনে,
আছো তুমি মোর হৃদয় জুড়ে- হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে।
সারা বিশ্বের যাতনা সয়েও তুমি থাক সদা প্রফুল্ল,
তাইতো তুমি যে আমার নয়নে পৃথিবীর মাঝে অমূল্য।
তুমিই মোদের অহংকার আর তুমিই মোদের গৌরব,
তোমার ছোঁয়ায় ফুল যেন পায় সুবাসিত যত সৌরভ।
হে সদা প্রফুল্লচিত্ত! তোমায় পেয়ে আমি ধন্য,
পৃথিবীর মাঝে তুমি অতুল্য, অসাধারণ, অনন্য।
তুমিই মোদের খলীফা খামেস মহান নেতা কালজয়ী,
তোমার নেযামে হব যে মোরা সারাবিশ্বে বিশ্বজয়ী।
তোমার তুলনা শুধুই তুমি-উচ্চতম তোমার শান,
তোমার ছায়ায়-তোমার মায়ায় রাখবো মোরা তোমার মান॥

কিছু জানা-অজানা কথা এবং দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন

মাহমুদ হাসান সিরাজী

জনাব ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব জামা'তের একনিষ্ঠ ও নীরব কর্মী ছিলেন। সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ঠার সাথে জামা'তের কাজ করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে চট্টগ্রামের লুৎফুল হক সিরাজীর ছেলে এবং মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের জামাতা ছিলেন। তিনি লেখাটি জমা দেওয়ার পর গত ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে পরলোক গমন করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও পথিকৃৎ মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণের বৎসরাধিককাল পরে ১৯১৪ সালে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ এজাজ আহমদের জন্ম হয়। বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র সন্তান লাভ করাকেও তিনি আহমদীয়াতের এক নিয়ামত বলে গণ্য করতেন এবং সে কারণে তার নাম রেখেছিলেন এজাজ আহমদ (আহমদের মোজেযা)। বালক এজাজ তার পিতার বিশেষ স্নেহ ও অফুরন্ত দোয়ার অংশীদার হন এবং পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে উঠেন। কাদিয়ানে শিক্ষালাভ করার পর তিনি অত্যন্ত সফল একজন ওয়াকেফে জিন্দেগী মোবাল্লেগ হিসেবে এই উপমহাদেশে জামা'তের অনেক সেবা করেন এবং জনসাধারণের মাঝে 'আহমদীয়াতের দূত' হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

১৯৪১ সালে কাদিয়ানে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের বিয়ে হয়। এমন এক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ কন্যার সাথে বিয়ে হয় যিনি ছাত্রাবস্থায় আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে গৃহ থেকে বিতাড়িত হন; তার নাম সৈয়দ মুসি রাজা। জানা যায় অবিভক্ত ভারতের ভাগলপুরে তিনি এক ধনবান ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। ভারত বিভক্তির সেই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি ভারতের 'মুঙ্গেরে' তাঁর সহায় সম্পত্তি সব কিছু ফেলে মোহাজের হয়ে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন এবং ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকুরি সূত্রে চট্টগ্রাম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানের করাচিতে চলে যান আর ১৯৮৩ সালে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য, সৈয়দ মুসি রাজার জানাযা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) পড়ান এবং তাঁকে রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবারাতে 'শহীদদের অংশে' দাফন করা হয়; এটি একটি বিরল ঘটনা ছিল।

মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সৈয়দ মুসি রাজা সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের ফলে যে তিন পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয় তারা সকলেই আল্লাহ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং উক্ত বুযুর্গগণের সম্মিলিত দোয়ার ফলে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাদের স্ত্রী এবং স্বামীরা সকলেই জামা'তের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। খাকসার মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় জামাতা হওয়ার সুবাদে নিজেকে ধন্য মনে করি। কেননা এই পরিবারের জন্য বুযুর্গদের অনেক দোয়া রয়েছে। আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি তা অনুভব করে আসছি।

এখন আমি আপনাদের সামনে একটি অসাধারণ কুরবানীর ঘটনা তুলে ধরছি, ১৯৯৮ সালে আমি যখন সুনামগঞ্জে PWD-এর Executive Engineer হিসেবে কর্মরত, সে সময় মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের সকল পুত্র-কন্যা ১৯শে এপ্রিল তারিখে একত্রিত হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'মসজিদুল মাহদী' সংলগ্ন তাদের বসতবাড়ি সমেত পুরো জমিটি জামা'তের নামে রেজিস্ট্রি করে লিখে দেন। তারা সব ভাই-বোন স্বতঃস্ফূর্তভাবে একমত না হলে এটা কখনও সম্ভব হত না। জমি কুরবানী অনেকেই করে থাকেন কিন্তু পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত একমাত্র ভিটেবাড়ি আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা একটি বিরল ও বিরাট কুরবানীর দৃষ্টান্ত–যা অত্যন্ত ঈমানবর্ধক ও বাংলাদেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় একটি ঘটনা। উল্লেখিত বুযুর্গদের সম্মিলিত দোয়ার প্রভাবেই এটা বাস্তবে রূপ লাভ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। উল্লেখ্য, উক্ত দানকৃত জমি মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের চার মেয়ের মধ্যে তিন মেয়ের এবং দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলের অংশ বিশেষ।

আমরা দেখতে পেয়েছি, আল্লাহ

ادعونی استجب لکم

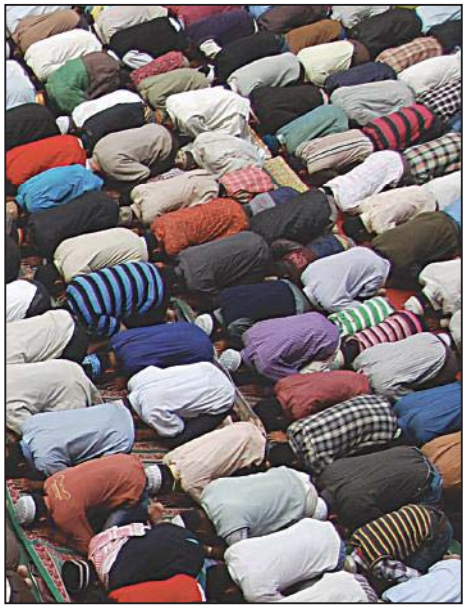

তা'লার অপার অনুগ্রহে ও খাস ফযলে ঐ স্থানটিতেই গত ২৫ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী জুবিলী' কার্যক্রমের 'বা জামাত তাহাজ্জুদ,' 'ইজতেমায়ী দোয়া' ও 'শতবার্ষিকী লোগো উন্মোচন' ইত্যাদি ঈমানউদ্দীপক ও উৎসাহব্যঞ্জক অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুন্দরভাবে

সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সার্বিকভাবে এই সব কিছুই আল্লাহ তা'লার মহিমা ও দোয়ার একটি নিদর্শন। এটাও খিলাফতের চিরস্থায়ী আশিস ও কল্যাণের এবং মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের দোয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন।

একটি ব্যক্তিগত অলৌকিক ঘটনা:

২০১০ সালের, ডিসেম্বর মাস। আমার মেজো মেয়েকে ফিনল্যাণ্ডে তার স্বামীর কাছে পাঠানোর জন্য দিল্লী নিয়ে যাই। বাংলাদেশে ফিনল্যাণ্ডের দূতাবাস না থাকার কারণে দিল্লী থেকে ফিনল্যাণ্ডের ভিসা নিতে হবে এবং সেখান থেকেই ফিনল্যাণ্ডের ফ্লাইট ধরতে হবে।

ভারতে যাওয়া মাত্র একটা মোবাইল 'সিম' কিনে ফেলি। কিন্তু যেহেতু সে একা যাচ্ছে আর ভারত একটি ভিন দেশ এবং ট্রানজিট ভিসা বিষয়ক একটা সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশংকাও ছিল তাই আমিও আমার মেয়ের সাথে এয়ারপোর্টে প্রবেশের পর থেকে বিমানে না ওঠা পর্যন্ত যোগাযোগ রাখতে চাচ্ছিলাম। ফলে আরও একটা 'সিম' জোগাড় করা দরকার। যেহেতু 'সিমটা' মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য ব্যবহৃত হবে, ভাবলাম আমাদের বাংলাদেশের মত কম দামে রেজিস্ট্রিবিহীন কোন সিম পেলে ভালই হয়। বিষয়টা নিয়ে দিল্লী জামা'তের ক্যাম্পাসে সকালে রোদ পোহাতে-পোহাতে উপস্থিত দুই-তিন জনের সাথে কথা বললাম। জানা গেল, ভারতে এটা সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ পর জামা'তের একজন ড্রাইভার একটা সিম নিয়ে এসে বললেন, কয়েক মাস থেকে একটা সিম তার গাড়িতে পড়ে আছে, সেটা দিয়ে কাজ হয় কিনা দেখা যেতে পারে। ঐ সিম কার্ডে কোন ব্যালেন্স ছিল না তাই মোবাইল নাম্বার জানাও সম্ভব হচ্ছিল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক জায়গায় স্ক্র্যাচ কার্ড কিনতে পাওয়া গেল [স্ক্র্যাচ কার্ড-এর প্রচলন আজকাল নাই বললেই চলে]। যাহোক, মেয়ের মোবাইলে ঐ সিম লাগিয়ে কিছু টাকা রিচার্জ করার পর আল্লাহর রহমতে সিম চালু হয়ে গেল।

সেটা থেকে আমার নাম্বারে রিং করে ঐ সিমের নাম্বার জেনে নিলাম। ঐ নাম্বার থেকে ফিনল্যাণ্ডে কথা বলি, একইভাবে ফিনল্যাণ্ড থেকে রিং ব্যাক করে সেটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করি। যাত্রার দিন আমার মেয়ে এয়ারপোর্টের ভিতর থাকা অবস্থায় আমরা এবং তার স্বামীও ঐ নম্বরে ফোন করে কয়েকবার কথা বলি।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে ভয় ছিল তা-ই ঘটল। আমরা তাকে সাহস দিলাম এবং অনেক দোয়া করতে থাকলাম। অবশেষে জানতে পারলাম, সে এখন বিমানের সিটে। সুতরাং তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘুমোতে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর ফিনল্যাণ্ড থেকে জামাই-এর ফোন, সে অস্থির হয়ে বলছে, আব্বা 'তুষি' তো হারিয়ে গেছে। কারণ ঐ মোবাইল নাম্বারে কল করলে অন্য পুরুষ লোক ধরছে। আমি নিজে ঐ নাম্বারে কল করলাম, দেখি একই অবস্থা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কে বলছেন? জবাব দিল, আমি আমিন বলছি। যেহেতু ঐ নামের একজন আহমদী আমাদেরকে কাদিয়ানের টিকেট করে দিয়েছিলেন তাই আমি অনুমানের উপর বললাম- আপনি কি আঞ্জুমানের আমিন সাহেব বলছেন? তিনি বললেন, জী, হ্যাঁ। আমি বিষয়টি তাকে বলার পর জিজ্ঞেসা করলাম, আপনার মোবাইল সিমটি কি কখনও হারিয়ে গিয়েছিল? তিনি বললেন, কখনও নয়, আমার কাছে তো মূল সিমই আছে। *(একথাগুলো উর্দূ থেকে অনুদিত)*

আশ্চর্যের বিষয় হল, কুড়িয়ে পাওয়া পরিত্যক্ত সিমটির এবং আমিন সাহেবের সিমের একই নম্বর হওয়া, দু'টি সিমই একত্রে চালু থাকা এবং যতক্ষণ আমাদের প্রয়োজন ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কলগুলো আমিন সাহেবের মোবাইলে না যাওয়া বা আমিন সাহেবকে করা অন্যদের কলগুলো আমার মেয়ের মোবাইলে না আসা এগুলো সব অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

অসম্ভব এই ঘটনার পর আমার মনে পড়ল হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ(আ.) কত সত্যই না বলেছেন, আল্লাহ তা'লা চাইলে এক টুকরো খড়ের মধ্যে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারেন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের সৌভাগ্য দান করুন, আর তাঁর নিত্য নতুন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার শক্তি দিন (আমিন)।

Hazrat Muhammad(sa) is the Greatest of all the Prophets.
We pray for him from the core of our hearts

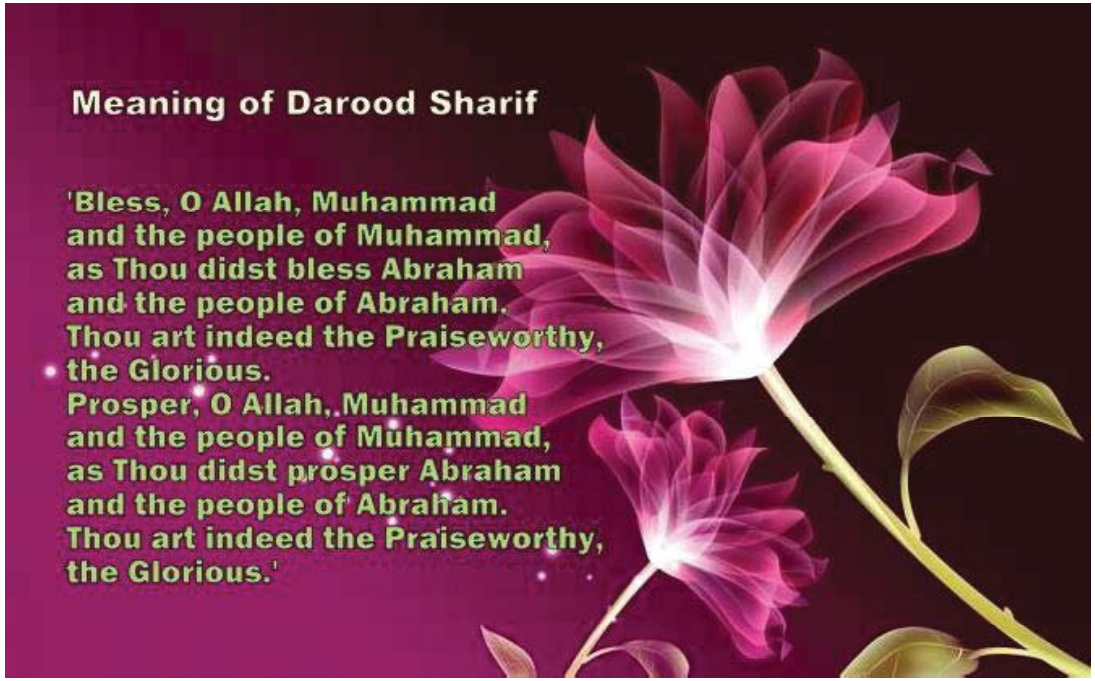

হুযূর(আই.)-এর সাথে কেন্দ্রে কর্মরত মিশনারীগণ (লণ্ডন)
A group photo of the missionaries working at the centre with Huzur Aqdas(aba)

বাংলাদেশী রাজনীতিবিদ মঞ্জুরুল আহসান খান হুযূরের সান্নিধ্যে
Mr. Manzurul Ahsan Khan met Huzur Anwar(aba)

২০০৫-এ যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাবিহুদ্দীন চৌধুরী
ও তাঁর ডেপুটি হুযূরের সকাশে
BD High Commissioner to UK Mr. Sabihuddin & his deputy met Huzur(aba) in 2005

জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব হুযূর(আই.)-এর সকাশে
National Amir Sb. and Maulana Feroz Alam Sb. with Huzur(aba)

আলহাজ্জ মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ হুযূর(আই.)-এর সকাশে
Naib National Amir-3 & Sectetary Jaedad with Huzur(aba)

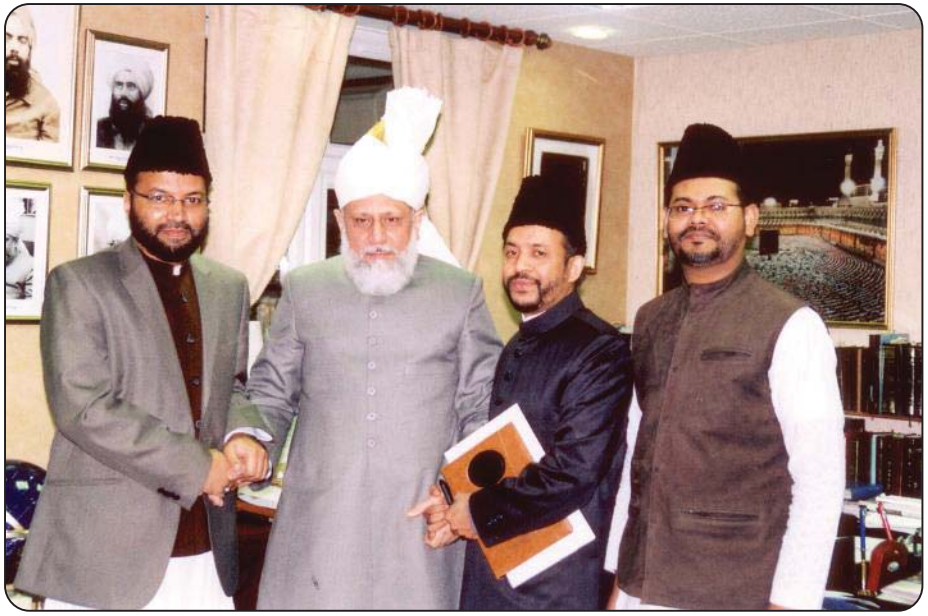

'সত্যের সন্ধানে' আলোচক প্যানেল হুযূর(আই.) সমীপে
'Shotter Shondhane' team with Huzur Aqdas(aba)

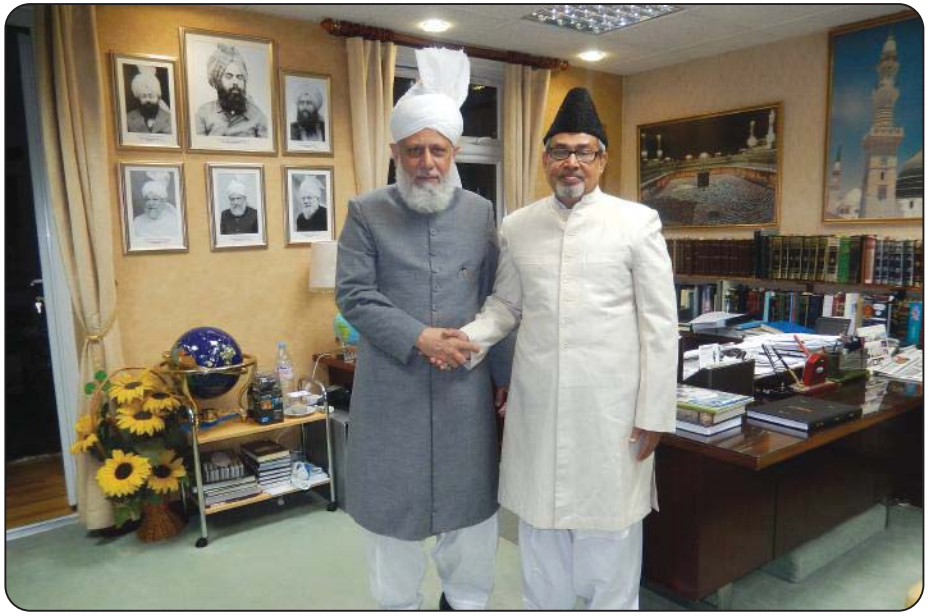

বাংলাদেশ জামেয়ার প্রিন্সিপাল মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি হুযূর(আই.)-এর সকাশে
Maulana Imdadur Rahman Sb. with Huzur Aqdas(aba)

২০০৭-এ ইউকে জলসায় যোগদানকারী মোয়াল্লেম আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব ও মাসুম আহমেদ কোরাইশী সাহেবসহ অন্যান্যরা হুযূর(আই.) সমীপে
Muallim Abdul Wadud and Qureishi Masum Ahmad and others with Huzur

মওলানা ফিরোজ আলম এবং শামসুদ্দিন আহমেদ মাসুম হুযূর(আই.)-এর সকাশে
Maulana Shamshuddin Ahmad Masum and Maulana Feroz Alam with Huzur Aqdas(aba)

আরিফুর রহীম (সর্ব ডানে) ও হাফেজ আবুল খায়ের (দাঁড়ানো) হুযূর(আই.)-এর সকাশে
Maulana Arifur Rahim and Hafez Abul Khair Sb. among others with Huzur

রবিউল ইসলাম ও জিকরে এলাহি মোয়াল্লেম সাহেব [উপবিষ্ট] হুযূর(আই.)-এর সকাশে
Maulana Rabiul Islam and Zikre Ilahi at the feet of Huzur aqdas(aba)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর সান্নিধ্যে মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব
এবং মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব
Janab Meer Muhammad Ali & Mohammad Tasaddaque Hossain
with Khalifatul Masih IV(Rah.)

২০০৫ কাদিয়ান জলসায় হুযূর(আই.)-এর সান্নিধ্যে মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেব
Maulana Muhammad Solaiman met Huzur(aba) at Qadian in 2005

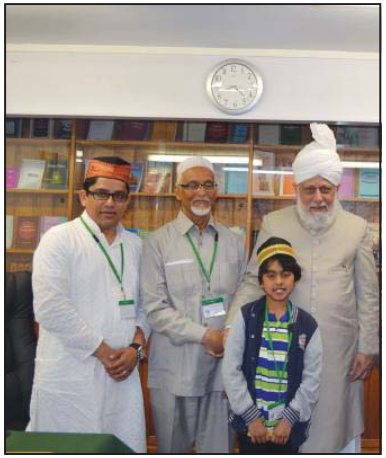

নিউজিল্যাণ্ড পার্লামেন্টের সামনে এবং হুযূর(আই.)-এর দপ্তরে জাহিদুর রহমান সাহেব সপরিবারে সাক্ষাত করেন
Janab Jahidur Rahman Sb. met Huzur Aqdas(aba) in New Zealand

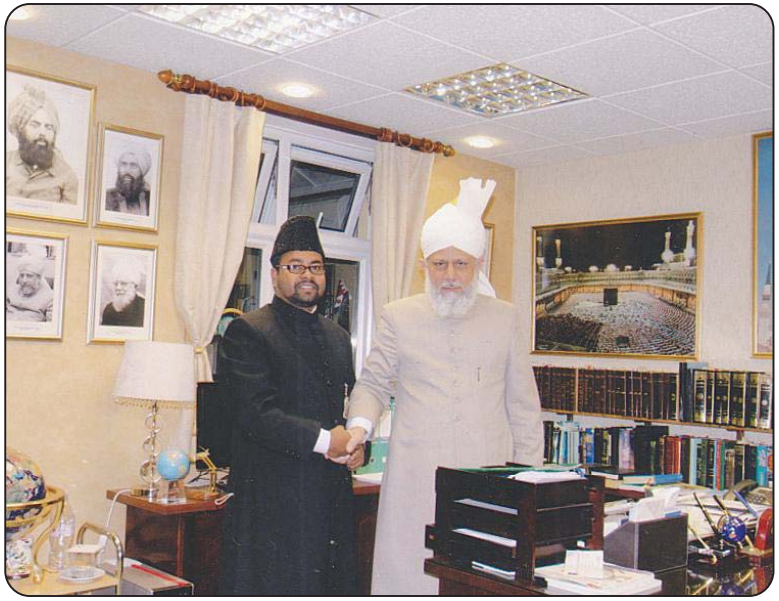

হুযূর(আই.)-এর সাথে মওলানা রবিউল ইসলাম সাহেব
Maulana Rabiul Islam with Huzur Aqdas(aba)

হুযূরের সান্নিধ্যে বাংলা ডেস্কের ও নানাবিধ অনুষ্ঠানের জন্য কর্মরত যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাঙালি স্বেচ্ছাসেবী দল এবং এমটিএ বাংলাদেশের বর্তমান ইনর্চাজ জনাব খায়রুল হক রুমী
The MTA Bangla team working relentlessly at the centre with Huzur Aqdas(aba)

'সত্যের সন্ধানে' স্বেচ্ছাসেবী দল, অক্টোবর ২০০৯ থেকে হুযূর(আই.) বাংলাভাষীদের জন্য সরাসরি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন ('Shotter Shondhane' team members at London)

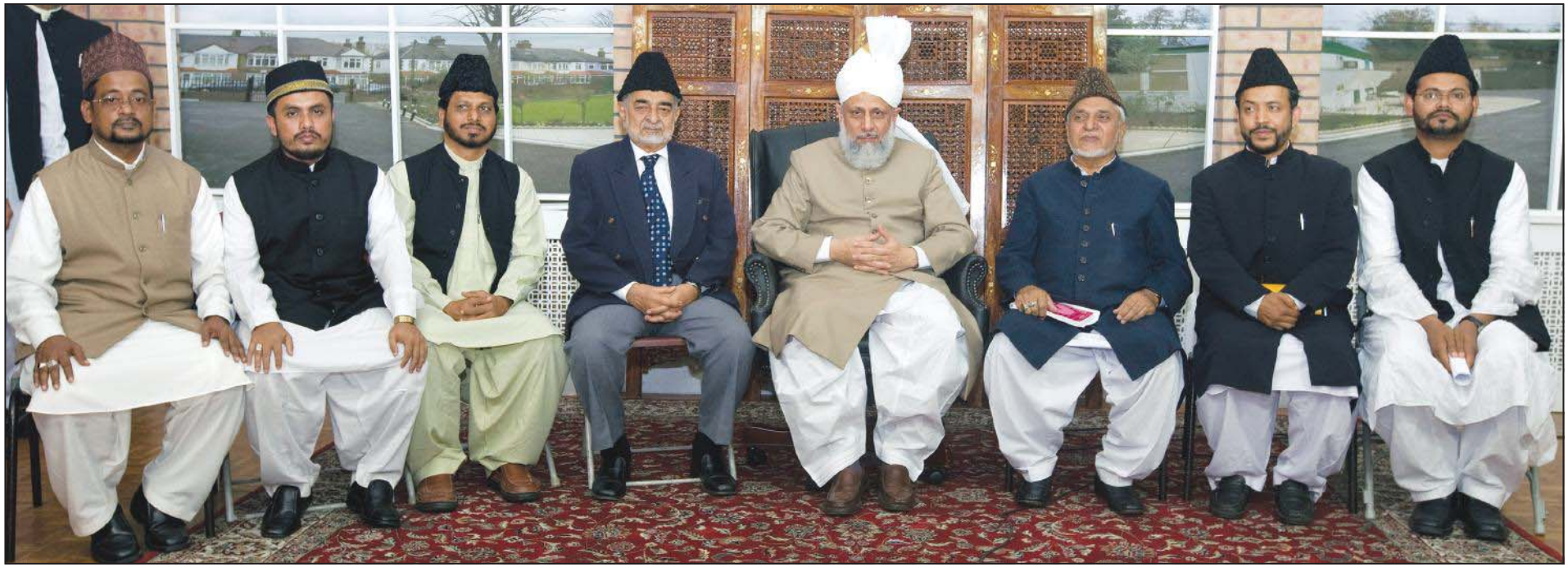

২০০৮-এ লণ্ডন জলসা শেষে হুযূরের সাথে বাংলাদেশের কয়েকজন মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেব (Few Bangladeshi Missionaries with Huzur Aqdas after attending UK Jalsa)

২০১০ ও ২০১২-এ লণ্ডন জলসার শেষে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের কয়েকজন ওয়াকেফে জিন্দেগী
Few Bangladeshi Missionaries with Huzur Aqdas after attending UK Jalsa

কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লণ্ডন-এ নিরলস কর্মে রত দুই ওয়াকেফে জিন্দেগী
Two devout workers at the Central Bangla Desk, London

জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি ও প্রফেসর আনোয়ার হোসেনকে জলসায় স্বাগত জানাচ্ছেন মোতাহার আহমদ চৌধুরী ও অন্যান্যরা
Mr. Rashed Khan Menon MP and Prof. Anwar Hossain being welcomed by Motaher Ahmed Ch. and others at our Jalsa

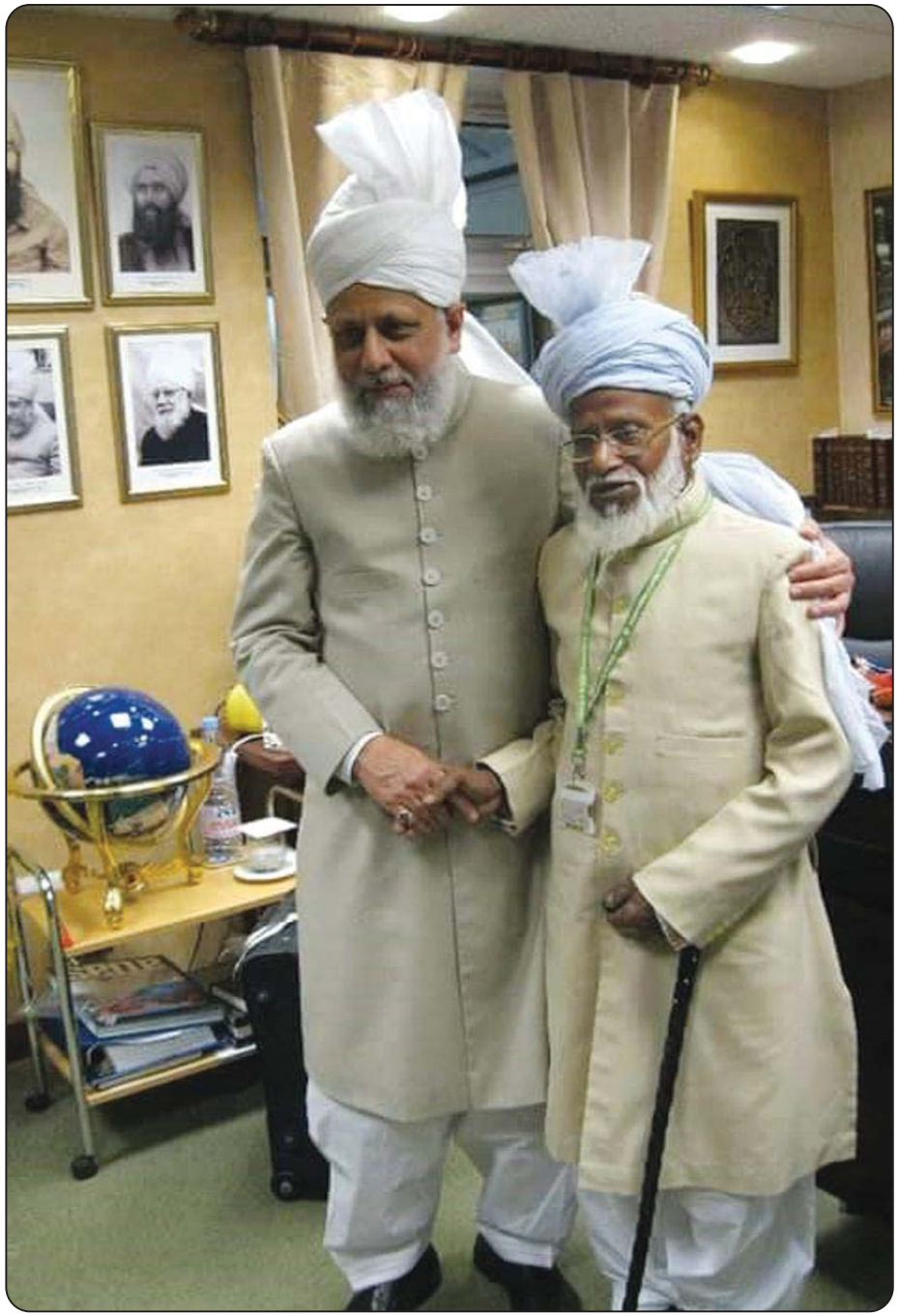

হুযূর(আই.)-এর সান্নিধ্যে প্রবীণ মুরব্বী সিলসিলাহ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব
Maulana Abdul Aziz Sadeque Sb. with Huzur Aqdas(aba)

দু'জন বাংলাদেশী মুরব্বীর রিফ্রেসার্স কোর্স, রাবওয়া, পাকিস্তান (২০০৮)
Two Bangladeshi Murabbis at the office of Chaodhry Hamidullah Sb.

বাংলাদেশী মোয়াল্লেমদের রিফ্রেসার্স কোর্স, কাদিয়ান, ভারত (২০১৪)
Participants of Maullim refresher course at Qadian with Mirza Khurshid Ahmad and Mirza Ghulam Ahmad Sb.

মোয়াল্লেম কোর্স ২০১২-২০১৬
The ongoing Muallim Training Course (2012-2016)

লণ্ডনে জনাব মির্যা আব্দুল হক সাহেবের সাথে কতিপয় বাংলাদেশী আহমদী
Few Bangladeshi Ahmadis meeting Mirza Abdul Haq Sb.

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রে কর্মরত স্টাফবৃন্দ

পিছনের সারির বাম থেকে দাঁড়ানো: ১. মোহাম্মদ ফারুক আহমদ বুলবুল; ২. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম; ৩. মোহাম্মদ মনির হোসেন; ৪. মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম; ৫. মোহাম্মদ আব্দুল মতিন; ৬. মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম; ৭. জি.এম সিরাজুল ইসলাম; ৮. মোহাম্মদ আলী প্রামানিক; ৯. মোহাম্মদ তুহিন ইসলাম; ১০. সেলিম আক্তার ইসলাম খোকন; ১১. মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম। *সামনের সারির বাম থেকে:* ১. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন; ২. মোহাম্মদ আব্দুর রাহিম; ৩. রেজভী মাহমুদ চৌধুরী; ৪. মঞ্জুর ইসলাম; ৫.রফিক আহমদ প্রধান; ৬. মোহাম্মদ নায়েব আলী ভূইয়া;৭. মোহাম্মদ আবু তাহের দুলাল।

মুরব্বী মোয়াল্লেমদের দলীয় ছবি থেকে বাদপড়া চার জন মোয়াল্লেম

বীর পাইকশা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব নুরউদ্দিন আহমদ সাহেবের পিতা জনাব মৌলভী হাসিমুদ্দিন মাস্টার

শান্তির প্রয়াসে
আমরা মুসলমান

ভালবাসা সবার তরে . ঘৃণা নয় কারো পরে

www.muslimsforpeace.org
AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY United States of America
1-800-949-4752 (1-800-Why-Islam)

নিয়মিত ব্রাউজ করুন আর অবক্ষয়মুক্ত থাকুন

www.ahmadiyyabangla.org
www.ahoban.org

খলীফার সান্নিধ্যে

ফিরোজ আলম

বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী স্মরণিকায় কিছু লিখতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত বিষয় হল 'খলীফার সান্নিধ্যে'। এটি খোদার বিশেষ অনুগ্রহ এবং অপার কৃপার লক্ষণ, তিনি পাপীদেরও স্বীয় অনুগ্রহে সিক্ত করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহর সান্নিধ্যের সুমধুর স্বাদ এ অধম প্রথমবার তখন লাভ করে যখন দৈহিক দিক থেকে এ অধম ছিল খলীফাতুল মসীহ থেকে সহস্র-সহস্র মাইল দূরে; বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সূতিকাগার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আর এটি পুনরায় এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে, কোন ব্যক্তি খলীফাতুল মসীহ হতে যত দূরেই অবস্থান করুক না কেন, যদি সে যথাসাধ্য ওয়াকফের প্রেরণা ও চেতনা-সমৃদ্ধ জীবন কাটায় তাহলে তার যৎসামান্য প্রচেষ্টাও এমনভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায় যা মানুষ ভাবতেও পারে না। আমি জানি বাংলাদেশে এখনও এমন অনেক সৌভাগ্যবান ওয়াকেফীন রয়েছেন যারা দৈহিক দূরত্ব সত্ত্বেও খলীফার একান্ত সান্নিধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন। হযরত ওয়াইস্ করণী (ইয়ামানী) মহানবী(সা.) এর জাগতিক বা দৈহিক অর্থে সান্নিধ্য পান নি কিন্তু সারা মুসলিম বিশ্ব জানে তিনি মহানবীর পরম সান্নিধ্যে ছিলেন। যাহোক আমি কয়েকটি ঘটনা পাঠকদের কাছে দোয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। খোদা তা'লা যে দোয়া গ্রহণ করে স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেন, তারই সাক্ষ্য বহন করে এ ঘটনাগুলো। এতে ব্যক্তির কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বা যোগ্যতার বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই বরং তা নিছক রহমান খোদার দান এবং তাঁরই অনুকম্পার প্রতিফলন।

১৯৯৪ সনের কথা; একদিন জুমুআ'র নামায সেরে ঘরে ফিরতেই সংবাদ আসে জনাব আবুল বরকত সাহেবের শিমরাইল কান্দিস্থ বাসায়, ঢাকা থেকে মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেবের ফোন এসেছে আর ফোনে আমাকে তলব করা হচ্ছে। ছুটে গেলাম, ফোন উঠাতেই মওলানা সাহেব বললেন 'মোবারক হো', লণ্ডন থেকে বাংলা ডেস্কের (তদানীন্তন) ইনচার্জ, জনাব ওহীদ খান (মরহুম হযরত মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের দৌহিত্র) সাহেব ফোন করেছেন আর তার মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ আপনাকে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য 'জাযাকুমুল্লা'র বার্তা পাঠিয়েছেন। ইতোপূর্বে এমটিএ'র কোন-কোন অনুষ্ঠানেও হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) অধমের তেলাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছিলেন আর বাংলাদেশ অবস্থানকালে তা শুনেছিলাম বাংলাদেশ জামা'তের সাবেক নায়েব ন্যশনাল আমীর মরহুম ভিজির আলী সাহেব এবং তাদের জামাতা জনাব বশীর আফজাল আওয়াব সাহেবের কাছে । দোয়ার জন্য বলে রাখি, হুযূরের নির্দেশে বাংলাদেশ হতে আমার কণ্ঠে তেলাওয়াত ও বঙ্গানুবাদসহ রেকর্ড করে লণ্ডন পাঠিয়েছিলেন মরহুম রেজাউল করীম সাহেব। খোদার এই নিয়ামতের পূর্ণাঙ্গীন স্মৃতিচারণ কখনই সম্ভব হবে না তাই সংক্ষেপে বলছি। পাকিস্তানে ছাত্রাবস্থায় অবস্থানকালে ১৯৮৫ সনে আমার টনসিল অপারেশনের সিদ্ধান্ত হয়। কেউ-কেউ আমাকে ভয় দেখায়, এর ফলে গলার স্বাভাবিক সুর প্রভাবিত হবে বা নষ্ট হয়ে যাবে, ইত্যাদি-ইত্যাদি। তখন আমিসহ কারোরই জানা ছিল না, একদিন আমার জীবনেও তেলাওয়াত করার বা আযান দেয়ার সুযোগ আসবে। যাহোক মানুষের কথায় আমি ছিলাম সত্যিই শঙ্কিত। আমার সেজদা ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। জনে-জনে, ক্ষণে-ক্ষণে, মসজিদে, অলিতে-গলিতে ধরে-ধরে আমি কাকুতি-মিনতির সাথে দোয়া চাইতে থাকি। খোদার দরবারে মিনতি করে বলি, প্রভু, তুমি আমার কণ্ঠ ঠিক রেখ আর আমাকে এমন কণ্ঠ দাও যেন আমি আমৃত্যু সারা বিশ্বকে তোমার কুরআন পড়ে শুনাতে পারি। ফিরিশতাতুল্য মানুষ হযরত মওলানা শরীফ সাহেব, যিনি দি গ্যাম্বিয়ার গভর্নর জেনারেল এফএম সিংগাটেহ্ সাহেবকে মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পবিত্র বস্ত্র উপহার হিসেবে প্রদানের সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি কয়েকবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার অনুরোধে আমার গলায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেছেন। খোদা তা'লা যে সেসব দোয়া গ্রহণ করেছেন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

এর জলজ্যান্ত সাক্ষী আর আজকের আহমদীয়া বিশ্ব এ সত্যের সাক্ষ্য দেবে। অপরদিকে যে যুগে গলার অপারেশন হতে যাচ্ছিল সে সময় আমার মনের অবস্থা কেমন ছিল তার সাক্ষী হলেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব (খোদা আহমদীয়াতের এই বীর সৈনিককে দীর্ঘজীবি করুন)। আমি তাকেও দোয়ার অনুরোধ করেছিলাম, বলেছিলাম দোয়া করুন খোদা যেন আমায় সুস্থ রাখেন, যাতে আমি বিশ্বকে কুরআন শুনাতে পারি। এ দোয়া যে খোদা পরম স্নেহপরবশ হয়ে কত মহিমার সাথে গ্রহণ করেছেন তার দৃষ্টান্তগুলো যদি একে-একে এখানে উপস্থাপন করতে যাই তাহলে শুধু এ বিষয়েই প্রবন্ধ লিখে শেষ করতে হবে অন্য কোন কথায় যাওয়ার সুযোগ হবে না। ১৯৯৬'র ২৩শে জুলাই বদলি হয়ে লণ্ডন আসি আর শুধু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় দু'দিন পরেই ২৫ জুলাই জলসার অধিবেশনে হযরত আমীরুল মু'মিনীন এ অধমকে তেলাওয়াতের জন্য ডাকেন। খাকসারের পরিচয় দিতে গিয়ে হুযূর যা বলেছেন তার কিছু শব্দ আমার মনে আছে। হুযূর শ্রোতামণ্ডলীকে সম্বোধন করে বলেন, ওনাকে আপনারা জানেন। আপনারা তার আওয়াজের সাথে পরিচিত হবেন। রমযানে তার তেলাওয়াতের ধ্বনি সারা পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। একবার আমার তেলাওয়াত সম্পর্কে বলেছেন, এমন মনে হয় যেন কুরআন এখন নাযেল হচ্ছে আবার কোন সময় বলেছেন, Very touchy recitation। এরপর আরও অনেকবার খোদার স্নেহের বহিঃপ্রকাশ দেখেছি। তাঁর এসব মন্তব্য সব কথার মাঝে যে বিষয়টা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে তা হল খলীফাতুল মসীহর কুরআন-প্রেম অগণিত অনারব আহমদী ও বহু আরব আহমদী তেলাওয়াত সম্পর্কে এ অধমকে বলতেন আর আজও বলেন সওতুল মালাইকাহ্। কিন্তু আমি খুব ভাল করে জানি এক্ষেত্রে মানুষের কোন কৃতিত্ব নেই বরং খোদার পরম স্নেহের বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁরই কুরআনের সৌন্দর্য; কিন্তু আমার পাপে জর্জরিত জীবনে হয়তো আশার একটি কিরণ মাত্র।

আমি খোদার এই অনুগ্রহের জন্য নিজের মাঝে কোন যোগ্যতা খুঁজে পাই না; এমন কোন সমৃদ্ধ পটভূমি আমার নেই যে কারণে খোদার দয়া ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করতে পারি। তবে শুধু একটি কথা মনে পড়ে, জামা'ত আমাকে যখন যেখানে যে অবস্থায় পাঠিয়েছে সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে যাওয়া আবশ্যক বলে মনে করেছি আর নিজের যা ছিল তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। আমার মনে পড়ে ১৯৯৪ সনে খুলনায় ছিলাম। মোহতরম নযীর আহমদ ভূঞা সাহেব (তৎকালীন সেক্রেটারি ইসলাহ ও ইরশাদ) আমাকে খুলনায় ফোন করেন আর বড় লাজুক কণ্ঠে অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, আমরা আপনাকে বি-বাড়িয়ায় পাঠাতে চাই; আপনি কী বলেন? আমি বললাম ভূঞা সাহেব, আপনি জামা'তের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করুন, আমি ব্যক্তিগত পছন্দের কোন বিশেষ স্থানে শিকড় বিস্তৃত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করি নি। ইতোপূর্বে একবার চট্টগ্রামে আমার পোস্টিং অর্ডার হয়। কিন্তু হঠাৎ করে জানতে পারি যে সেটি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। কিন্তু ভুলেও কোন দিন আমার হৃদয়ে কোন অভিযোগ বা আপত্তি দানা বাঁধে নি। খোদা সত্যিকার ওয়াকেফে জিন্দেগীর পাশে দাঁড়ান, সাথে থাকেন।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে(রাহে.) বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির প্রতি দুর্বল ছিলেন। আমরা মোহতরম আবদুল হাদী সাহেবের সন্তানদের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসা দেখেছি, যে বিষয়ে সারা আহমদীয়া বিশ্বও অবহিত। ব্যক্তিগত আগ্রহ নিয়ে তিনি মোহতরম হাদী সাহেবের কন্যা শওকতের বিয়ের প্রস্তাব থেকে আরম্ভ করে ওলীমা পর্যন্ত সকল অনুষ্ঠানে সময় দিয়েছেন। তিনি বাঙালিদের মনস্তুষ্টির আরও একটি নিদর্শন রেখেছেন বাংলা প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের ব্যবস্থা করে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, এ অনুষ্ঠানে কোন এক শুভলগ্নে হযরত আমীরুল মু'মিনীন শওকতের জীবনে পরম যতনে স্বর্ণের ফ্রেমে সাজিয়ে রাখার মত একটি বাক্য উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, আমার কোন তাহাজ্জুদের নামায এমন নেই যাতে আমি শওকতের জন্য দোয়া করি না। এটি শওকতের এক ঈর্ষণীয় মর্যাদা; ধন্য শওকত, ধন্য তার সকল আত্মীয়-স্বজন ও ভবিষ্যত প্রজন্ম। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কথা হচ্ছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর স্মৃতিতে অম্লান। আর সেখানে জামা'তের ক্ষয়ক্ষতির কথাও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে ছিল না। একবার সেখান থেকে প্রাপ্ত এক পত্রের উত্তরে তিনি লিখেছেন "প্রতিটি ইঞ্চি হারানো জমি আপনাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে"। আমার মনে আছে, হুযূরের এই বার্তা আমি যথাসময় পৌঁছে দিয়েছিলাম। আজকের প্রজন্মের অনেকেই তা জানে এবং এ উদ্দেশ্যে পুরো বাংলাদেশ জামা'তকে কাজ করা উচিত।

খলীফাগণ পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করতে ও জাতি গঠনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেন আর বিপ্লবের বহ্নি-শিখা হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। খলীফারা যে জাতি বা শহরকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেন সে শহর, নগর বা জনপদের উচিত তা লুফে নেয়া। সে শহরের প্রত্যেক বিশ্বস্ত ও অনুগত আত্মার এই অঙ্গীকার করা উচিত, হে আল্লাহর খলীফা, আমাদের কাছে আপনার যে প্রত্যাশা একদিন তা অক্ষরে-অক্ষরে আমরা সত্য প্রমাণ করব, ইনশা'ল্লাহ। একদিন দাপ্তরিক সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলে পুনরায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কথা হুযূরের স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, 'জযবাতুল হক'(সত্যের প্রেরণা-অনুবাদক মরহুম মওলানা এজায আহমদ সাহেব) পুস্তিকাটার বঙ্গানুবাদ হয়েছে কি? আমি ইতিবাচক উত্তর দিলে হুযূর বলেন, আমীর সাহেবকে আমার পক্ষ থেকে লিখুন, এ পুস্তক বি-বাড়িয়ার ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা হাতে নিতে। আমরা তখনই বাংলাদেশ জামা'তকে অবহিত করি কিন্তু জানি না খলীফার ইচ্ছানুসারে কতটা কাজ হয়েছে। বি-বাড়ীয়া বলতে শুধু শহরের কিছু ঘর বোঝায় না বরং বৃহত্তর অঞ্চল এ নির্দেশের গণ্ডিভুক্ত। এ নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করার মাঝে প্রভূত কল্যাণ নিহিত। আমার মনে পড়ে, ১৯৯০ সনে সুন্দরবন জামা'ত সম্পর্কেও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে(রাহে.) অনুরূপ একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি সুন্দরবন জামা'ত সম্পর্কে হুযূরের বরাবরে একটি পূর্ণাঙ্গীন রিপোর্ট প্রেরণ করেছিলাম। সে পত্রের উত্তরে তিনি এক প্রাণোদ্দীপক এবং হৃদয়কে আন্দোলিত ও আলোড়িত করার মত এমন একটি পত্র লিখেছেন যা এখনও আমার মন-মস্তিষ্কে বারবার অনুরণিত ও প্রতিধ্বনিত হয় । সুন্দরবন জামা'তকে তা স্মরণ রাখা উচিত। হুযূর লিখেন You have to tame all the lost tigers of Sundarban. (যারা এক সময় অত্রাঞ্চলে আহমদী হয়েছিল পরে কোন কারণে চলে গেছে, তাদের সকলকে খুঁজে বের করতে হবে) এ পত্রের অনুলিপি হুযূর তদানীন্তন আমীর মোহতরম মোস্তফা আলী সাহেবকেও দিয়েছিলেন। জানি না এমন কোন পরিকল্পনার অধীনে সেখানে কাজ হচ্ছে কি-না।

খলীফাগণ খোদার প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। জাতিকে হীনমন্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হয়ে থাকে তাঁদের একটি গুরুদায়িত্ব। আমার মনে আছে, ১৯৭১-এর যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে কোন-কোন অবুঝ হৃদয়ে খিলাফতের সাথেও এক প্রকার দূরত্ব লালন করত; এক প্রকার অভিযোগ তাদের হৃদয়ে দানা বেঁধেছিল। যে কয়বছর খলীফাদের সান্নিধ্যে আছি, আমি এবং আমার সহকর্মীরা দেখেছি খলীফা রাবে এবং খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস ধীরে-ধীরে পিতৃসুলভ স্নেহ আর মায়ের মমতা ও স্নেহের পরশে এমন হীনমন্যতা সফলভাবে দূরীভূত

করেছেন এবং করছেন। তাঁরা আমাদের যা শিখিয়েছেন তা হল খিলাফতে রাশেদা নিজের মাঝে সার্বজনীনতা রাখে, এটি সকল প্রকার ভৌগলিক, জাতিগত বা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে।

মসীহ মাওউদ(আ.)-এর খলীফাগণ বাঙালিদের গভীরভাবে ভালবাসেন। আমরা দেখেছি বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে বাঙালিদের মনস্তুষ্টি সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর প্রতি যে এলহাম হয়েছে সে সুবাদে বাঙালিদের মন জয় করা তাঁরা আবশ্যক বলে মনে করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) এবং এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.)-এর সাথে, এমন অনেক গ্রুপ সাক্ষাতের কথা আমার স্মৃতি এড়াতে পারে না। আমাদের আমীর বা মোবাল্লেগ ইনচার্জ এবং কর্মকর্তারা এই এলহামের কথা স্মরণ করিয়ে বিভিন্ন সময় বহু চাহিদা-অনুরোধ আদায় করেছেন। তাঁরা জানেন, এটিই খলীফাদের দুর্বল স্থান। একবার মোহতরম মওলানা অব্দুল আউয়াল সাহেব এক সাক্ষাতে একথা বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন; হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস(আই.) বিষয়টি বুঝে যান এবং চেহারায় এক সপ্রতিভ পবিত্র মৃদু হাসি সুবিস্তৃত করে বলেন, "দিলজয়ী পর বড়া যোর হে"! অর্থাৎ মনস্তুষ্টির বিষয়ে খুব জোর দিচ্ছেন দেখছি!

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) লণ্ডন স্টুডিও থেকে ১৯৯৮'র বাংলাদেশ জলসায় সরাসরি বক্তব্য রেখেছেন। এক অসাধারণ সাধুবাদ জানিয়েছেন এতে বাঙালি জাতিকে। এমনকি পাঞ্জাবী মৌলভীর সাথে তুলনার নিরিখে বাঙালি মৌলভীদেরও একটি অনিন্দ সম্মানের আসন দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মৌলভীর জন্ম হয়েছে পাঞ্জাবে। বাঙালি মৌলভীদের যদি যুক্তি ও ভালবাসার সাথে বুঝানো হয় তাহলে তারা হঠকারিতা না করে কথা মেনে নেয়। এই সত্য তুলে ধরে খলীফাতুল মসীহ বাঙালি আহমদীদের সকল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ দাবি রেখে গেছেন, পথের দিশা দিয়ে গেছেন– তোমরা বাঙালি ভাল প্রকৃতির মৌলভী সন্ধান করে তবলীগ কর, এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখতে পাবে।

বাঙালি জাতির প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর অপার স্নেহ ও ভালবাসার কথা হচ্ছে। তিনি বাংলার জাতীয় কবি নজরুলকেও অমর করে গেছেন। একদিন হুযূর আমাকে ডেকে বলেন, নজরুলের কোন একটি ভাল কবিতার উর্দূ অনুবাদ করে আমাকে দাও। নির্দেশ পেতেই আমি নজরুল-কাব্য সংগ্রহ করি আর "তৌহীদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম" কবিতাটির অনুবাদ করে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিসে জমা দেই। হুযূর সেই কবিতাটিকে উর্দূ নযমে রূপ দেন। আমাদের শওকত (মিসেস জাকারিয়া) পরবর্তীতে এটি গেয়েও শুনিয়েছে। হুযূরের কবিতার সংগ্রহ 'কালামে তাহেরের' ২০০১-এর সংস্করণে ৪৪ নম্বর নযম হিসেবে এটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দু'তিনজন মুবাল্লেগ ছাড়া বাংলাদেশের আর কারো এ কথা জানা নেই, তাই আমি ভাবলাম একথাটি শতবার্ষিকী স্মরণিকায় এসে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাঙালিদের প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর স্নেহ ও ভালবাসার একটি অপূর্ব নিদর্শন ছিল হুযূরের সাথে বাঙালিদের স্টুডিও মুলাকাত, পূর্বেই এদিকে ইঙ্গিত করেছি। ১৯৯৭-এর এক সন্ধ্যায় হুযূরের ব্যক্তিগত সচিব জনাব মুনীর জাভেদ সাহেব অধমকে ডেকে বলেন, হুযূর প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের জন্য বাঙালিদের সপ্তাহে একঘণ্টা সময় দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রস্তুতি নাও। এ অনুষ্ঠানে পৃথিবীর সকল দেশের বাঙালিরা তাদের ইমামকে প্রশ্ন করার বিরল সুযোগ পেত। আর উত্তরে প্রকাশ পেত বাংলাদেশ ও বাঙালিদের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা, নিবিড়তা, ভালবাসা ও একাত্মতা। কত কাছের মানুষ ছিলেন তিনি বাঙালিদের। এ অনুষ্ঠানে তিনি স্মৃতি রোমন্থন করতেন বাংলার মাটিকে ধন্য করা সে দিনগুলোর। সত্য প্রচার ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে খলীফার নির্দেশের আনুগত্যে তিনি কত দিবস ও রজনী বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে যে অলিতে-গলিতে ঘুরে, কাটিয়েছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। এমনকি একাধিকবার লন্ডন স্টুডিওতে উপস্থিত সকল বাঙালিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, তোমাদের যে কারো তুলনায় আমি বাংলাদেশ বেশি দেখেছি। এই স্মৃতি রোমন্থন যেখানে তাঁকে অনেকবার আবেগ আপ্লুত করেছে সেখানে একই সাথে তিনি তা উপভোগও করেছেন। বহুবার বাঙালি জাতির আতিথেয়তা, বাংলার কাঁঠালের গল্প, এতদ্সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলা ইত্যাদি বর্ণনা করে স্টুডিওতে হাস্যরসে মুখরিত পরিবেশও উপহার দিয়েছেন।

খলীফা রাবে(রাহে.)-এর বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির প্রতি ভালবাসার কথা বলছি। এখানে তাঁর নিজের ভাষায় বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত পূর্ববর্তী খলীফার প্রতি তাঁর আনুগত্যের একটি অমূল্য ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সম্বরন করতে পারছি না– কেননা এ ঘটনা প্রধানত বাঙালিদের সম্পদ। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) বলেন :

"আমি আপনাদের একটি বিশেষ ঘটনা শুনাচ্ছি। এটি তখন ঘটে যখন বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল। আমি ছিলাম করাচীতে। সংবাদ আসে, হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রাহে.) আমাকে একটি দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বলা হয়, অনতিবিলম্বে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা কর। আমি বিমানে আসন রিজার্ভ করার চেষ্টা করি কিন্তু সব আসন পূর্বেই বুক হয়ে ছিল। পিআইএ'তে এক আহমদী কাজ করতেন। তিনি বলেন, সিট পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। আমাকে বলা হল, ওয়েটিং লিস্টে আমার পূর্বে আরও ২০ জনের নাম রয়েছে। একটা সিট খালি হলেও আপনার পূর্বে আরও ২০ জন রয়েছে তাই আপনার জায়গা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমি তাকে দৃঢ়তার সাথে বললাম, আমি যেহেতু খলীফাতুল মসীহ্ কর্তৃক সরাসরি আদিষ্ট হয়েছি তাই আমি অবশ্যই যাবার সুযোগ পাব। বিমানবন্দরে চলে যাই। ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষমান ছিল। তাদের সবাইকে বলা হল, কোন আসন খালি নেই, সকলেই নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে বসেছিলাম, বিমান আমাকে না নিয়ে যেতে পারবে না। হঠাৎ করে টিকেট ডেস্ক থেকে ঘোষণা করা হল, একটি আসন খালি হয়েছে, কারো কাছে যদি টিকেট থেকে থাকে সে এগিয়ে আসতে পারে। আমি আমার টিকেট নিয়ে এগিয়ে গেলাম আর আমাকে তাড়াতাড়ি বিমানে বসতে বলা হল– কেননা, বিমান ছাড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল"। ধন্য বাঙালি জাতি আর ধন্য বাংলাদেশের মাটি। নির্দেশ দিয়েছেন এক খলীফা আর মান্য করলেন পরবর্তী হবু খলীফা। হুযূর এ ঘটনা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শুনিয়েছেন।

বাঙালিদের প্রতি খলীফাদের ভালবাসার বিবরণের ধারাবাহিকতায় আরো দু'একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। হুযূরের ইন্দোনেশিয়ার সফল ঐতিহাসিক সফর থেকে ফিরে আসার পর আমরা ভাবলাম, বাংলা মুলাকাতে হুযূরের সফল প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে স্টুডিওতে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। অনুমতির জন্য লিখলাম, হুযূর অনুমতি প্রদান করেন কিন্তু বলেন, বাড়াবাড়ি যেন না হয়। কোন এক বাঙালি পরিবার সেদিন নিজের বাসা থেকে খাবার রান্না করে এনেছিলেন। আমরা নযম, তেলাওয়াত ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সেই অধিবেশন উপভোগ করেছি। স্টুডিও মুলাকাত অনুষ্ঠানে খলীফার অনেক বিরল গুণাবলী আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। একবার একটি বাঙালি পরিবার হুযূরের অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানের জন্য ঘর থেকে খাবার রান্না করে নিয়ে আসেন। আন্তরিকতা ছিল তাঁদের সুগভীর কিন্তু আমি

ব্যক্তিগতভাবে জানি, তাদের রান্নার হাত ভাল ছিল না। অনুষ্ঠান শেষে আমরা যখন খেতে বসলাম, হুযূর খাবারের ঘ্রাণ নেন কিন্তু তা কোন কারণে (খাবার রান্না করার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার কারণে মনে হয় গন্ধ ছেড়ে দিয়েছিল বা মাছ সঠিকভাবে ভাজা হয় নি) হুযূরের জন্য ছিল অসহনীয়। তাঁর পক্ষে এরপর স্টুডিওতে বসা অসহ্য ছিল। কিন্তু তারপরও জোর করে হুযূর সামান্য খাবার মুখে তুলে নেন আর আমাদের জন্য বসে থাকেন এবং বলেন, তোমরা খাও, আমি আছি। এরপর হুযূর নামাযে যান আমরাও তাঁকে অনুসরণ করি। কিন্তু সবাইকে আশ্চার্যান্বিত করে তিনি রীতি-বহির্ভূতভাবে নামাযের পর আবার স্টুডিওতে ফিরে আসেন যেখানে তাঁর আসার পূর্বেই আমরা খাবার খাচ্ছিলাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, যারা খাবার রান্না করে এনেছে তাদের মনজয় করা হল এ আসার উদ্দেশ্য। তিনি বললেন, আমার মেয়েরা মাছ বেশ পছন্দ করেছেন। সেদিন তিনি অনেকক্ষণ আমাদের সাথে স্টুডিওতে সময় কাটিয়েছেন।

১৯৯৭'র প্রথম দিকে শীতের এক পড়ন্ত বিকেলে আমি তবশীর অফিসের বিপরীতে ফযল মসজিদের চৌহদ্দির পাশে একা-একা দাড়িয়ে নিজভূবনে নিমগ্ন চিত্তে কী যেন ভাবছিলাম আর আমার সবুজ রঙ্গের বস্তা-সদৃস জ্যাকেটের জিপ লাগাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তার ওপার থেকে তবশীর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে দু'টো পবিত্র চোখ গভীর স্নেহের সাথে অপলক নেত্রে আমাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছে। তিনি ছিলেন আমার প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে(রাহে.)। সে দৃশ্য স্মরণ করে ডুঁকরে কান্না পায়, কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে; প্রধানত খোদার পবিত্র চরণে এবং সে সুবাদে তাঁর খলীফার চরণেও। খুব সম্ভব সেদিন সন্ধ্যায় বা পরের দিন মুনীর জাভেদ সাহেব আমাকে বলেন, হুযূর তোমার স্ত্রী সন্তানদের লণ্ডনে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে একথাও বলেন, এত সল্প সময়ে এভাবে পরিবার ডেকে পাঠানোর ঘটনা অতি বিরল; সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। যাহোক আমি হুযূরের সাথে দেখা করতে যাই। খোদার অপার ও অবারিত করুণা এবং স্নেহের কথা বলে শেষ করা যাবে না। ভিতরে যেতেই হযরত আমীরুল মু'মিনীন বললেন, "মা শা'ল্লাহ্ চশমে বদ্দূর (খোদা সকল অশুভ দৃষ্টি থেকে তোমায় রক্ষা করুন) আর সাথে-সাথে ঘণ্টি বাজিয়ে জনাব মুনীর জাভেদ সাহেবকে ডেকে বলেন ওনার মাকে ডাকার ব্যবস্থা করুন আর আমীর সাহেবকে বলুন প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র প্রস্তুত করতে। আমার দুঃসাহস দেখুন, আমি বললাম হুযূর আমার শাশুড়ীকেও ডাকতে হবে। হুযূর বলেন তা কেন? আমি নিবেদন করলাম, শুধু আমার মাকে ডাকলে আমার স্ত্রী মর্মাহত হতে পারেন। তাঁর নীরব কান্না সহ্য করা কঠিন হবে। হুযূর বলেন ঠিক আছে, কিন্তু তাঁকে আনার খরচের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে"। আমি বললাম করব ইনশা'ল্লাহ।

নব্বই'র দশকে কোন এক সময় এই অধম একটি বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। নাম উল্লেখ না করে বলছি, লণ্ডনের কোন একটি কেন্দ্রীয় বিভাগের একজন কর্মকর্তা আমার প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন। আমি কারো উল্লেখ না করেই হুযূর(আই.)-এর কাছে দোয়ার পত্র লিখি, হুযূর আমি একটি বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি; আপনি আপনার দাসের জন্য দোয়া করবেন। এ পত্র পাঠের পর হুযূর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি জনাব মুনীর জাভেদ সাহেবকে ক্যামব্রিজে আমার বাসায় ফোন করতে বলেন। তিনি ফোন করে বলেন, হুযূর আপনার পত্র পড়েছেন, দুশ্চিন্তার কারণ জানতে চেয়েছেন এবং আপনাকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে বলেছেন। আমি পরের দিন এসে সাক্ষাত করি, তিনি আমায় দোয়া দেন এবং ব্যাপার জানতে চান; আমি বিস্তারিত জানালাম। হুযূর দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না আমি তাকে বুঝিয়ে দেব। আমি বললাম, হুযূর আমি নিজে তার সাথে কথা বলে নিব, আশা করি বিষয়ের সমাধান হয়ে যাবে। আমি হুযূরের পবিত্র চেহারায় হাসির পবিত্র আভা দেখতে পাই। কোন-কোন সময় হুযূরের অফিসে ঢুকলেই এ বলে দোয়া দিতেন" মা শা'ল্লাহ চশমে বদ্দূর"– অর্থাৎ, আল্লাহ সকল অশুভ দৃষ্টি থেকে তোমায় নিরাপদ রাখুন।

খলীফার বদান্যতা, উদারতা ও ভালবাসার আর একটি দৃষ্টান্ত দেয়ার লোভ সম্বরন করতে পারছি না। খলীফাগণ জামা'তের প্রতি যে সুগভীর ভালবাসা হৃদয়ে লালন করেন তা দূরে অবস্থানকারী বা যে এর অভিজ্ঞতা রাখে না তাকে বলে বুঝানো সহজ বিষয় নয়। আমার মনে আছে, ১৯৯৯ সনের কথা। খুব সম্ভব হযরত আমীরুল মু'মেনিন খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) ৪১ নম্বর গ্রীসেন হলে অবস্থান করছিলেন, কেননা ১৬ গ্রীসেন হলে তখন মেরামতের কাজ হচ্ছিল। আমি আমার দাপ্তরিক সাক্ষাতের পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর সাথে দেখা করতে যাই। বাংলাদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদীর মঞ্জুরী বা অনুমোদন নেই। বাংলাদেশ জামা'ত মোহতরম মওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেবের চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র বদলির আদেশ দেয়, যিনি খুলনা মসজিদে বোমা হামলার ঘটনায় এক পা হারিয়ে অমর। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি সাময়িকভাবে বদলি স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন। তাঁর কথা যখন আমি হুযূরের সামনে উপস্থাপন করলাম সেই দয়ার সাগর, আমাদের ইমাম ,আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন, আবেগের আতিশয্যে তাঁর আওয়াজ হারিয়ে যায়। শুধু এতটুকু বলতে পারলেন আমীর সাহেবকে বলুন, আপাতত তাঁকে চট্টগ্রাম থাকতে দেয়া হোক ।

দোয়া গ্রহণ করে খোদা তা'লা স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেন– সে কথা বলাই আমার সকল স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্য। ১৯৯৯ সনের শেষের দিকে এক দিন আসরের নামাযের পূর্বে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) মাহমুদ হলে বেডমিন্টন খেলছিলেন। আমি ফযল মসজিদে আযান দেই– যা তখনও আমার একটি বিরল রীতি ছিল। হুযূর আযানের ধ্বনি শুনতে পান। হুযূর প্রধান নিরাপত্তা রক্ষী জনাব মেজর মাহমুদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, আজ কে আযান দিয়েছে? তাঁকে অবহিত করা হয়। মাগরিবের নামাযের পর হুযূর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা সাক্ষাতকারের জন্য স্টুডিওতে আসেন। নিজ নির্ধারিত আসন অলংকৃত করার পর হুযূর একটি প্রশ্ন করে স্টুডিওতে এক রহস্যঘন পরিস্থিতির অবতারণা করেন । তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, আজকে আমি খুব সুন্দর একটি আযান শুনেছি– আপনারা জানেন কি কার আযান ছিল? কেউ বলতে পারে কি? (অথচ তিনি জানতেন) তিনি একটি সাসপেন্স সৃষ্টি করেন আর শেষে নিজেই বলেন ফিরোজ আলম সাহেবের আযান ছিল? আর তখনি তিনি নির্দেশ দেন, আপনি এখন থেকে নিয়মিত আযান দেবেন। খোদার অপার কৃপায় পনের বছরের এ পথ চলা আজও অব্যাহত আছে। ঐশী কৃপার এক সুমহান দ্বার আযানের মাধ্যমে এ অধমের জন্য অবারিত হয়েছে। সারা আহমদীয়া বিশ্ব আযানের সময় এই অধমের জন্য দোয়া করে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস(আই.) ২০০৩ সনে যখন খিলাফতের আসনে সমাসীন হন, প্রথম সাক্ষাতেই জিজ্ঞেস করি, আমি আযান দিব নাকি অনুবাদ করব? হুযূর বলেন আযান দিন– কেননা মানুষ পছন্দ করে। খোদা তা'লা আমাকে আযানের কল্যাণে অঢেল দিয়েছেন। পৃথিবীর অনেক মানুষ আযান সম্পর্কে বহু স্বপ্ন আমাকে শুনিয়েছে। এমন লোকদের মাঝে পাকিস্তানের নর-নারীরাও রয়েছেন। 'দি গ্যাম্বিয়া' থেকে এক কৃষ্ণাঙ্গ আহমদীও লিখেছেন। আমেরিকার আহমদীরা এমন-এমন মন্তব্য করেছেন– যা লিখতে কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কাদিয়ান থেকেও পত্র এসেছে, আর আরব

আহমদীরা আযানের প্রশংসায় সর্বাগ্রে। আমি যা লিখলাম আমার সহকর্মী জনাব আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেবও এর কোন-কোনটির সাক্ষ্য দিতে পারবেন। এমনকি বাংলাদেশের একটি পত্রিকা রমযান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিনা কারণে অধমের ছবি ছাপিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রেডিও আহমদীয়ায় এ আযান প্রচারিত হয়। জার্মানির জনৈক আবদুল্লাহ সাহেব তাঁর এক দিব্য অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন– যা তিনি প্রথমে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস(আই.)-কে শুনিয়েছেন আর পরে হুযূরের অনুমতি সাপেক্ষে আমাকেও অবহিত করেছেন। এ ব্যক্তি জলসা সালানা বাংলাদেশের সময় স্টেজে বসেছিলেন। আরও অনেক এমন কথা স্মৃতিপটে এখন জাগ্রত আছে যা বলার জন্য কলেবর অপর্যাপ্ত আর আত্মপ্রচারেরও ভয় হয়।

সত্যিকার অর্থে এ আযান, এই গ্রহণীয়তা মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ। এটি এ কথার প্রমাণ, তিনি জীবনের বিশেষ কোন মুহূর্তে, অহংকার ও আত্মশ্লাঘামুক্ত হৃদয়ের বিগলিত ক্রন্দন বৃথা যেতে দেন না। সত্যকথা হল, আমি খুব ভাল আযান কোন সময়ই দিতে পারতাম বলে মনে করি না। আজও যে আমার আযান আহামরি কিছু একটা তা-ও হলফ করে বলতে পারব না। কিন্তু খোদার মহিমা এখানেই। তিনি এক অথর্ব ও পাপীকেও এমন সম্মান দিতে পারেন– যা শুধু যোগ্যতার বলে অর্জন করা যায় না। এটি আসলে ১৯৮২-৮৩ সনে কৃত এক হৃদয়-বিগলিত দোয়ার পরিপূর্ণতা ছিল; দোয়া করেছে এক পাপী আর পূরণ হয়েছে এক পুণ্যাত্মা খলীফার অপার বদান্যতায় আর দোয়া কবুল করেছেন "মুজীবুদ্ দা'ওয়াত" মহান প্রভু।

একদিন জামেয়ার ক্লাস শেষে আমরা নাসের হোস্টেলের দিকে আসছিলাম। হাসান ইকবাল মসজিদের উত্তরে প্রবেশ দ্বারের কাছে আসতেই আমার কানে একটি আযানের সুমধুর ধ্বনি প্রবেশ করে। এত মধুর ছিল সে ধ্বনি যে, হঠাৎ করে এক গভীর প্রেরণায় দোয়ার প্রতি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তখন আমার পুরো অন্তরাত্মায় কেবল একটি বাসনা বিরাজমান ছিল, হায় যদি আমি এত সুন্দর করে আযান দিতে পারতাম। এই আযান দিচ্ছিলেন জনাব আহমদ দাউদ বা ড্যাডী যিনি এখন জামেয়া আহমদীয়া তানযানিয়ার শিক্ষক (তিনি স্থানীয় তানযানিয়ান)। সত্যিকার অর্থে আমি মনে করি তাঁর আযান আমার আযানের তুলনায় উন্নত মানের । আমি তখনই সেখানে দাঁড়িয়ে এক অদম্য ও অনির্বচনীয় বাসনা ও বেদনার সাথে খোদার কাছে আযান দেয়ার শক্তি ও সামর্থ লাভের দোয়া করি। নরাধমের সে দোয়া গৃহীত হয় ১৯৯৯ সনে আর তখন থেকে আজ ১৫টি বছর খোদা তা'লা দোয়া কবুলিয়তের মাধ্যমে নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে চলেছেন।

খলীফাগণ সমসাময়িক জগতে সবচেয়ে স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী হবার সুবাদে অন্যের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল হয়ে থাকেন আর অন্যদের জন্য তাঁরাই সবচেয়ে বেশি মর্মযাতনায় ভুগেন। আমার মনে আছে, বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বিরোধিতা ও মুখালেফাতের প্রেক্ষাপটে যখন খলীফাতুল মসীহ রাবের কাছে যেতাম বা এখন খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেসের কাছে যাই মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করি যে স্নেহময়ী মায়ের চেয়ে বেশি ভালবাসেন তাঁরা আহমদীদের। খলীফা রাবেও বলতেন আর খলীফাতুল মসীহ আল-খামেসও যখনই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, বলেন, আমীর সাহেবকে বলুন ক্ষতিগ্রস্তদের দেখাশোনা করতে। তারা যেন মুহূর্তের জন্যও মনে না করেন, তাদের খোঁজখবর নেয়ার কেউ নেই। কোন স্থানে কোন আহমদী যেন নিজেকে অসহায় মনে না করে। খুলনার ঘটনার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) এবং চাঁনতারার ঘটনার প্রেক্ষাপটে বর্তমান হুযূর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস প্রায় একই ধরনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। খুলনার ঘটনার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) আহমদীদের জন্য গভীর উৎকণ্ঠার মাঝে ছিলেন। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা যখন এক জায়গায় সাহায্য করতে কালক্ষেপণ করছিল হুযূর তাদের জন্য এতটা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, তাদের সরাসরি এখান থেকে সাহায্য পাঠানো হোক, আর তা করা হয়েছে। অথচ সাধারণ পরিস্থিতিতে খলীফাগণ এমনটি করেন না।

মনে পড়ে, একবার বাংলাদেশের এক আহমদী হুযূরকে লিখেছেন, তাঁর অসুস্থতার কারণে স্ত্রী সন্তানরা তাকে বোঝা মনে করে। হুযূর-সমীপে যখন এটি উপস্থাপন করা হয় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন আর স্থানীয় আমীর সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, এখনই যদি আমরা মানুষের দুঃখ-কষ্টের বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে পড়ি আর আমাদের চেতনাবোধ হারিয়ে যায়, তাহলে চলবে কি করে? আমাদের যে এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এখনই এ ব্যক্তির নামে জামা'তের পক্ষ থেকে ওযীফা জারী করা হোক। হুযূর আরও বলেন, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের জানিয়ে দিন, তাঁর দেখাশুনা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা যথাসময়ে শ্রদ্ধেয় ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছি আর তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

ক্যামব্রিজ থাকাকালে একদিন রাতদুপুরে বিনা কারণে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। একে-একে আমার স্কুল জীবনের শিক্ষকদের কথা মনে পড়তে থাকে। বিশেষ করে আমার এক বুযুর্গ হিন্দু শিক্ষক জনাব সুরেন্দ্র বাবুর কথা মনে পড়ে। আমার চোখ থেকে অশ্রু ধারা বইতে থাকে যা কোনভাবে বাঁধন মানছিল না। কেবলই ভাবছিলাম যে আমি আমার শিক্ষকদের জন্য জীবনে কিছুই করতে পারি নি যারা আমাকে এতকিছু দিয়েছেন। ভাবছিলাম যদি আমার এই শিক্ষকের সাথে দেখা হত অনন্ত একটা উপহার দিতে পারতাম। এই প্রবল বাসনা নিয়ে অশ্রুশিক্ত নয়নে কখন ঘুমিয়ে পড়ি জানি না। ২০০৭ সনে বাংলাদেশ যাওয়ার

সুযোগ হয় আর কুমিল্লার জনাব আবদুস সালামকে নিয়ে আমার গ্রামের বাড়ি ফেনী যাই। ফিরে আসার পথে যখন আমার শিক্ষকের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম একটি বার তাঁর বাড়ি যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে হল। আমি জানতাম না তিনি জীবিত কি মৃত। একজনকে জিজ্ঞেস করে আমার শিক্ষকের ঘরে প্রবেশ করি। দেখতে পেলাম তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন আর, তাঁর পার্শ্বে দণ্ডায়মান তাঁর এক উচ্চশিক্ষিত ভাতিজা। তাদের সাথে কথাবার্তায় বুঝলাম যে, তারা তাঁর এই কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইছেন কেননা তাঁর কষ্টের যুগ অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে । আমি তাঁর কপালে হাত রাখলাম এরপর আমি এবং আবদুস সালাম সাহেব তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ইসলামের খোদার কাছে দোয়া করলাম আর তাঁকে ফলফলাদি কিনে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে তোহফা দিয়ে আসলাম। সেখান থেকে আমি এবং সালাম সাহেব রাতে চট্টগ্রামে ভাইয়ের বাসায় ঢুকতেই ভাবী জানালেন, গ্রাম থেকে ফোন এসেছে, জনাব সুরেন্দ্রবাবু ইন্তেকাল করেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি কী হচ্ছিল। যাহোক ফিরে এসে এ ঘটনা এবং ঘটনার পটভূমি হুযূরকে শুনালাম; হুযূর শুধু একটি বাক্য বললেন, " শিক্ষক পিতৃতুল্য হয়ে থাকেন"। খোদা তা'লা এভাবে দোয়া কবুল করেন।

২০১০ এর শেষের দিকে মায়ের অসুস্থতার সংবাদ আসে । বিদেশ-বিভূইঁয়ে সবসময় মায়ের মৃত্যু নিয়ে আমি শঙ্কিত থাকতাম। ফোন করলেই আমার মা বলতেন " হুতেরে আর দেকমু নি" আমার প্রিয় আল্লাহ্‌তে আমার আস্থা ছিল। আমি মাকে জোর কণ্ঠে বলতাম, দেখবেন ইনশা'ল্লাহ। একই সাথে খোদার কাছে নিবেদন করতাম, আল্লাহ্ মাকে যখন তুমি ডেকে পাঠাবে সে সময় এ অধমকে মায়ের সামনে রাখার পুরো কুদরত বা শক্তি তোমার আছে। আম্মার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে হুযূরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ২০১০ এর ১৭ই নভেম্বর বাংলাদেশ পৌঁছি। মোহতরম মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব এবং চৌধুরী মোতাহার সাহেব আমাকে রাতের ট্রেনে বসিয়ে দেন। আমি পরের দিন সকালে গ্রামে পৌঁছি। সোজা আমার মায়ের কাছে যাই। মা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় বিছানায় শায়িত ছিলেন। সবাই তাঁকে বললেন আপনার ছেলে এসেছে। তিনি চোখ খুলেন নি; শুধু বলছিলেন কৈ-কৈ? পাশে দাঁড়ানো আত্মীয়রা বারবার মাকে এ কথা বলে আর মা আমার আহত অনুভব করেন তাঁর হাত ছিল আমার হাতে। মায়ের কপালে চুমু খেলাম। ডাক্তার ডাকালাম তিনি দেখে ড্রিপ দিলেন; কিন্তু তিনি তখন পরপারের যাত্রী ছিলেন। ঈদের দিন ছিল। আমি ঈদের নামায পড়িয়ে সোজা মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঈদ মোবারক বললাম, তিনিও অতি উচ্চঃস্বরে শেষ বাক্যটা বললেন "ঈদ মোবারক"। তখন তাঁর ফিরে না আসার দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। তিনি দু'টোর দিকে ইন্তেকাল করেন। আর আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হুযূরকে সংবাদ পাঠিয়ে দিলে তিনি উত্তর পাঠান "আলহামদু লিল্লাহ্ মৃত্যুর পূর্বে আপনার সাথে সাক্ষাত হয়ে গেছে।" ফিরে এসে হুযূরের সাথে সাক্ষাত করলাম, অফিসে ঢুকতেই হুযূর বলেন আমার ধারণা ছিল আপনি আরও কিছু দিন দেশে অবস্থান করবেন। যাহোক বড় স্নেহের সাথে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করেন আর মায়ের জানাযা পড়ানোর অনুরোধ করলে এত সুন্দরভাবে সাড়া দেন, স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলাম আমার অনুরোধ করার পূর্বেই তিনি গায়েবানা জানাযা পড়ানোর সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। হুযূর খুতবায় আমার মায়ের কথা উল্লেখ করেন এবং জানাযা পড়ান। এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং আমাদের সকল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এক অমূল্য প্রাপ্তি। আমাদের এই দুঃখের সময় আসেন ঢাকা থেকে নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব শাহাবুদ্দীন সাহেব, মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব তাঁর স্ত্রী (বর্তমান সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ) ও সন্তানদের নিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়ান। একইভাবে ফাযিলপুরের আহমদী ভাইয়েরা এবং সাথে লাজনার সদস্যারাও আসেন।

আমার স্ত্রী সায়্যেদাহ্ শাহেদা ২০১১ সনে প্রায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। ডাক্তার কোনভাবে তাঁর রোগ নির্ণয়ে সক্ষম হয় নি। আমাদের ব্যস্ত জীবনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে। হযরত আমীরুল মু'মেনীনের কাছে দাপ্তরিক সাক্ষাতে যাই, মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান সাহেবও সাথে ছিলেন। আমার চেহারা ও দেহে আমার স্ত্রীর অসুস্থতার ফলাফল স্পষ্ট ছিল। অন্যরা না বুঝলেও যিনি স্নেহ করেন তিনি স্নেহভাজনদের দেখলেই বুঝতে পারেন । হুযূর দেখতেই বলেন আপনি কেন ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন? আমার কিছু বলার পূর্বেই মোহতরম মওলানা সাহেব নিবেদন করেন, হুযূর তিনি স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যাহোক এরপর হুযূর বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেন এবং অন্যান্য ডাক্তারদের চিকিৎসার সাথে জড়িত করেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলতে থাকে।

একদিন আমার স্ত্রী সায়্যেদাহ্ শাহেদার রিমোটলজিষ্ট, প্রফেসর কেলির (হুযূরও মাঝে-মাঝে তাঁর পরামর্শ নেন) সাথে এপয়েন্টম্যন্ট ছিল। সেদিন আবার হুযূরের সাথে আমার দাপ্তরিক সাক্ষাতও ছিল। আমি অফিসে জানিয়েছিলাম, এপয়েন্টমেন্টের কারণে দেরী হয়ে গেলে হুযূরের বরাবরে আমার সমস্যার কথাটা জানিয়ে যেন ক্ষমা চাওয়া হয়। যাহোক আমি সেদিন হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে পারি নি। স্ত্রীর বাহ্যত টার্মিনাল রোগ, কাজের ব্যস্ততা, বাচ্চাদের দেখাশুনার কাজ, অফিসের দায়িত্ব আবার কিছুটা বিলম্বে পৌঁছানোর কারণে আমীরুল মু'মেনীনের কিছুটা অসন্তুষ্টি– এককথায় সার্বিক পরিস্থিতি আমার হৃদয়ে এক গভীর বেদনাঘন আবহ সৃষ্টি করে আর এর ফলে আমার নামায প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আমীরুল মু'মেনীনের বরাবরে পত্র লিখি,"হুযূর আমি মুলাকাতের জন্য নির্ধারিত বা প্রদত্ত সময়ের এক বা দু'মিনিট পরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর প্রফেসর কেইলির সাথে এপয়েন্টমেন্ট থাকার কারণে সাথে যেতে হয়েছে , কেননা তিনি প্রধাণত কখনও ইংরেজীতে অনেক বেশি ভাল ছিলেন না আর আজ কাল ঔষধের প্রভাবে কথা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন না"। এ বাক্যগুলোর মাঝে যে আন্তরিক বেদনার মিশ্রণ ছিল তা হুযূর অনুধাবন করতে পেরেছেন। এক স্বচ্ছ হৃদয় ব্যথিত হৃদয়ের ব্যথা বুঝে। পরবর্তী মুলাকাতে যখন যাই, আমি আমার প্রিয় ইমামের হৃদয়ে আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য পুরো সপ্তাহ যে ব্যথা বিরাজমান ছিল তা কিছুটা আঁচ করতে পারি। যেতেই আমার স্ত্রীর কথা তুলেন। নিজেই কিছু ভেষজ ঔষধ প্রস্তাব করেন, বিভিন্নভাবে আমার মন জয়ের চেষ্টা করেন। ড্রয়ার থেকে অতি উন্নতমানের একটি পারফিউম বের করে আমাকে উপহার দেন। আর প্রফেসর কেইলি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। এমন ব্যবহার কেবল মনোনীতদেরই বৈশিষ্ট্য।

২০১৪ সনের প্রথম 'সত্যের সন্ধ্যানে' অনুষ্ঠান সমাপনান্তে হুযূরের কাছে রিপোর্ট দিতে গিয়ে আমি বলে ফেললাম, প্রোগ্রাম বেশ ভাল হয়েছে মোট শ্রোতার সংখ্যা ছিল ৬০২০। হুযূর তাৎক্ষণিকভাবে বলেন যেদিন ৬০২০টি বয়াত হবে সেদিন বুঝব প্রোগ্রাম ভাল হয়েছে। একই সাথে বলেন, এ কথা আমীর সাহেবকে লিখে পাঠিয়ে দিন। হুযূরের কথা থেকে স্পষ্ট, আমাদের তবলীগের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে– নতুনভাবে পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। খোদা তা'লা আরেকবার বাংলাদেশের আহমদীদের সুযোগ দিয়েছেন। পুনরায় বাংলাদেশ জামা'তকে খোদা অনুকূল পরিবেশ উপহার দিয়েছেন। সে অনুসারে কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত।

১৯৯৭ সনে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ, হযরত

খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর সমীপে তাদের ইজতেমায় একজন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে। আমার বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা হয়। হুযূর আমাকে তাদের ইজতেমায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দু'একদিনের মাথায় বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ও তাদের অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ করে। হুযূর অধমকে বলেন, আপনি যদি আনসারুল্লাহ্ভুক্ত হতেন তাহলে তাদের ইজতেমায়ও আপনাকেই প্রতিনিধি নিযুক্ত করতাম। আমি অক্টোবর মাসে দেশে যাই। খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা ও শূরার কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি নেই। শূরায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোন একটি বিষয়ে হুযূরের অনুমোদনের জন্য আমি কানাডায় একটি ফ্যাক্স করি কেননা হুযূর তখন কানাডার সফরে ছিলেন। সেখান থেকে হুযূর যে উত্তর দিয়েছেন তা আমার মতে বাঙালিদের অমূল্য সম্পদ। তা আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে। যদি আজ তা আমাদের ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়ে যায় কাল তা ভুলতে বা ভুলাতে পারবে না। যুগ-মাহদীর ওহীতে বাঙালিদের মনজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেখানে খোদা পুরো বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেছেন সেখানে বিশেষভাবে বাংলাদেশের আহমদীদেরও সম্মানিত করেছেন তাদের আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিসে নিহিত তা তাঁর খলীফাকে অবহিত করে। এমটিএ'র প্রাথমিক বছরগুলোতেই হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। অন্য কোন খলীফার স্বপ্নে এভাবে বাংলাদেশের আহমদীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কি-না তা আমি জানি না। তাই আমি মনে করি, হুযূরের ব্যক্তিগত সচিব জনাব মুনীর জাভেদ সাহেব '৯৭ সনের ৫ই অক্টোবর অধমের নামে যে পত্র লিখেছেন তা সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। সে পত্রের বঙ্গানুবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে লেখাটির সমাপ্তি টানব। *(মূল পত্র বাংলাডেস্ক লণ্ডনে সংরক্ষিত আছে)*

পত্র ও স্বপ্নের বঙ্গানুবাদ :

হযূর বলেন "ঠিক আছে, তাদের শূরার সদস্যপদ প্রদান করুন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হল দু'তিন দিন পূর্বে রাতের দ্বিতীয় প্রহরে, একথার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমাকে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখানো হয়, আপনারা সেখানে অনুবাদের কাজে গতি সঞ্চার করুন। এখান থেকে যা কিছু বলা হয় তা খুবসম্ভব সবাই শুনেই না। তাই, যদি এ সবের অনুবাদ করে এর প্রসার ও প্রচার করা হয় আর একই সাথে ভিডিওর কাজেও গতি ও ব্যাপ্তি সৃষ্টি করা হয় তাহলে লাভবান হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং এদিকে তাৎক্ষণিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন"।

মুনির জাভেদ (প্রাইভেট সেক্রেটারি)

৫-১০-৯৭

এ পত্রে বাংলাদেশের আহমদীদের যে সকল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলো হল:

১. অনুবাদের কাজে গতি সঞ্চার করুন: খলীফাদের খুতবা, বক্তৃতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ ও খলীফাদের সকল পুস্তকাদি এসবই অনুবাদ কর্মের আওতাভুক্ত।

২. এখান থেকে যা কিছু বলা হয় তা খুব সম্ভব শুনেই না। খলীফার খুতবা ও বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রথমে শোনা তারপর তা মেনে চলার প্রতি সর্বস্তরের আহমদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। কর্মকর্তা থেকে আরম্ভ করে সকল আহমদী এর অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রতিদিন এমটিএ শোনার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

৩. অনুবাদ করে এর চর্চা, প্রচার ও প্রসার। অর্থাৎ অনুবাদ করে কেবল লাইব্রেরী বা ঘরে রেখে দেয়া নয় বরং প্রসারের প্রতি মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে। খুতবা বা অন্যান্য বক্তৃতাগুলো অনুবাদ করে প্রসার ও প্রচার করতে হবে। এমটি-এর সামনে পরিচিত লোকদের এনে বসানো আর একটি মাধ্যম। প্রচার প্রসারের যত দিক ভাবা যায় সব এর অন্তর্গত।

৪. ভিডিওর কাজেও গতি ও ব্যাপ্তি : অর্থাৎ, এমটিএ-তে প্রচার ও প্রসারের জন্য নতুন নতুন ভিডিও প্রোগ্রাম রেকর্ড করা। এ সম্পর্কে বসে এমটিএ বা সংশ্লিষ্টদের পরিকল্পনা করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে স্বপ্নে।

অতএব খলীফাতুল মসীহর স্বপ্নে যে সকল বিষয়ের প্রতি বাংলাদেশ জামা'তের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে আল্লাহ তা'লা সকলকে সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার তৌফিক দিন, নিজ-নিজ দায়িত্ব পালনের সুযোগ ও সামর্থ দান করুন আর একইসাথে আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। (আমীন) রাব্বানা তাকাব্বাল।

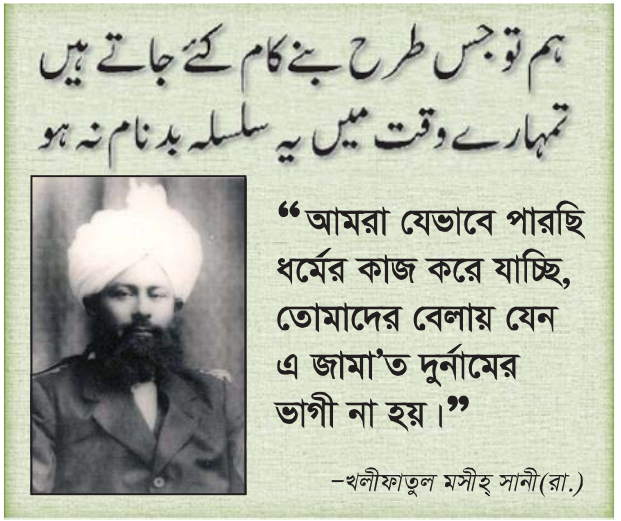

২০১৩ সানের সালানা জলসার লণ্ডনস্থ জলসা গাহে সমবেত প্রবাসী বাঙালিদের একাংশ

আমার পিতার আহমদীয়াত গ্রহণ

বেগম মাক্‌সুদা ফারুক

মহান সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহে সমগ্র সৃষ্টিকুল তাঁর আরাধনায় অবিরতভাবে লিপ্ত। মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা। তাই সৃষ্টির সেরা হিসেবে স্রষ্টার পরম সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি আমাদের তাঁরই ইবাদত করতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ স্রষ্টার ইবাদত করতে গিয়ে নানারূপ বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধা-বিঘ্ন ডিঙ্গিয়ে তাকে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধানে সামনে অগ্রসর হতে হয়। তবে সত্য গ্রহণ ও বর্জন করার স্বাধীনতা সকলের জন্য উন্মুক্ত।

এ যুগে আল্লাহ তা'লার ফযলে সেরূপ নিষ্ঠাবানদের একমাত্র সত্য জামা'ত হল- আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। আর এটিও আল্লাহ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ তিনি বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তের সুপ্রতিষ্ঠিত হবার স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম, বড় মওলানা নামে সর্বাধিক পরিচিত হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)-এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১৯১২ সনের ২৫ নভেম্বর আহমদীয়াতের সূচনা হয়। তাঁর সাথে তাঁর ভক্তকুল সত্যের সন্ধানে আহমদীয়াতের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এসব প্রেমিকদের প্রেমপূর্ণ নিবিড় ভালবাসার স্পর্শে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হিন্দু ব্রাহ্মণ থেকে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম গ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে সর্বপ্রথম আমার পিতাই আহমদী হন। আমার পিতার নোটবুক থেকে এসব বর্ণনা করার চেষ্টা করছি যাতে করে আমাদের নতুন প্রজন্ম ত্যাগ ও কুরবানীর অনুপম আদর্শ শিখতে পারে।

আমার পিতার ডায়েরিতে যেভাবে লিখিত:

'ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমাদের ও আমার পিতামহের আদি বাসস্থান। বৃটিশ আমল থেকে ব্রাহ্মণ বংশের নামেই এই শহরের নাম হয়ে যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

এই শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালীবাড়ি ছিল হিন্দু ঠাকুর বাড়ি হিসেবে সুপরিচিত। বংশ পরম্পরায় তারা সাতপুরুষ ধরে এই বসত-বাড়িতে বাস করে আসছিল। আদি ব্রাহ্মণ বংশই ছিল আমাদের বাপদাদার আচরিত ধর্ম। আমার বড় দাদা হল শ্রী কামিনী মোহন চক্রবর্তী, আমার প্রপিতামহের নাম শ্রী বৃন্দাবন চক্রবর্তী। পিতা: শ্রী কাশীনাথ চক্রবর্তী আর মায়ের নাম শ্রীমতি স্বরস্বতী দেবী চক্রবর্তী। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন ছিলাম । আমার নাম ছিল শ্রী কালীমোহন চক্রবর্তী। ছোট ভাই ছিল শ্রী যামিনী মোহন চক্রবর্তী, বড় দিদির নাম শ্রীমতি সুরবালাদেবী চক্রবর্তী আর ছোট বোন হলো শ্রীমতি নিরবালা দেবী চক্রবর্তী। আমার নানার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ৪ মাইল উত্তরে মজলিশপুর গ্রামে। নানার নাম শ্রী মধুসূদন চক্রবর্তী। নানাও ছিলেন মজলিশপুর এলাকার বিখ্যাত পণ্ডিত মহাশয়। মামারা ছিল তিন ভাই, পাঁচ বোন। আমাদের দুই মামা ছিলেন পণ্ডিত মহাশয় আরেক মামা ছিলেন তখনকার একজন নামকরা ডাক্তার। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। এরপর তিন ভাই ও দুই বোনের সংসারে বাবার সাথে বড় হতে থাকি। বাবা আর আমি ছিলাম নিরামিষভোজী শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। যারা নিরামিষভোজী তাদের শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলে জানত সবাই। আমি শৈশব থেকেই কোন মাছ-মাংস খাই নি। যে চুলায় মাছ-মাংস রান্না হত সেই চুলার খাবার আমি আর বাবা খেতাম না। আমার ও বাবার চুলা, বাসন-কোসন অন্যদের চেয়ে আলাদা। আমি শৈশব থেকেই পূজার নিয়ম কানুনে বেশি অভ্যস্থ ছিলাম, তাই সবাই আমাকে বেশি আদর করত।

আমাদের বাড়ির নিকটেই ছিল মুদির দোকান। যেটি ছিল একজন মুসলমানের দোকান। সেই দোকান থেকে আমি সব সময় চা পাতা, চিনি আনতে যেতাম। পরিচয়ে জানতে পারি দোকানের মালিক আহমদী মুসলমান। আর তিনি হলেন আমাদের বর্তমান কাজীপাড়ার শামসুল ইসলাম সাহেবের পিতা আব্দুল হেকিম সাহেব। আব্দুল হেকিম সাহেব অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি যাকে পেতেন সুযোগ পেলেই ধর্মের প্রচার (তবলীগ) করতেন। আমিও অবসর সময়ে হেকিম সাহেবের দোকানে বসে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা শুনতাম। তিনি আমাকে তবলীগকালে কিছু বই-পুস্তক প্রদান করতেন, আমি তার কাছ থেকে এইগুলি নিয়ে লুকিয়ে রেখে চুপিচুপি পাঠ করতাম। কারণ, কেউ দেখলে রক্ষা নেই। গোপনে পড়ে আবার গোপনেই ফেরত দিতাম। তখন ঐ দোকানে আরও একজন লোক বসতেন, তিনিও তবলীগ করতেন। তিনি হলেন ভাদুঘরের মওলানা আব্দুল আযীয সাহেব যিনি কাদিয়ান থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদর মুরুব্বী ছিলেন। তিনি হিন্দু-শাস্ত্র নিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাপক যুক্তি-তর্কের সাথে আলোচনা করতেন।

আব্দুল হেকিম ও মওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের ধর্ম প্রচারের সময় আমি প্রায়ই দেখতাম, হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যুক্তি-তর্কে হেরে যেতেন এবং পণ্ডিত মহাশয়গণ নীরব হয়ে সভাস্থল থেকে উঠে যেতেন। তখন থেকেই হিন্দুধর্মের প্রতি আমার অনীহা সৃষ্টি হতে থাকে। তখন আমার বয়স ১৩-১৪ বছর। যদিও আমি ধর্মে গোঁড়া ছিলাম কিন্তু আস্তে-আস্তে যখন বুঝতে আরম্ভ করলাম, মাটির দেবতা আমরাই নিজ হাতে তৈরী করি আর আমরাই আবার এই প্রাণহীন দেবতার পূজা করি, তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করতাম, ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছেন। তিনি জন্ম দেন, মৃত্যুও তিনি দেন। তবে কি আমাদের উচিত ভগবানের পূজা করা? প্রাণহীন দেবতার পূজা করে কী লাভ? তখন পণ্ডিত মহাশয়রা আমাকে গোঁজামিল দিয়ে বোঝাতেন, ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়লে দেব-দেবী প্রাণ পায় তা দেখা যায় না; কারণ মন্ত্র চোখ বন্ধ করে পড়তে হয়। চোখ খুললেই মন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমি বললাম, তবে তো ব্রাহ্মণই ভগবান হয়ে যায়? তারা বুঝাতেন– হিন্দু ধর্ম পুরাতন ধর্ম, এই ধর্মের ওপর কোন ধর্ম নাই। আমি বললাম, ইসলামের খোদা সব কিছু দিতে পারেন, তাঁর হাতে জন্ম ও মৃত্যু। আল্লাহ দিতে পারেন সব কিছু, নিতেও পারেন। ভাগ্য-রিযিক তাঁর হাতে, তাঁর উপাসনা করলে আমরা সবকিছু পেতে পারি। দেবতা কথাও বলতে পারে না, কিছু দিতেও পারে না। আমার মুখে এই কথা শুনে পণ্ডিতরা বাবাকে এসে বলত, আপনার ছেলে আমাদের এই সব কথা বলে, এখন থেকে তার প্রতি নজর না দিলে সে মুসলমান হয়ে ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্ক ডেকে আনবে। আমাদের আধিপত্য সে নষ্ট করে দিবে। বাবা জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম যা সত্য আমি তাই বলেছি। আমি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী(আ.)-এর লেখা 'নিশানে আসমানী' বই-এর ৫২ পৃষ্ঠায় সত্যের সন্ধান করার পদ্ধতি পড়লাম। এরপর হতে গীতার কিছু-কিছু মন্ত্র পড়লাম যার অর্থে আত্মার ক্ষুধা নিবারণ হত তবে এগুলো ছাড়াও আমি নিজ ভাষায় দোয়া করতাম। তখন পূজা একদম ছেড়ে দিয়েছি-শুধু ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে খোদার কাছে মনের আকুতি জানাতাম। চিন্তা-ভাবনায় রাতে ঘুম আসত না। আরবী পড়া আমার নিকট খুব কঠিন লাগত। কোন সূরা মুখস্থ করতে পারতাম না, বাংলা উচ্চারণে শিখলেও মনে

রাখতে পারতাম না।

...একদিন রাতে খুব দোয়া করলাম: হে ভগবান! হে আল্লাহ্! ইসলাম ধর্ম সত্য হলে তুমি আমাকে নিদর্শন দেখাও। আর এই মূর্তিপূজার কুসংস্কার থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি মিথ্যা মূর্তির পূজা করতে পারছি না, তোমার কুরআনের বাণীও শিখতে পারছি না। সে রাতেই স্বপ্নে আব্দুল হেকিম সাহেব আমাকে সূরা ফাতেহা মুখস্থ করালেন। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। ভাবলাম এই স্বপ্ন আল্লাহর নিদর্শন। অস্থির হয়ে গেলাম স্বপ্নটি আব্দুল হেকিম সাহেবের নিকট বলার জন্য। এমন সময় আমার বাবা আমার নিকট এসে তার দেখা একটি স্বপ্ন বললেন। বাবার স্বপ্নটি ছিল এমন: বাবা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন আর প্রস্রাবের ফেনার সাথে কুরআনের আয়াত ভেসে উঠছে, সমুদ্রের ঢেউ এসে আবার মিশিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যে রাতে সূরা ফাতেহা মুখস্থ করেছিলাম সেই রাতেই বাবাও এই স্বপ্ন দেখে আমাকে বলেন। আমি এই স্বপ্ন শুনে কতক্ষণ চুপ থেকে বাবাকে বললাম, বাবা তুমি এমন নোংরা স্বপ্ন দেখতে পার না। কারণ কুরআন-এর বাণী আল্লাহর বাণী, এটি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ।

যাহোক, এরপর আমি অনেক কৌশল করে পালিয়ে আব্দুল হেকিম ও মওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের নিকট গিয়ে স্বপ্নটি বললাম। স্বপ্ন দু'টি শুনে বড় মিয়া ভাই সাঈদ আহ্মদ সাহেব ও মৌলানা এজাজ সাহেব বললেন, মারহাবা! তোমার বাবা যে স্বপ্ন দেখেছেন, খুবই ভাল স্বপ্ন দেখেছেন। বাবার স্বপ্ন নিয়ে দ্বন্দ্বে ছিলাম, আমি ভাবছি হয়ত বাবা কোন স্বপ্ন দেখেন নি, আমাকে ফিরানোর জন্য এই কথা বলেছেন। স্বপ্নের তা'বীর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। মওলানা সাহেব তা'বীর (ব্যাখ্যা) করে বললেন, তুমি তোমার বাবার ঔরসজাত সন্তান, আল্লাহ্র সাহায্যে ইসলামের জন্য তুমি বিলীন হয়ে যাবে, তোমার বাবা তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। আর তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন। তুমি আল্লাহর সাহায্য পাবে। স্বপ্নের তা'বীর বুঝতে পেরে আমার মনোবল আরও বাড়ল। তিনি আরও বললেন, তোমার বাবার জীবদ্দশায় তুমি মুসলমান হবে, ইনশা'ল্লাহ।'

আমার আব্বা তার ছোট বোনের বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। বিয়ে হওয়ার পরই কড়া পাহাড়া উপেক্ষা করে তার এক প্রতিবেশী রমণী চক্রবর্তীসহ ১৩৩৮ বাংলা ১৬ অগ্রহায়ণ রোজ সোমবার মৌলভীপাড়া মসজিদে গিয়ে বয়াত নেন। বয়াত নেয়ার আগে তৎকালীন আমীর এডভোকেট গোলাম সামদানী সাহেব আমার আব্বার নাম দেন নুরুল ইসলাম আর রমণী চক্রবর্তীর নাম দেন শামসুল ইসলাম।

তিনি লিখেন, 'বয়াতের পর আসরের নামাযের জামা'তে শামিল হলাম। জীবনের প্রথম জামা'তে নামায আদায় করি। তবে রুকু-সিজদার দোয়া নামায শিক্ষা বই

থেকে শিখেছিলাম আর সূরা ফাতেহা তো অনেক আগেই মুখস্থ করেছিলাম। মাগরিব ও এশার নামায পড়ে আব্দুল হেকিমের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে চলে আসি। দু'দিন পর্যন্ত গোপনে লুকিয়ে ছিলাম। আমার সঙ্গে রমণীও ছিল। দু'দিন পর বাড়িতে খবর পৌঁছল, দু'জন হিন্দু ব্রাহ্মণ মুসলমান হয়ে গেছে। বড় ভাই তিতাস নদীতে মাছ ধরতে এসে এই খবর পায়। ঠাকুর বাড়িতে সংবাদ যাওয়া মাত্রই বুঝতে বাকী থাকল না- এরা কারা। সাথে সাথেই বড় ভাই ও আত্মীয়-স্বজনরা মৌলভীপাড়া মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গনে এসে দেখল আমি ও রমণী তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছি। তাদের সঙ্গে রমণীর মামাও ছিল, এদিকে বাবাও থানার দারোগাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আমার বাবা দারোগা সাহেবকে আব্দুল হেকিম ও আব্দুল আযীয মওলানাকে দেখিয়ে বললেন, এই দুইজন আমার এই নাবালক ছেলেকে ফুঁসলিয়ে মুসলমান বানিয়েছে। আমাকে দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, আমি নিজে বুঝে-শুনে মুসলমান হয়েছি, কারও প্ররোচনায় আমি মুসলমান হই নি।

দারোগা আমার কথা শুনে রাগে কটকট করছিল, কারণ সে-ও বাবার একনিষ্ঠ হিন্দু-ভক্ত ছিল। এদিকে রমণী চক্রবর্তী অবস্থা দেখে ভয়ে তার মামার হাত ধরে চলে গেল। আমাকে দারোগা সাহেব বলল, তুমি তোমার বাবার সঙ্গে যাবে? নাকি থানায় যাবে? আমি বললাম, আমি বাড়িতেও যাব না, থানায়ও যাব না। আমি কোন চুরি-ডাকাতি করি নি, কোন অপরাধ করি নি। ইসলাম ধর্ম সত্যধর্ম। বুঝে-শুনে গ্রহণ করেছি। আমি মুসলমান হয়েছি, মুসলমান বাড়িতে চলে যাব। তখনই দারোগা আব্দুল হেকিম সাহেব ও মওলানা আব্দুল আযীযসহ আমাকে জোরপূর্বক থানায় নিয়ে গেল। থানায় নিয়ে একটি অঙ্গীকারনামা লিখে আমার, আব্দুল হেকিম এবং মওলানা আব্দুল আযীয সাহেব-এর জোরপূর্বক স্বাক্ষর নিল।

এই অঙ্গীকারনামায় লেখা ছিল, তাদের দুই জনের সঙ্গে আমার দেখা হলে বা কথা হলে বা তারা আমার সঙ্গে দেখা করলে পাঁচশ' টাকা জরিমানা ও ছয় মাসের জেল। এরপর তাদের দু'জনকে ছেড়ে দিল, আমাকে আটকে রেখে দু'দিন খুব তর্ক-বিতর্ক করল। আমি কোন অবস্থায় নতি স্বীকার না করাতে এক পর্যায়ে দারোগা সাহেব বেত্রাঘাত করল। দু'দিন পর বাবাকে খবর দিয়ে আমাকে জোরপূর্বক বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। আবার বাড়িতে এনে নজরবন্দি ও ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে। এদিকে সব আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে আসতে লাগল, এবার আমাকে যেভাবেই হোক ফিরাতে হবে।

গুরুমশাইও আসল। আমাকে আবার মন্ত্র নিতে হবে, হিন্দু নিয়মে তওবা বা প্রায়শ্চিত্ত করাবে কিংবা আমাকে মারবে, কাটবে, মাটিতে পুঁতে দিবে এমন ভয় দেখানো হল। আবার লোভও দেখাল, সব সম্পদ আমার নামে দিবে, ব্যবসা-বাণিজ্য দিবে, ইত্যাদি। আমাকে কোন অবস্থায়, কোন কিছুতে রাজী করাতে না পারায় আমার মামা আমাকে ধরে খুব মারধর করল। ঠিক আছে তোকে কিছুই দিব না। কিন্তু গুরুমশাই-এর নিকট মন্ত্র নিতে হবে। এতেও আমি রাজী হলাম না। নানাভাবে প্রশ্ন করল। আমি বললাম, আমি তোমাদের গুরুর মন্ত্র নিব না। কারণ, আমি তোমাদের গুরুর চেয়ে উত্তম। আমি বাবাকে বারবার বলেছি, আমার কোন কিছুর দরকার নেই, আমাকে আপনারা মুক্তি দিন।

যাহোক, পরে বাবা রেগে গিয়ে বললেন, আমি আর তোকে কিছু বলব না। সময় দিলাম, চিন্তা কর। এভাবেই ঘরে বন্দি থাকবি। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোকে ছাড়ব না। বহু কৌশল খাটিয়ে আমি আবার পালিয়ে গেলাম। চারদিকে হৈ-চৈ, ব্রাহ্মণ আবার পালিয়েছে। সেদিন বাবা সাথে সাথেই থানাতে এই বলে মামলা করল, 'আমার ছেলে কালি মোহন চক্রবর্তীর বয়স এগার বছর, সে

নাবালক। তাকে ফুঁসলিয়ে মুসলমান বানানো হয়েছে।' মামলায় আসামী করা হল, (১) আব্দুল হেকিম সাহেব, (২) গনি মিয়া (জাহাঙ্গীরের দাদা), (৩) আহসাব আলী উকিল, (৪) এডভোকেট গোলাম সামদানী, (৫) মওলানা আব্দুল আযীয (ভাদুঘর), (৬) মিয়াচান্দ, (৭) কফিল উদ্দীন মিয়া, (৮) আব্দুল হাই, (৯) আব্দুল আলীম, (১০) মালেক মাস্টার, (১১) মাহবুবুর রহমান উকিল (গয়ের আহমদী) এবং (১২) মধু মিয়া।

এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে চার দিন দৌড়ের উপর থাকতে হয়েছে। কারণ দাদা থানার দারোগাকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে বাড়ি-বাড়ি খুঁজেছে, ভয়ে সব থমথমে অবস্থা। এরপর তাদের ধারণা হল, আমি আব্দুল হেকিমকে সাথে নিয়ে কাদিয়ান চলে যেতে পারি। তখন তারা সব স্টেশনে পাহারার ব্যবস্থা করল। আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী! তার পরদিন রাত বারোটার পর আমি আব্দুল হেকিমকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে তারুয়ায় শহীদ আব্দুর রহীম সাহেবের বাড়ি চলে গেলাম। এটি ছিল আব্দুল হেকিমের শ্বশুর বাড়ি। তখন ডাক্তার আহমদ আলী, মোস্তফা আলী সাহেব সবাই আমাকে পেয়ে খুব খুশি হলেন। তারা আমাকে অনেক আদর-যত্ন করলেন। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম। গরমের তীব্রতা কিছুটা কমলে লালপুর গিয়ে নৌকায় করে আশুগঞ্জ যাবার জন্য মনস্থ করলাম। কিন্তু পথে শুনলাম আশুগঞ্জেও লোক পাহারা দিচ্ছে। যাহোক, কোন রকমে আমি স্টেশনের পিছনে লুকিয়ে থেকে রাত দু'টার ট্রেনে উঠে ঢাকায় চলে এলাম। আমি ঢাকায় এসেছিলাম আমার বয়সের সার্টিফিকেট আনতে। কারণ, তারা আমাকে নাবালক ও বয়স ১১ দেখিয়ে মিথ্যা মামলা করেছিল। প্রথমে আমি মুসলমান বড় ডাক্তার মাইজুদ্দিন খানের নিকট গেলাম। ডাক্তার সাহেব আমার সব কথা শুনে বললেন, আপনারা একজন বড় হিন্দু ডাক্তারের নিকট যান। কারণ আমি সার্টিফিকেট দিলেও তারা গ্রহণ করবে না।

তখন হিন্দু বড় ডাক্তার তিনকড়ি আচার্য্য সাহেবের নিকট গেলাম। আমার পরিচয় শুনে ডাক্তার সাহেব কথা আর না বাড়িয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমার বয়সের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। তিনি আমার ছবিও উঠালেন, ছবিতে সীল, স্বাক্ষর দিয়ে সার্টিফিকেটে লিখলেন, 'এই ছেলের বয়স ১৯ বছরের উর্ধ্বে ২০ বছর থেকে কিছু কম, সে সাবালক।'

সার্টিফিকেট নিয়ে আমি পরদিন আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে আসি। স্টেশন থেকে মৌড়াইলে সাবের আলী চৌধুরীর বাড়িতে (ডা. আনোয়ার হোসেনের দাদা শ্বশুর) চলে গেলাম। আমার খবর পেয়ে মীরবাড়ির মীর সাহেব, খন্দকার ওয়াহেদ দরবেশ সবাই আসলেন। পরে মওলানা আব্দুল আযীয ভাদুঘর থেকে আসলেন। সবাই মিলে পরামর্শ করলাম, কারণ আমার নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়ে গেছে। দারোগা পুলিশ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সবাই দোয়া করে আমাকে বিদায় দিয়ে বলল, যাও! আল্লাহ্ তোমার উত্তম সাহায্যকারী। আমি নিজেই থানায় হাজির হলাম। সাথে-সাথে আমাকে এরেস্ট করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দিল। দুই দিন পরই আমার হাজিরা। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এস.ডি.ও. ছিল হিন্দু। নাম তার বাবু সতীশ চন্দ্র সরকার। দু'দিন পর যখন মামলা উঠল, তখন আমার বয়সের সার্টিফিকেট দাখিল করা হল। আমি বললাম, আমি সাবালক, আমার বয়স প্রায় ২০ বছর। এস.ডি.ও. বিচার করলেন ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকার বিনিময়ে জামিন দেওয়া হল। সেই সাথে আমাকে আদেশ করল বাবার সাথে যাওয়ার জন্য। আমি প্রতিবাদ করলাম, আমি বাবার সঙ্গে যাব না। কারণ, এখন আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। এ কথা বলার পরও এস.ডি.ও. আমার কোন কথায় কর্ণপাত করলেন না। আমাকে ধমক দিয়ে বাবার হাতে দিয়ে বলল, আপনারা জোর করে ধরে নিয়ে যান। আমি বিচারের কাঠগড়ায় শক্ত হাতে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগলাম, আমি মুসলমান! আমি হিন্দু বাড়িতে যাব না। এদিকে মামলায় যাদেরকে আমার বাবা আসামী হিসেবে নাম দিয়েছিলেন তারাও আমার হাত ধরে টানতে শুরু করল আর বলল, এবার দেখব- কে কাকে নিয়ে যেতে পারে। কোর্টের ভিতরে আমাকে নিয়ে দু'দলের মাঝে গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেল। এস.ডি.ও. বিপাকে পড়ে গেল। তখন আমাকে আবার হাজতে রেখে দিয়ে দুই দলকেই বিদায় করে দিল। তখন বড় দিনের ছুটিতে কোর্ট বেশ কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে আমার মামলা হাতে নিতে সব উকিল ভয় পায়। আমি এ অবস্থায় জেলখানাতেই নামায পড়তে আরম্ভ করি। পাহারারত পুলিশ আমাকে মারতে যায়, আমাকে নামায পড়তে দিবে না। আমি পুলিশকে বললাম, কী করবি কর? আমি তোদের সামনেই নামায পড়ব। আমার মুখের কথা শুনে পুলিশরা বলাবলি করছিল, এই ছেলের যে সাহস হাজতেও রাখা যাবে না। এভাবে রোযা এসে গেল, আমি জেলখানাতেই রোযা রাখতে আরম্ভ করলাম। দু'টি রোযা রাখার পর জেলখানাতে আমার খাবার বন্ধ করে দিল।

একদিন আসামীদের দেখার জন্য জেল ভিজিটর (কারা পরিদর্শক) সাহেব আসলেন। ভিজিটর ছিল মুসলমান। জমিদার বংশের লোক। তার নিকট বিচার দিলাম, দুই দিন রোযা রাখার পর আমাকে আর শেষ রাতের ভাত দেয়া হয় না। তিনি আমাকে বুঝালেন, জেলখানায় রোযা ফরয নয়, যে কয়দিন আছে রোযা ভেঙ্গে ফেল। এভাবে বারটি রোযা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। একদিন আমি জেলখানায় সারারাত নামায পড়ে আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগলাম, প্রচুর দোয়া করতে থাকলাম, বলতে লাগলাম, হে খোদা! তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমার সব কাজ তোমার হাতে সম্পাদন কর, এখানে কোন মানুষ আমাকে দেখবে না, হে খোদা! তবে তুমি আমাকে দেখছ।'

পরদিনই শুনলাম হঠাৎ করে একজন মুসলমান পুলিশ সুপার এসেছেন। নাম তার আব্দুল্লাহ্, অত্যন্ত সাহসী ও তেজস্বী। তার সঙ্গে দু'জন বডিগার্ড পুলিশ সবসময় রিভলভারসহ থাকে। জেলখানাতে এসে আমাকে সব কথা জিজ্ঞেস করে, সব জেনে আমার ফাইল দেখে এস.ডি.ও.-কে তার বাংলোয় তার খাস কামড়ায় গিয়ে জিজ্ঞেস করল, যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি মুসলমান হয়েছে, তাকে আপনি কেন হাজতে রেখেছেন? এস.ডি.ও. গোঁজামিল দিয়ে বলল, কেউ ফুঁসলিয়ে করেছে। পুলিশ সুপার বললেন, আমি নিজে জিজ্ঞেস করে এসেছি, সে নিজেই মুসলমান হয়েছে। খবরদার! আগামী তারিখে তাকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়।

আর মাত্র চার দিন পর আমার আবার তারিখ। এই চার দিন আমি খোদার নিকট প্রাণভরে নিজের ভাষায় দোয়া করলাম, হে আল্লাহ্! আমি যেভাবে তোমাকে ডেকেছি, সেভাবে পেয়েছি। তবে আর একটা জিনিস তোমার কাছে চাই।

আরবী ভাষা আমার নিকট অনেক কঠিন মনে হয়! যেন আমি সহজে তোমার বাণী পবিত্র কুরআন পড়তে পারি। সেদিন থেকে জেলখানাতেই প্রতিদিন রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, কোন একজন বুযুর্গ এসে আমাকে সূরা মুখস্থ করাচ্ছেন। এভাবে সূরা নাস, সূরা ইখলাস, সূরা কাউসার, সূরা কাফেরুন জেলখানাতেই আমার মুখস্থ হয়ে যায়। জেলখানাতে যখন আব্দুল হেকিম যেতেন, তখন আমি তাকে সূরাগুলি মুখস্থ বলতাম।

এ সবকিছু ছিল খোদা তা'লার অনুগ্রহ যা আমি সব কিছুতেই দেখতে পেয়েছি। পরদিন আমার মামলার তারিখ, আমার প্রাণের প্রিয় মানুষ সবাই সেদিন কোর্টে হাজির। আমার মামলা উঠার আধঘণ্টা আগে আব্দুল হেকিম সাহেব

আমার কানে-কানে বললেন, 'কালু! আজ আমি স্বপ্নে দেখেছি, কে যেন আমাকে ডেকে বলছে, আব্দুল হেকিম সাহেব! আপনি আপনার কবুতর লোহার পিঞ্জর থেকে নিয়ে আসেন।' একটু পরেই আমার ডাক আসল, 'কাশিনাথ চক্রবর্তীর ছেলে কালি মোহন চক্রবর্তী বেকসুর খালাস!'

আমার পিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন–

'...যে দিন আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আব্দুল হেকিম সাহেবের বাড়িতে আসি, সেদিন যোহরের নামায পড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে দেখি, আসরের নামাযের আযান পড়ছে, আমি নামাযের জন্য তিতাস নদীতে ওজু করছি। ওজুর সময় দেখি, আমার হাত ও পায়ের নখগুলি উঠে যাচ্ছে, নদীর পানিতে ভেসে যাচ্ছে। হাত ও পায়ের দিকে চেয়ে দেখি, নতুন নখ উঠেছে, চকচক করছে! স্বপ্নে মসজিদটি দেখি তিতাস নদীর তীরের নিকট। আবার যিনি আযান দিয়েছেন, তিনি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে কবর জিয়ারত করছেন।' আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। তখন আসর নামাযের আযান পড়ছে। আমি সেই তিতাস নদীতেই ওজু করে আব্দুল হেকিমের সাথে মৌলভীপাড়ায় নামায পড়তে গেলাম। নামাযের পর স্বপ্নটি মওলানা আব্দুল আযীয সাহেবের কাছে বললাম। মওলানা সাহেব তা'বীর করে বললেন, 'ঠাকুর! তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, পুরাতন নখ পড়ে নতুন নখ উঠেছে, তার অর্থ হল, তোমার আগের মূর্তিপূজার গুনাহ্ ধুয়ে-মুছে নতুন জীবন পেয়ে গেছ।' তিনি কেবল এতটুকুই বলেছিলেন। কালের ব্যবধানে স্বপ্নের বাকী অংশটুকুও বুঝতে পারলাম। তিতাস নদীর তীরে এখন আমাদের আহমদীদের কবরস্থান। তারপরেই আমাদের মসজিদ হয়েছে' (যে মসজিদটি অ-আহমদীদের দখলে আছে, সেটির বাইরের সিঁড়িতে উঠে মাইকে আযান দেয়া হত)।

আমার বাবা তার ডায়েরির আরেক অংশে লিখেন–

প্রায় ১৫ বছর যাবৎ আমার ও আমার স্ত্রীর একটা ব্যথা ছিল, ডাক্তারী ভাষায় একে শূল ব্যথা বলা হয়। ব্যথাটা কলিজার ভিতর করত। ব্যথাটা যখন উঠত, এক সপ্তাহ, ১০ দিন এমনকি ১৫ দিন পর্যন্ত থাকত। কোন ঔষধেও এ ব্যথা সারতো না। খাবার সোডা খেতাম। এভাবে এতদিন ব্যথায় পড়ে থাকার দরুন কোন কাজ করতে পারতাম না। সংসার চালাতে খুব কষ্ট হত। ১৯৬৩ সালের কোন এক রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে খোদা তা'লার নিকট অনেক কান্নাকাটি করে নিজের জন্য ও স্ত্রীর জন্য দোয়া করলাম। সেই রাতে স্বপ্নে দেখি, ঘুমের মাঝে আমার পেটের ভিতর থেকে একটি বিড়ালের বাচ্চা বের হয়ে দৌড়ে চলে গেল। তাকিয়ে দেখি, দূরে দু'টি বিড়ালের বাচ্চা দৌড়ে চলে যাচ্ছে। আমি স্বপ্নেই ভাবছি, দেখলাম একটি বাচ্চা বের হল, এখন দেখি দু'টি বাচ্চা। ঘুম থেকে জেগে, মওলানা ফারুক সাহেবের নিকট স্বপ্নটি বললাম। তা'বীর করে মওলানা ফারুক সাহেব বললেন, আপনার ও আপনার স্ত্রীর যে কলিজার ব্যথা রয়েছে–সেটা সেরে যাবে। সত্যি! সে দিনের পর থেকে আর কোনদিন আমাদের দু'জনের শূল ব্যথাও উঠেনি আর কোন ডাক্তারের ঔষধও খেতে হয় নি।'

১৩৩৯ বাংলা সনে জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর প্রথিতযশা সাহাবী হযরত আব্দুর রহিম নাইয়্যার(রা.) বাংলাদেশে আসেন। তিনি আমার পিতার নামের সাথে 'চক্রবর্তী' শব্দটি ব্যবহার করতে বলেন। এরপর তিনি নিজে আব্বার নামটি একটি কাগজে ইংরেজিতে 'নুরুল ইসলাম চক্রবর্তী' লিখে দেন।

পরিশেষে শুধু এতটুকু বলছি, আমার পিতা তাঁর অসীম মনোবল, দৃঢ়তা এবং প্রচণ্ড সাহসিকতায় সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ওপর অটল, অবিচল থেকেছেন তা একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তার আশিস ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ করুন আমরাও যেন আমাদের পিতার পদাঙ্ক যথাযথভাবে অনুসরণ করে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সারা জীবন থাকতে পারি। হে কৃপা ও দয়ার অধিকারী খোদা! আমাদের এই সকাতর মিনতি কবুল কর। আমীন।

আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) বলেন,

"আমরা ঈমান রাখি, খোদা তা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং সৈয়্যদেনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওযা সালাম আল্লাহর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী(সা.)-এর পক্ষ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'**-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী(আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল(সা.) কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদী-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এসবের বিরোধী ছিলাম"?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা" অর্থাৎ সাবধান! নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।

(আইয়ামুস্ সুলেহ্ পুস্তক, পৃষ্ঠা: ৮৬-৮৭)

চট্টগ্রামে

আহমদীয়াত প্রচারে বরণীয় ব্যক্তিত্বের স্বরণীয় অবদান

খালিদ আহমেদ সিরাজী

জন্ম-মৃত্যু মানব জীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তারপরও আমরা সকলেই জানি এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে দু'টো পথ; একটি আসা, অন্যটি যাওয়া। এ পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার পথে কিছু নিরহঙ্কার ব্যক্তির বিভিন্ন নীরব কর্মকাণ্ড মানুষকে যুগ-যুগ ধরে উৎসাহ দিয়ে থাকে। চট্টগ্রাম জামা'তের এমনি কয়েকজন বিরল ব্যক্তিত্ব এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এই অসাধারণ গুণাবলিসম্পন্ন কিছু মানুষের বহুল কর্মময় জীবন-বৃত্তান্তের এক ঝলক নিম্নে উপস্থাপন করা হল, যারা তাদের অগাধ মনোবল, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, নিজ দায়িত্বের প্রতি অগাধ সচেতনতার অনুপম আদর্শ স্থাপন করে চট্টগ্রামের মাটিতে আহমদীয়াত প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান:

প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেব ময়মনসিংহের কুলিয়ারচরের আব্দুল মজিদ খান সাহেবের পুত্র। তিনি ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে বয়াত করে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করেন এবং ১৯২০ হতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি বিশেষভাবে কুরআনের দরসের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীরের গুরু দায়িত্বও পালন করেছেন। প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের আরবী ও ফার্সি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ওলি খাঁ মসজিদের খতীবের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৩১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সদালাপী, বিনয়ী, মৃদুভাষী, অমায়িক ও রূহানী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি সবার কাছে সুপরিচিত ছিলেন। এজন্য আহমদী হওয়া সত্ত্বেও কেউ তার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার সাহস পায় নি।

সৈয়দ খাজা আহমদ:

সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেব ১৯০৩ সালে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানাস্থ মুহুরীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সৈয়দ সমির উদ্দিন। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তিনি ২৯শে অক্টোবর ১৯২৯ সালে

সৈয়দ খাজা আহমদ

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৪৪ সালে আহমদীয়াতেরযুক্তি এবং প্রামাণ্য দলিলের কাছে নতি স্বীকার করে ১লা এপ্রিল পোস্টকার্ডের মাধ্যমে বয়াত গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে সরাসরি হিমাচলের ডালহৌজিতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ছয় পুত্র এবং ছয় কন্যা সন্তানের জনক। চট্টগ্রামের মুরাদপুরে ও ফেনীর মুহুরীগঞ্জে কবরস্থানের জন্য এবং তার নিজ গ্রামের বাড়িতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেছিলেন। তিনি ১৯৪৪ হতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৫৫ হতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

গোলাম মওলা খাদেম:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত আখাউড়া উপজেলায় খড়মপুর গ্রামের বিশিষ্ট খাদেম পরিবারে ১৮৯২ সালে গোলাম মওলা খাদেমের জন্ম হয়। ১৯১৩ সালে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি ইমাম মাহদী(আ.)-এর সাহাবীদের মাধ্যমে ট্রেনে ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের সফরসঙ্গী হয়ে কোলকাতা গমন করেন। সেখান থেকে কাদিয়ান গিয়ে ১৯১৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল(রা.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করে সিলসিলা আলিয়া আহমদীয়ায় দাখিল হন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর হতে দরগাহর প্রধান খাদেম হিসেবে তিনি কোন দিন কারও কাছ থেকে কোন নজরানা (দরগার হতে অর্জিত আয়) গ্রহণ করেন নি। তাঁর নিজের জমির ওপর খড়মপুরে মসজিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তাঁরই তবলীগে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। দৌলত খাঁ খাদেম উকিল প্রমুখ তাঁর তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.)-এর নির্দেশে তাঁর পুত্র জনাব মুসলেহ উদ্দিন খাদেমকে কাদিয়ানে শিক্ষা লাভ করার জন্য প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব জীবনের এক পর্যায়ে তিন বছর ঘানাতে নুসরত জাহান স্কীমের অধীনে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। গোলাম মওলা সাহেব রেলওয়েতে চাকুরির সুবাদে ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম বদলি হয়ে আসেন এবং স্থানীয় জামা'তের সদস্য হন। চট্টগ্রাম জামা'তের ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা তাকে ১৯৫১ হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য দান করেন। এছাড়া তিনি আজীবন খড়মপুর জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে পরলোক গমন করেন। তাকে চট্টগ্রামস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে।

গোলাম আহমদ খান (ফালু মিঞা):

১৯২০ সালে গোলাম আহমদ খান (ফালু মিঞা) চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ফালু মিঞার পিতা আব্দুল লতিফ খান সাহেব স্বপ্নে তাঁর পুত্রের নাম গোলাম আহমদ পেয়েছিলেন বিধায় এই নাম রেখেছিলেন। তিনি ১৯৬৩ হতে ১৯৬৫ এবং ১৯৬৮ হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮৫ হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামে আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৫০ হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের কায়েদ ছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মাসুদুল হক:

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার ছাতিনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের সময় তারই মেজ ভাই মরহুম

লুৎফুল হক সাহেবের সহযোগিতায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে আগমন করেন।

অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভূঞা

ছাত্র অবস্থায় চট্টগ্রামের হালিশহর নিবাসী আবদুল গফুর সিরাজীর তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল, অতি বিনয়ী, ধৈর্যশীল ও নিরহঙ্কার এই ব্যক্তি শুধু জাগতিক দিক দিয়ে সৎ উপার্জনশীল ছিলেন তাই নয়, দীন ইসলামের সেবায়ও জীবনকে বিভিন্নভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। অতি অল্প বয়সে যথাক্রমে- যৌবনের প্রারম্ভে যুব সংগঠন চট্টগ্রাম খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, বিভাগীয় কায়েদ, আনসারুল্লাহর যয়ীম, ওয়াকফে নও বিভাগীয় সুপারভাইজার, তাহরীকে জাদীদ সেক্রেটারি, শতবার্ষিকী জলসা উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি ইসলাহ ও ইরশাদ এবং তালীম-তরবিয়ত সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। তিনি পাকিস্তানের রাবওয়া এবং ভারতের কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জলসায় একাধিকবার যোগদান করেন। তিনি একজন ওসিয়তকারী ছিলেন। ৬৩ বছর বয়সে তিনি আপন প্রভুর সান্নিধ্যে মিলিত হন।

অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভূঞা:

অধ্যাপক বদিউজ জামান ভূঞা বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত (পো. উলানিয়া) বালিয়া গ্রামের প্রখ্যাত ভূঞা পরিবারে ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি কালু ভূঞা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করার পর মুসলিম ছাত্র হিসেবে তৎকালীন সময়ে অত্র অঞ্চলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর কোলকাতা ভেটেরিনারি কলেজে অধ্যয়ন করেন।

সরকারী ভেটেরেনারি সার্জন হিসেবে চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসেন। সরকারী একটি ফ্রিজ মেরামতের মাধ্যমে পরিচয় হয় চট্টগ্রামের প্রবীণ আহমদী সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের সাথে। শুরু হয় তবলীগি আলোচনা দিনের পর দিন। ১৯৪৯ সালে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের সদস্য হন। একজন সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে ধীরে-ধীরে জামা'তের নিষ্ঠাবান কর্মী হয়ে উঠেন। ১৯৫৩ সালে জামা'তের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৫ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্বাবলি পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। চাকুরিরত অবস্থায় তিনি ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত আকুয়া নামক স্থানে নিজ তত্ত্বাবধানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যেখানে বর্তমানে ময়মনসিংহ জামা'তের কেন্দ্র অবস্থিত। তিনি ১৯৮৫ সালে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহ তা'লা এ সমস্ত স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের বরণীয় অবদানকে মনে রেখে আমাদের সকলকে বাংলার মাটিতে বরং সারা বিশ্বে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

নীরব এক ত্যাগী আহমদী

জনাব এস.এম. সিরাজুল হক। নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার দৌলতপুর ইউনিয়নের কীর্তিবাসদী গ্রামের এক ধার্মিক ও শিক্ষিত পরিবারে আনুমানিক ১৯৩০ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন পেশায় শিক্ষক। গ্রামের মসজিদে ইমামতি করতেন তিনি। সাত সন্তানদের (চার ছেলে ও তিন মেয়ে) মধ্যে সিরাজ সাহেব ছিলেন সবার ছোট এবং সবার আদরের।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁর বড় ভাই দেওবন্দ পাশ প্রখ্যাত আলেম পরিবারের অভিভাবক হন। যিনি তার ইউনিয়ন অর্থাৎ দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে চব্বিশ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন এস.এম. সিরাজুল হক সাহেব।

১৮ বছর বয়সে আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়ে সত্যান্বেষী হয়ে বিষয়টি যাচাই করতে পাশের গ্রামের এক আহমদী পরিবারে কুরআনের দরস শুনেন। তাতে তিনি তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান। সেখানেই তিনি বয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর বড় ভাইয়ের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা সত্যেও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আহমদীয়াতকে আঁকড়ে ধরে রাখেন। অবশেষে মাত্র আট আনা সম্বল নিয়ে সমাজের অগোচরে নিজ গ্রাম থেকে হিজরত করে ঢাকায় চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

১৯৭০ সালে তিনি একটি সিমেন্টের এজেন্সি নেন। তিনি অত্যন্ত ত্যাগী একজন আহমদী ছিলেন। বর্তমান দারুত তবলীগে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মসজিদের ১ম তলার পুরো সিমেন্ট তিনি অনুদান হিসাবে সরবরাহ করেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর কুরবানী কবুল করুন, তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন এবং তাঁর সন্তানদের মাঝেও কুরবানীর এই প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন, আমীন।

Love for All Hatred for None

সৎ মানুষের কথা

প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

[ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুইঁ ইয়াদঊনা ইলাল খায়রি ওয়া ইয়া'মুরূনা বিল মা'রূফি ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার। ওয়া উলায়িকা হুমুল মুফলিহূন। *(সূরা আলে ইমরান : ১০৫)*] অর্থাৎ আর তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করবে। আর এরাই সফলকাম।

পাঠক, সেই দল হিসেবে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা ও সৎকাজের নির্দেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলাটা সমাজের প্রতি, জনসাধারণের প্রতি মুসলমানদের সবচাইতে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইতিহাসও এ বিষয়ে মুসলমানদের অবদান স্বীকার করে। আর এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন প্রকৃত মু'মিন বান্দারা। এদিক থেকে সমাজকে ভাল করাতে ও ভাল লোক তৈরী করাই আমাদের– অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান সাফল্য ও প্রাপ্তি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাফল্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে সত্যিকারের ন্যায়নিষ্ঠ মু'মিন হওয়াটাই হচ্ছে এদের সাফল্য ও প্রাপ্তি। এজন্য উদাহরণস্বরূপ আমি বাংলাদেশের প্রথমদিকের চারজন আমীর সম্বন্ধে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.) ১৮ই মার্চ ১৯২৬ সালে পরলোক গমন করেন। ১৯১২ সালে তাঁর কতিপয় প্রখ্যাত মুরিদ ও ভক্ত কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তিনজন অনুচরসহ আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্র কাদিয়ান যাত্রা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোলকাতা থেকে প্রকাশিত তৎকালীন 'আহমদী' পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যও প্রকাশিত হয়। নিম্নে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হল–

> "বাংলাদেশের এক প্রান্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশন থেকে বাটালা পর্যন্ত এই ১৪/১৫ শ' মাইলব্যাপী রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে বঙ্গ, বিহার, ইউ.পি ও পাঞ্জাবের বহু প্রখ্যাত আলেমের সঙ্গে সাক্ষাত করে হযরত মির্যা সাহেবের দাবি এবং সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করার পর অবশেষে তিনি কাদিয়ান উপস্থিত হন। তিনি বাটালা স্টেশনে অবতরণ করে 'আহলে হাদীস' সম্প্রদায়ের নেতা, প্রখ্যাত আলেম মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন, তখন বাটালভী সাহেব হযরত মওলানা সাহেবকে কাদিয়ান না গিয়ে দেশে ফিরে যেতে অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। যাহোক, কাদিয়ানে উপস্থিত হয়ে হযরত মির্যা সাহেবের প্রথম খলীফা হযরত মওলানা আলহাজ্জ হাফেজ নূরুদ্দীন(রা.) সাহেবের হাতে বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণ করেন। কাদিয়ানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাব-ডিভিশনে হৈ-চৈ পড়ে যায়। যে শিষ্যরা একদিন তাঁকে কাদিয়ানে পাঠিয়েছিলেন তারাই তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে উঠে।"
>
> *(মূল সূত্র: মাসিক আহমদী, চৈত্র, ১৩৩২ বাংলা, ১৯২৬ খ্রি.)*

গত ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসার সমাপনী অধিবেশনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা বাংলাদেশের আহমদীদের উদ্দেশ্যে এমটিএ-এর মাধ্যমে এক ঈমান উদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.) বলেন–

> "মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব 'খলীফাতুল মসীহ আউয়াল(রা.)-এর যুগে কাদিয়ানে গিয়ে বয়াত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অগণিত মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়েছেন। তিনি উত্তম স্বভাব ও সাধু প্রকৃতির মৌলভী ছিলেন, তিনি কখনও বিরোধিতা করতেন না যেভাবে আজকালকার মৌলভীরা করে থাকে। তিনি যখন বয়াত করেন তাঁরও চরম বিরোধিতা হয়। কিন্তু তিনি তাদের সামনে কখনও মাথা নত করেন নি। তিনি সর্বদা সত্যের তবলীগ করেছেন।"
>
> *(আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল, পৃ. ৯৪-৯৫)*

তাঁর মৃত্যুর সময়কালে পূর্ববঙ্গে সহস্রাধিক আহমদী নিয়ে ২৬টি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স্কুলে হেড মওলানা ছিলেন এবং তাঁর তাকওয়া ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কিশোর ছাত্রদের অনেকে বয়াত গ্রহণ করেন ও তারা পরবর্তী জীবনে জামা'তের কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জনাব আব্দুর রহমান খান, মোজাফ্ফর উদ্দীন চৌধুরী প্রমুখের নাম স্মরণ করা যায়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের দ্বিতীয় আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে পরলোক গমনের পর বিখ্যাত ইংরেজী সাময়িকী রিভিউ অফ রিলিজিয়নসে একটি মনোজ্ঞ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর হুবহু অনুবাদ উদ্ধৃত করা হল–

> "প্রয়াত প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব সম্ভবত ১৮৮০ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বড় হওয়ার আগেই কম বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগের ফলে তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। তাঁর দরিদ্র মামা তার লালন-পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব নেন ও তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। তিনি তাঁর চেষ্টা ও পরিশ্রমী স্বভাবের ফলে শিক্ষকদের স্নেহের পাত্র হন ও ঢাকা থেকে মাদ্রাসার ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কোলকাতায় আসেন। তিনি চার বছরের শিক্ষাক্রম শেষ করে টাইটেল পরীক্ষা দেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের মাঝে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এখানে তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত হন ও ইসলামিক দর্শনের উপর ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন– সঙ্গে-সঙ্গে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে ইংরেজী শিক্ষায়ও শিক্ষিত হয়ে উঠেন।
>
> ১৯০৮ সালের দিকে তিনি চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজে আরবী ও ফার্সি ভাষার প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তার জ্ঞানের গভীরতা, বিনয়ী স্বভাবের জন্য তিনি ছাত্র-শিক্ষক সবার মন জয় করেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ চরিত্রের গুণে তিনি সবাইকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতে পারতেন। তিনি কলেজ ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক ছিলেন ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজিত সভায় তিনি আজীবন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে হৃদয়স্পর্শী

বক্তব্য রাখতেন। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে ১৯৩১ সালে তিনি স্বর্গবাসী হন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলাদেশের স্কুলে আরবী পড়ানোর জন্য এ্যাংলো-এরাবিক পাঠ্য পুস্তকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর লেখা দু'টি বই 'এ্যাংলো-এরাবিক প্রাইমারী' ও 'এলিমেন্টারী এ্যাংলো-এরাবিক গ্রামার' দ্বারা বহুদিনের এই অভাব মোচন হয়। এ দু'টি বই বাংলাদেশের হাই স্কুলে আরবী শিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করে।

তিনি যখন মুসলিম বাংলার অঙ্গনে আরবী ভাষা শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করার বিষয়ে চিন্তামগ্ন ছিলেন তখন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ কাদিয়ানের গোলাম আহমদ(আ.)-এর বাণীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তাঁর দার্শনিক মন আল্লাহর প্রতিশ্রুত যুগ-ইমাম প্রচারিত পবিত্র কুরআনের উপদেশাবলি ও ব্যাখ্যার প্রাণবন্ত ধারা উপলব্ধি করে। অবশেষে তিনি ১৯১৬ সালে এই জামা'তে যোগ দেন। পরবর্তীতে এ সংবাদ বহুল প্রচার লাভ করে। তাঁর গুণগ্রাহী ও বন্ধুরা তাঁর এই কাজকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখেন এবং ধর্মান্ধ আলেমরা তাঁর চরম বিরোধিতা শুরু করে। তাঁর সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে। ঐশী প্রেরিত মহামানবদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে সবসময় এরকমটাই হয়ে থাকে। তবে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সকল অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে কাদিয়ান থেকে প্রাপ্ত আলোর প্রচারেই নিজেকে সঁপে দেন। ১৯১৯ সালে তিনি তৎকালীন বাংলার প্রাদেশিক আহমদী সমাজের প্রধান সচিব নিযুক্ত হন এবং ১৯২৬ সালে প্রথম আমীরের মৃত্যুর পর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা কর্তৃক আমীর নিযুক্ত হন।"

(The Review of Religions, April 1932)

বাংলার তৃতীয় আমীর ছিলেন কোলকাতা নিবাসী হেকিম আবু তাহের সাহেব। প্রচণ্ড পারিবারিক বিরোধিতার মাঝেও তিনি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সেবা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার ৪র্থ আমীর হলেন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী। তিনি শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। খান সাহেব যখন এ অঞ্চলের ইনস্পেক্টর অব স্কুলস ছিলেন তখন প্রখ্যাত প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খান করটিয়া স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বিস্তারিত জীবনালেখ্য মোহাম্মদ আব্দুল মজীদের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ের ২১৭ পৃষ্ঠায় আবুল হাশেম খান চৌধুরীর সাথে তাঁর সাক্ষাতের এক মনোজ্ঞ স্মৃতিচারণ করেন। এখানে তা হুবহু তুলে ধরছি:

"নাটোরের আবুল হাশেম খান চৌধুরী ঢাকায় স্কুল ইন্সপেক্টর। তাঁকে আমার এক খণ্ড 'কামাল পাশা' পাঠিয়ে দিলাম। লিখে পাঠালেন– ঢাকায় এলে আমার

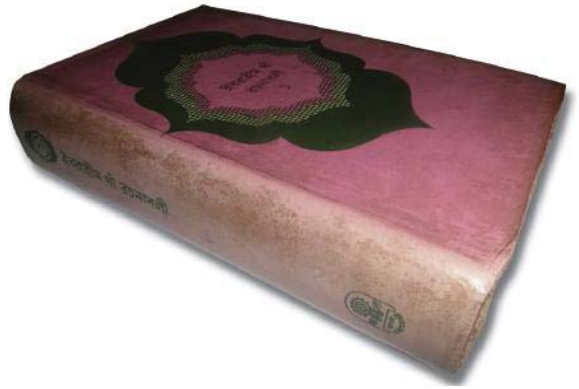

সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবেন, জরুরী আলাপ আছে। ভাবলাম, হয়তো করটিয়ার স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার কোনটি সম্বন্ধে আলাপ করবেন। দেখা করলাম। বললেন, 'কামাল পাশা পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলামের জন্য আপনার আগ্রহ কত তীব্র।'

-'সামান্য খাদেমের মত আমি কিছু করতে চাই, এই মাত্র।'

-'এ আপনার বিনয়। আর আসলেও তো আমরা সামান্যই করতে পারি খাঁ সাহেব। তবে সেই খেদমতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা চাই।'

-'বলুন'

-'এই জামানায় সেই রাস্তা বাতলিয়েছেন কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব।'

-'তাঁর নাম শুনেছি।'

-'তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন। তাঁর প্রভাবে যাঁরা ইসলামের সেবাব্রতে নেমেছিলেন, আজ তাঁরাই দুনিয়ার দিকে-দিকে তবলীগ করে বেড়াচ্ছেন। মালয়ে তাঁরা, মাদাগাস্কারে তাঁরা, আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁরা, আবার ইউরোপ আমেরিকার মত সুসভ্য দেশেও তাঁরাই ইসলামের পতাকা তুলে ধরেছেন।'

-'হ্যাঁ, তাঁরা যে নিতান্ত মূল্যবান কাজ করছেন তা শুনেছি।'

-'তবে আপনিও এই পথে আসুন। পুঁথি-পত্রে ইসলামের কথা বলার মূল্য আছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ফায়দা ইসলামকে জীবনে রূপায়িত করে তাই নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া।'

-'জীবনে ইসলামকে রূপায়িত করার মহিমাকে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।'

-'তবে আসুন আমাদের পথে'।

নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন এই চৌধুরী সাহেব; ধর্মোৎসাহ ছিল তাঁর অফুরন্ত, অন্তরের নির্মলতা দীপ্তি লাভ করেছিল তাঁর সুন্দর চেহারায়; পরম আদরে, পরম আগ্রহে, তিনি আমায় ডেকেছিলেন। যেতে পারি নাই। কিন্তু তাঁর সে আহ্বানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।"

(বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত, ইবরাহীম খাঁ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮)

এ পর্যায়ে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের পঞ্চম আমীর খান সাহেব মোবারক আলী সম্বন্ধে তাঁরই ছাত্র তাজমিলুর রহমান রচিত প্রবন্ধ থেকে তুলে ধরছি। যিনি পরবর্তীতে বগুড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। মোবারক আলী খান সাহেব ছিলেন বগুড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেই স্কুল প্রতিষ্ঠার একশ' পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। সেই প্রকাশনায় তাঁরই গুণধর ছাত্র ১৯৪০ দশকের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই মূল্যবান লেখাটি লিখেন। তিনি লিখেছেন–

"বলছিলাম বগুড়া জেলা স্কুলের তৎকালীন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং দক্ষ প্রধান শিক্ষক খান সাহেব

মোবারক আলীর কথা। উল্লেখ্য যে, তিনি ছিলেন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক এবং তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার আঞ্জুমান-ই-আহম্মেদীয়ার আমীর। শিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণের আগে তিনি কাদিয়ানী মিশনারী হিসেবে দীর্ঘ দিন জার্মানিতে ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মভীরু এবং উদার ও বিশ্বস্ত মানবপ্রেমিক।

একদিন স্কুলের নবম শ্রেণির এক ছাত্র তার হাতের সোনার আংটি হারিয়ে ফেলল। ক্লাসের ডেস্কের উপরে যে কালির দোয়াত বসানো থাকে তার মধ্যে সে

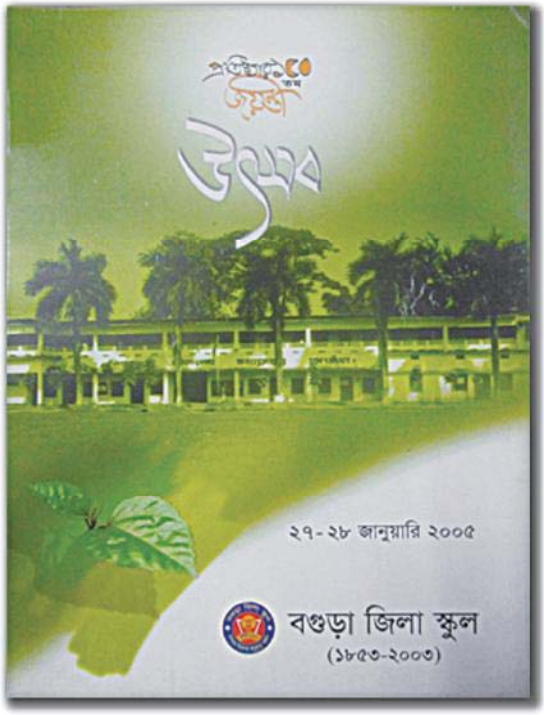

হাতের আংটি খুলে রেখে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে কে বা কারা ঐ আংটি চুরি করে নেয়। তখন এক ভরি সোনার দাম ছিল মাত্র ২৫ টাকা। আংটি হারানোর খবর হেড মাস্টারের কাছে পৌঁছা মাত্র তিনি ছাত্রদের এ্যাসেম্বলী কল করলেন। ছাত্ররা মাঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো এবং শিক্ষকরাও দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেডমাস্টার খান সাহেব মোবারক আলী বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মাথা উঁচু করে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, নবম শ্রেণি থেকে একটি ছাত্রের আংটি চুরি গেছে, আমার ধারণা, এই আংটিটি বাইরের কেউ চুরি করে নি। ছাত্রদের মধ্যে থেকে কেউ চুরি করেছে। আমি হেডমাস্টার তোমাদের বলছি, আজ স্কুল ছুটি হবার আগেই এই আংটিটি সহকারী প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে। যদি চোর এই আংটি ফেরত না দেয় তাহলে কাল থেকে আমি স্কুলে আসব না। কারণ, যে স্কুলে চোর ছাত্র আছে সে স্কুলে খান সাহেব মোবারক আলী হেডমাস্টারী করে না। এই কথা এমনভাবে উপস্থিত ছাত্রদের প্রভাবিত করল যে সেই স্কুল ছুটি হবার আগে চুরি যাওয়া আংটি সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা হল। ছাত্ররা মনে করেছিল, যদি আংটি ফেরত না হয় এবং কাল থেকে যদি হেডমাস্টার স্কুলে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হবে। তাই স্কুলের ক্ষতি রোধ করতে যে ছেলেটি আংটি নিয়েছিল সে সেটা ফেরত দিল। পরের দিন স্কুল বসার আগে হেডমাস্টার এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের সততা এবং তাঁর কথা শোনার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে ছেলেটি আংটিটি সরিয়েছিল তাকে কাছে ডেকে তার নৈতিক সাহস ও সত্যবাদিতার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তাকে আর্শীবাদ করলেন এবং সবার সামনে তার হাতে একটি ১০ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে পুরস্কৃত করেন। আজকের দিনে এ জাতীয় ঘটনা কল্পনা করা যায় কি? যায় না। কারণ সমাজ বদলে গেছে এবং চোরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।"

(*প্রতিষ্ঠার ১৫০তম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বগুড়া জিলা স্কুলের স্মরণিকা, পৃষ্ঠা ১৭-১৮*)

আমরা প্রথম পাঁচজন আমীরের মধ্যে চারজনের বিষয়ে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করলাম। অনেকক্ষেত্রে অ-আহমদীদের অভিযোগ, কেবলমাত্র সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত লোকেরাই এই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগ দেয়। এটা মিথ্যা, চরম মিথ্যা প্রমাণিত হয় এঁদের জীবনালেখ্য দ্বারা। এঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষা বিভাগে কর্মরত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বরং বাংলার মাটিতে গণশিক্ষা ও সাধারণ জনগণের মাঝে শিক্ষা প্রসারে এঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। একাধারে এঁরা জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত, অপরদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় আলোকিত ছিলেন। এঁরা সত্যিকার অর্থে মু'মিন বা আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

উপরোক্ত ক'জনের ব্যক্তিত্ব ছিল অনেক বিশাল ও বিস্তৃত। আমি এঁদের খুব সামান্যই উপস্থাপন করতে পেরেছি। যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ে যে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন এঁরা ছিলেন এদেশের মাটিতে তারই অগ্রদূত। মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়ের যুগে ইসলামের দ্রুত উন্নতি ও জয়জয়কার দেখে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টানরা যেভাবে ভড়কে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, ঠিক তেমনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রযাত্রা দেখে বিরুদ্ধবাদীরা একইভাবে ভড়কে গেছে এবং বিরোধিতার আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু এতে বিচলিত হবার কিছু নাই। সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

তাঁরা আহমদীয়াত গ্রহণ করে পরম প্রশান্তি, সন্তুষ্টি ও আনন্দ লাভ করেছিলেন এবং এর অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা তাঁদের উত্তরসূরিরা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। আমরাও আহমদীয়াতের স্বাদে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত। এটা আমাদের জন্য অতি বড় এক নেয়ামত। আমরা এই নেয়ামত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। আর এই পৃথিবী নামক আল্লাহ্‌র রাজত্বকে শান্তি ও স্বস্তির রাজত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন (আমীন)।

মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সাহেব

শিয়া সম্প্রদায় থেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আহমদী হয়েছেন। তিনি সততা ও নিষ্ঠার সাথে আহমদীয়াত লালন ও পালন করেছেন। চট্টগ্রামে রেলওয়েতে সততা, নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে চাকরি করেছেন। তিনি নিষ্ঠাবান পরিবার রেখে গেছেন যারা দেশে-বিদেশে আহমদীয়াতের সেবায় রত। তাঁর এক মেয়ে মরহুমা সৈয়দা ইশরাত জাহান, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশের সদর ছিলেন। এক ছেলে সৌদি আরবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অন্য দু'জন নিজ নিজ গণ্ডিতে জামা'তের সেবায় রত।

একজন মহীয়সী আহমদী মায়ের কথা

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

হায়াতুন নেছা একজন আহমদী মা। তার নীরব কুরবানী, খোদার পথে দৃঢ় পদচারণা এবং দোয়া কবুলিয়তের অনন্য ঘটনা আহমদীয়াতের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং এ যুগের আহমদী মা-বোনদের খোদার পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

হায়াতুন নেছা ছিলেন তারুয়ার প্রবীণ আহমদী ডা. আহমদ আলী এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলীর বড় বোনের মেয়ে। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মামারা ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ। তাঁদের আদর্শের অনুসারী হিসেবে তিনি খুব ছোট বয়সে হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং সমাজ সংসারের বিপদাবলীর কোন তোয়াক্কা না করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এরপর সারাটা জীবন তিনি দৃঢ় ঈমান, অদম্য সাহস ও দোয়ায় নিমগ্ন থেকে আহমদীয়াতের জন্য অসামান্য কুরবানী দিয়ে গেছেন।

তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী হায়াতুন নেছার বাল্য বয়সে– অর্থাৎ প্রায় ১৩/১৪ বছর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অষ্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয়। তাঁর স্বামীর নাম ছিল মুন্সি ছমির উদ্দীন। সেটা ছিল ১৯৩০ বা ১৯৩২ সাল। তৎকালীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে আহমদীয়াতের বিস্তার এবং এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা সমানভাবে চলছিল। আহমদীদের কাফের ফতোয়া দিয়ে তাদের সাথে সকল প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং সামাজিক সম্পর্ক রাখা হারাম ঘোষণা করা হয়। ফলে একজন অসহায় নারী হিসেবে হায়াতুন নেছাকে প্রতিনিয়ত সামাজিক বয়কট এবং নানাবিধ মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়। দীর্ঘদিন তাঁকে তাঁর বিধবা মা-র সাথে দেখা করতে ২/৩ মাইল দূরবর্তী তারুয়া গ্রামে যেতে দেয়া হয় নি। তাঁর মা, ভাই এবং বড় মামা ডা. আহমদ আলী পাশের বাড়িতে বিবাহিত তাঁর খালার বাড়িতে মাঝে-মাঝে আসতেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর মা, ভাই অথবা মামার সাথে দেখা করতে দেয়া হত না, কোনভাবে লুকিয়ে দেখা করলেও তাঁদেরকে এক গ্লাস শরবত দিয়েও আপ্যায়ন করতে পারতেন না। এই মনোবেদনা তিনি খোদার দিকে তাকিয়ে নীরবে সহ্য করে গেছেন দীর্ঘদিন।

হায়াতুন নেছার সংগ্রামের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় তাঁর সন্তান জন্ম নেয়ার পর। তিনি এই জগত সংসারের প্রতি নিতান্তই উদাসীন ছিলেন। সংসারের মোহ কখনো তাঁকে টানত না। বরং বলা চলে সংসারে বাস করেও তিনি ছিলেন সংসার বিরাগী এক নারী। যখন তাঁর বড় মেয়ে সুফিয়া বেগম এবং ছেলে সিরাজুল ইসলামের জন্ম হল তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, যে করেই হোক তার সন্তানদের তিনি নিরক্ষর রাখবেন না। সন্তানদের অক্ষরজ্ঞান দেয়ার মানসে তিনি ঘরে বসে তাঁর এক দেবরের কাছে নিজে অক্ষরজ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজের দুই সন্তানকে অক্ষরজ্ঞান দান করেন। তিনি সর্বদা চাইতেন তাঁর সন্তানরা যেন আহমদীয়াতের আলো লাভ করে। নিজের সংসার থেকে সন্তানদেরকে আহমদীয়াতের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে তিনি কোন উপায়ে তাদের বের করার চেষ্টা করেন। আর এই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসী এবং কুরবানীর মহিমায় উজ্জ্বল।

হায়াতুন নেছা বিবি তাঁর ভাই ডা. আবুল কাশেম (চান মিয়া) এবং বড় মামা ডা. আহমদ আলীর সাথে পরামর্শক্রমে তাঁর বড় মেয়ে সুফিয়া বেগমকে অত্যন্ত অল্প বয়সে তার থেকে ৪০ বছর বেশি বয়স্ক এক আহমদীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারের জামাতা ডা. নূর হোসেন সাহেব ছিলেন সেই বর, যার সাথে প্রায় নাবালিকা সুফিয়া বেগমের বিয়ে দেয়া হয়। ডা. নূর হোসেন সাহেবের প্রথম স্ত্রী জমিদার পচু বেপারীর কন্যা ৬ জন সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন। সেই ৬ সন্তানের পিতার সাথে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে মেয়েকে বিদায় দেন। পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা এটা জানতে পেরে দল বেঁধে তালশহর রেলস্টেশনের দিকে ছুটে যায় মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। হায়াতুন নেছা তাঁর এই মেয়েকে ধর্মের জন্য কুরবানী করেন এই মানসে যে, তাঁর অন্যান্য সন্তানরাও এই পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে এবং আহমদীয়াতের শিক্ষা লাভ করবে।

তাঁর এই কুরবানী আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছিল এবং এই কুরবানীর বরকতে তাঁর বড় ছেলে সিরাজুল ইসলামও একসময় বড় বোনের কাছে চলে আসেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি পরবর্তীকালে রেকাবি বাজার জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ডা. সিরাজুল ইসলাম নামে রেকাবি বাজার এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং সেখানে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এরপর ডা. সিরাজুল ইসলাম তার ছোট তিন ভাই ও এক বোনকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষিত করেন। এইভাবে হায়াতুন নেছা বিবি তাঁর সন্তানদের আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষিত করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন।

হায়াতুন নেছা তাঁর বড় মেয়েকে একজন মধ্যবয়সী ব্যক্তির কাছে বিয়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, আল্লাহ যেন তার কুরবানী গ্রহণ করেন। এই সময় এক রাতে তিনি একটি অসাধারণ স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নটি হল, তিনি যেন স্বল্পবয়সী এক কিশোরী বালিকা। মনের আনন্দে নাচতে-নাচতে পাশের বাড়ি তাঁর খালার বাড়িতে যাচ্ছেন। মাঝখানে পুকুর পাড়ে বাঁশঝাড় অতিক্রম করার সময় একটা উজ্জ্বল আলোকময় বস্তু যেন তাঁর গলায় এসে পড়ে। তিনি লক্ষ্য করেন, একটি বহু মূল্যবান সোনার হার তাঁর গলায় এসে পড়েছে। এই অবস্থায় তিনি যেন গানের সুরে বলতে থাকেন, "কি হার পরিলাম গলে, কহিতে না পারি!" এই অবস্থায় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এই স্বপ্ন তাঁর মনের দুশ্চিন্তা দূর করে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি এনে দেয়। পরবর্তীতে তাঁর ছেলে-মেয়েদের আহমদীয়াত গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে বলে শেষ বয়সে তিনি গল্প করতেন।

হায়াতুন নেছা অত্যন্ত কোমল মনের অধিকারী ছিলেন। নিকটাত্মীয়দের মাঝে পিতৃ-মাতৃহীন অনেক শিশুকে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে লালন-পালন করেছেন।

প্রতিবেশী গরীব-দুঃখী মানুষ তাঁকে অত্যন্ত আপন মনে করতেন এবং যেকোন সমস্যায় তাঁর কাছে ছুটে আসতেন। তিনিও তাঁর সাধ্যমত সকলকে সাহায্য দিয়ে কিংবা বিপদে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। এক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে যে বয়কট আরোপিত ছিল তা অকার্যকর হয়ে যেত। তিনি সর্বদা দোয়ায় রত থাকতেন। কোন বিপদ আসলে তিনি ধৈর্যহারা হতেন না বরং আল্লাহ্‌র সাহায্যে বিপদ অতিক্রম করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

তাঁর দোয়া গৃহীত হবার একটি অনন্য ঘটনা হল, তাঁর ৪ জন মেয়ে সন্তানের পর এক ছেলের জন্ম হয়। জন্মের পরই তিনি ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাঁর এই সন্তান বিকলাঙ্গ পা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। সেদিনই তারুয়া থেকে ডা. আহমদ আলী সাহেব আসেন। তিনি বলেন, "মামু দেখ তো এই ছেলের পা দু'টি যেন কেমন লাগছে!" ডা. আহমদ আলী সাহেবও দেখলেন ছেলের পা দু'টি উল্টো। তখন আহমদ আলী সাহেব শিশু সন্তানের মুখে হোমিও ঔষধ দিলেন এবং দোয়া করলেন। আর শিশুর মাকেও দোয়া করার জন্য বলে গেলেন। এই সন্তান দেখতে-দেখতে বড় হতে লাগল। মা'র মনে আশংকা; যদি তাঁর ছেলে হাঁটতে না পারে? তাহলে সে খাবে কী আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিবে কীভাবে? এই কথাটা ভাবতেই মা'র সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে প্রতিটি লোমকূপ থেকে যেন আল্লাহ শব্দ উচ্চারিত হয়।

সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, অতি অল্প বয়সেই সেই ছেলে ল্যাংড়া পা নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে এবং তুলনামূলক কম বয়সে মুখে-মুখে ছড়া বলতে শিখে গেছে। এতে বাড়ির সবাই খুব আশ্চর্য হয় এবং তার ল্যাংড়া পায়ে হাঁটা দেখতে এবং ছোট্ট মুখে ছড়া শুনে আনন্দ পেতে অনেকে সমবেত হত। এই ছেলের বয়স যখন ১২ বছর এবং ৭ম শ্রেণির ছাত্র, ক্রমে তার পা দু'টি সোজা হতে থাকে এবং আস্তে-আস্তে পায়ের পাতা মাটিতে রেখে হাঁটতে শুরু করে। এমনিভাবে মা'র দোয়ায় তার বিকলাঙ্গ শিশুটি স্বাভাবিক হয়ে যায়। আধুনিক চিকিৎসায় লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয়ে চিকিৎসা করানোর পরও অনেক বিকলাঙ্গ শিশুর পা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় না। কিন্তু এক আহমদী মা'র দোয়া কবুলিয়তের নমুনাস্বরূপ তাঁর সন্তানের পা অলৌকিকভাবে ভাল হয়ে গেল! উল্লেখ্য, এই নিবন্ধের লেখকই হল সেই শিশু-জন্মলগ্নে যার দু'টি পা বিকলাঙ্গ ছিল!

ফিরিশতা দর্শন: ১৯৭২-১৯৭৫ সনের কথা। ধর্মীয় বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করেছে। হায়াতুন নেছার ছেলেরা সবাই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এই সময় জাগতিক ধন-সম্পত্তির লোভে তাঁর দেবর আবদুল খালেক, ইউপি চেয়ারম্যান চরম বিরোধিতা শুরু করেন। দলবল নিয়ে চরম বিরোধিতার এক পর্যায়ে হায়াতুন নেছার সহজ সরল ও বৃদ্ধ স্বামী মুন্সী ছমির উদ্দীন বলে বসেন, "আমিও আমার ছেলের সাথে কাদিয়ানী হয়ে গেলাম!" এরপর বিরোধিতা আরও চরম আকার ধারণ করে। তাদেরকে পৃথক করে দেয়া হয়। হায়াতুন নেছা তাঁর অষ্টগ্রামের বাড়িতে কোন প্রকার দিন কাটাচ্ছেন। রাত্রে লোকজন ঘরের চালে ঢিল মারে। বাজার করতে যেতে পারে না। সামাজিক বয়কট চলছে। এক পর্যায়ে লোকমুখে তিনি শুনতে পান তাঁর ছোট মেয়ে মাহমুদা বেগম খুকীকে (যার বয়স হবে ৯/১০ বছর) নাকি বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে 'মুসলমান' বানিয়ে কোন ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়া হবে। এই কথা শুনে তিনি বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং দোয়ায় কান্নাকাটি করতে থাকেন। এক রাতে তিনি তার এই ছোট মেয়েকে গোপনে আহমদীয়াত গ্রহণকারী এক ননদের পুত্র আ. গণির (চেয়ারম্যানের আপন ভাগিনা) সাথে তারুয়ার পথে ঘর থেকে বের করে দেন। আর আল্লাহকে ডেকে বলেন, হে আল্লাহ! এই রাতে একমাত্র তুমিই এ দু'টি প্রাণীর হেফাযতকারী। আল্লাহর রহমতে সে রাত্রে দু'টি নিরীহ মানুষ নিরাপদে বিস্তীর্ণ মাঠ, ধানক্ষেত পার হয়ে তারুয়া পৌঁছে যায়। আলহামদুলিল্লাহ। এই মেয়ে মাহমুদা বেগম বর্তমানে মিরপুর জামা'তের সদস্যা। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ মিরপুর-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

হায়াতুন নেছা শেষ জীবন তাঁর ছোট ছেলে আসাদুজ্জামান-এর মিরপুরের বাসায় কাটিয়েছেন। তিনি প্রায়ই গল্প করে বলতেন, বাবারা আমি ফিরিশতা দেখেছি। তার এই মানবরূপী ফিরিশতা দর্শনের ঘটনা নিম্নরূপ:

ধর্মীয় বিরোধিতার এক পর্যায়ে যখন সামাজিক বয়কট চরমে পৌঁছে, তখন চৈত্র মাস। চারিদিকে পানির খুব অভাব। তার ওপর মানুষ জনের এই বাড়িতে আসা নিষেধ। বৃদ্ধ হায়াতুন নেছা পড়লেন মহা বিপাকে। যারা অল্প বয়স্কা মহিলা তারা সন্ধ্যার পর উত্তর পাড়ার হিন্দু বাড়ির এক পুকুরে যায়। গোসলসহ পানির যাবতীয় প্রয়োজন এভাবে তারা মিটায় কিন্তু আহমদী হায়াতুন নেছার কী গতি? দেখুন খোদার ফিরিশতা কীভাবে তাঁর দাসীর সেবায় এগিয়ে এলেন। তার ঘরের পাশে যাদের ঘর তারা তার নিকটাত্মীয়। তাঁর একসময়ের ভক্ত অনুরাগী। হায়াতুন নেছা তাদের অতিপ্রিয় বড় ভাবী। তারা গোপনে এসে বলে গেল ভাবী তুমি তো পানি আনতে পারবে না, তাই আমরা ঠিক করেছি রাত্রে যখন উত্তর পাড়ায় গোসল করতে যাব, তুমি তোমার সব খালি কলস ঘরের পেছনে রেখে দিও। আমরা এক-এক জন এক-এক কলসী পানি এনে তোমার ঘরের পেছনে রেখে যাব। প্রতিদিন যত কলস খালি হবে তা পেছনে রেখে দিও।

হায়াতুন নেছা গল্প করে বলেন, যখন চারিদিকে পানির জন্য হাহাকার তখন আমি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি টলটলে পরিষ্কার পানি ভর্তি কলসের সারি আমার ঘরের পেছনে। এই দৃশ্য দেখে তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, আর গর্বভরে বলেন, আমি ফিরিশতা দেখেছি, যারা আমার জন্য প্রাণ শীতল করা পানি এনে ঘরের পেছনে রেখে যেত।

খোদার প্রিয় বান্দারা এমনিভাবেই চরম বিপাকের মুহূর্তে ফিরিশতার সাহায্য লাভ করে থাকেন। এই খোদাপ্রেমিক মা ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সনে ইহজগত ছেড়ে তার প্রিয় প্রভুর সাথে মিলিত হন। মহান আল্লাহ তা'লা তাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরকে আমৃত্যু আহমদীয়াতের সেবা করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

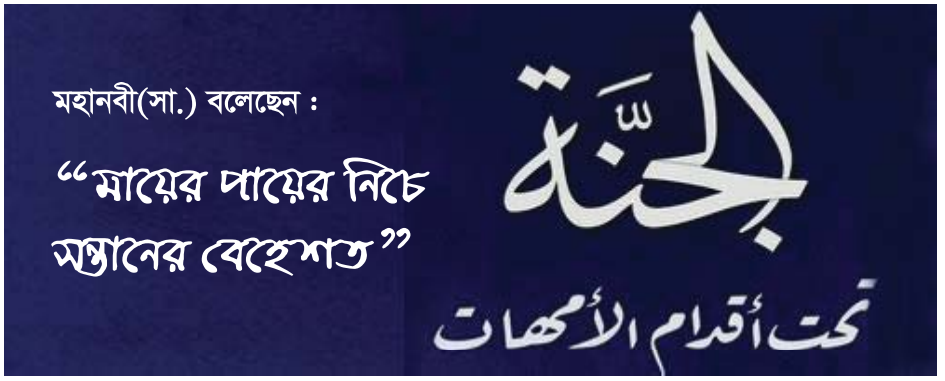

আকাশীয় রথে সত্য প্রচারের ব্যবস্থা

New Satellite Address:

Eutel Sat E70B at 70 Degrees East

Down Link Frequency : 11211

Down Link Polarization : Horizontal

Symbol Rate : 5111

FEC : 1/2

স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের কর্মচঞ্চল মুহূর্তগুলো

এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও-এর স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের একাংশ

চেয়ারে বসা বাম থেকে : ১. নাসিরুজ্জামান টিপু; ২. নাছের আহমদ; ৩. মোহাম্মদ খায়রুল হক ইনচার্জ, এমটিএ; ৪. নাদিম আহমদ; *পেছনের সারির বাম থেকে :* ১. রিপু আহমদ মামুন; ২. মুহাম্মদ উমর আলী; ৩. শামীম আহমদ সাগর; ৪. জসিম উদ্দিন; ৫. নাসির উদ্দিন আহমেদ মিজান; ৬. এস এম সুমন আহমেদ; ৭. আহমদ মাজাহারুল হক আশরাফ; ৮. নওশাদ আহমদ; *সামনের সারির বাম থেকে :* ১. আবু নাসের আহমদ; ২. রাহাতুল হাসান রফি; ৩. ফখরুল হাসান হৃদয়; ৪. মাকসুদ আহমদ; ৫. মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন; ৬. ধীমান মিয়াজী।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী ও এর কয়েকটি ঝলক

হামিদুর রহমান

আজ থেকে একশ' পঁচিশ বছর পূর্বে ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) সত্যের বীজ বপন করে দ্বন্দ্বময় সভ্যতার চলমান স্রোতধারায় এক নতুন সভ্যতার সূচনা করেছিলেন– যার নাম আহমদীয়াত। কালের প্রবাহে সেই সত্য সভ্যতার অগ্রযাত্রা সাগরের উত্তাল ঊর্মিমালার মত আজও প্রবহমান। এই পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত সত্যের এই প্রবহমান ধারা লয় হবার নয়। আহমদীয়াত ইসলামে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করে মুসলমানদের নবজীবন দান করেছে। এ আন্দোলন শতবর্ষ অতিক্রম করেছে পঁচিশ বছর আগে ১৯৮৯ সালে এবং বর্তমানে এর বয়স ১২৫ বছর। যে কোন জাতির জন্য শতবর্ষ অতিক্রম করা একটি গৌরবের বিষয়। এটি যেমন পার্থিব সংগঠনের জন্য গর্বের, তেমনি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের জন্যও সাফল্যের বড় পরিচয় বহন করে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর প্রবর্তিত ও প্রদর্শিত ইসলামের প্রকৃত রূপ আহমদীয়াত– যা মুসলমানরা তেরশ' বছরের প্রবাহে হারিয়ে ফেলেছিল। কুরআন করীমের নির্দেশ ও নবী করীম(সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) এই বিপ্লবের সূচনা করেন।

আসুন এই আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতির কিছুটা ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করি, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যতা বিচার করি। আমি বিশ্বাস করি, আহমদীয়াতের এই বিজয় ও ক্রমোন্নতির ইতিহাসে আমরা ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস প্রতিবিম্বিত হতে দেখব।

বাংলাদেশে আহমদীয়াত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। আজ আমরা এদেশের সন্তান হিসেবে গর্বের সাথে বলতে পারি, শতবর্ষ ধরে মুহাম্মদী মসীহ-র পতাকা উঁচুতে তুলে ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। এরই এক ঝলক পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্ণ করে ২০১৩ সালে। জামা'তকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কর্ণধার ছিলেন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঋষিকল্প পুরুষ অবিভক্ত বাংলার ধর্মীয় আলেম মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)। অবশ্য এর আগে আরও দুই জন সত্যসিদ্ধ পুরুষ ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে এই আন্দোলনের সারথি হয়ে যুগ ইমামের সাহাবী হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হলেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বটতলী গ্রামের অধিবাসী **মৌলভী আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ(রা.)**। তিনি সম্ভবত ১৯০৫ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি পর্যটক হিসেবে দিল্লী পৌঁছান এবং সেখানে ইমাম মাহদী আবির্ভাবের খবর শুনেন এবং সজ্ঞানে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কাদিয়ান গমন করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে "হাক্কুল একিন"-এ অনুপ্রাণিত হয়ে আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করেন। সত্য গ্রহণের পর নিজ দেশে ফিরে সেই সত্যকে সবার মাঝে বিলিয়ে দেয়ার এক অসাধারণ সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ ইসলামের শিক্ষা হল, যা কিছু তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর তা তুমি তোমার ভাইয়ের জন্যও নির্ধারণ করো। তাই আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ(রা.) যে অমৃত সুধা নিজে পান করেছিলেন সেই অমৃত সুধা নিজ ভাই-বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় আজীবন সচেষ্ট ছিলেন।

এমনি আরও একজন সত্যানুসন্ধানী সিদ্ধপুরুষ বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কটিয়াদী থানার নাগেরগাঁও গ্রামের কৃতী সন্তান হযরত **রইস উদ্দিন খান(রা.)**। তিনি বার্মায় পোস্টমাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পত্র-পত্রিকায় ইমাম মাহদী আগমনের সংবাদ পেয়ে সত্যের সন্ধানে কাদিয়ানে যাত্রা করেন। সেখানে ১৫ দিন অবস্থান করে এ যুগের পরশ-পাথরের সংস্পর্শে থেকে সোনায় পরিণত হয়ে দেশে ফিরেন। ১৯০৬ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করে যুগ-ইমামের সাহাবী হবার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর স্ত্রী আজিজাতুন নেসা সাহেবাও পত্র মারফত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর কাছে ১৯০৭ সালে বয়াতের আবেদনপত্র পাঠান।

এরপরই আসে বগুড়ার খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলীর নাম। তিনি ১৯০৯ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এসব প্রথিতযশা ব্যক্তিরা বাংলাদেশে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানকারী ঋষিকল্প পুরুষ মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের ইতিহাস অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর মোকাম ও মর্যাদা, জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা তাঁর অঞ্চলের মানুষের কাছে সুবিদিত ছিল। বাংলাদেশের আহমদীয়াতের আকাশে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ। তিনি নিজ এলাকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম ছিলেন। লক্ষ্ণৌ হতে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি মৌলভী আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি মহলের ছাত্র ছিলেন। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার তাঁর আধ্যাত্মিক গবেষণার ফসল। তিনি দীর্ঘকাল হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর সাথে পত্রের মাধ্যমে মতবিনিময় করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সম্বন্ধে এই বলে এক চিরস্থায়ী সনদ প্রদান করে গেছেন– **"আপনার লেখার মধ্যে সাধুতা ও সৌভাগ্যের সুগন্ধ পাওয়া যায় এবং এই লেখা সৌভাগ্যবান ও সত্যপিপাসুর বলে প্রতীয়মান হয়।"**

১৯০২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের খ্যাতনামা উকিল মুন্সি মুহাম্মদ দৌলত খাঁ সাহেব লাহোরের নামকরা হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরায়শী(রা.)-এর কাছ থেকে 'মোফার্‌রাহে আম্বরী' নামক ঔষধ আনয়ন করেন। হেকিম সাহেব সেই ঔষধের প্যাকেটে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)-এর দাবি সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রেরণ করেন। ঘটনাপ্রবাহে বিজ্ঞাপন হযরত মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হস্তগত হয়। তখন থেকে তিনি হযরত মির্যা সাহেবের সঙ্গে সরাসরি পত্রযোগে সত্য উদঘাটনে ব্রতী হন এবং তাঁর লিখিত বিভিন্ন পুস্তক অধ্যয়ন করতে থাকেন। কয়েকটি পত্র হযরত সাহেবের লিখিত 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত

হয়েছে। এরূপ গবেষণায় বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হয়। ইতোমধ্যে ১৯০৮ সালে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.) ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার চার বছর পরে ১৯১২ সালে ক'জন ভক্ত মুরিদান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তিনজন সঙ্গীসহ আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্রভূমি 'কাদিয়ান' যাত্রা করেন। বাংলাদেশের একপ্রান্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশন হতে বাটালা পর্যন্ত এই ১৩-১৪ শ' মাইল। এই দীর্ঘ ভ্রমণের সময় রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে বঙ্গ, বিহার, ইউ.পি. ও পাঞ্জাবের খ্যাতনামা ও প্রখ্যাত আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হযরত মির্যা সাহেবের দাবি এবং সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করার পর অবশেষে তিনি কাদিয়ানে উপস্থিত হন। তিনি বাটালা স্টেশনে নামতেই 'আহলে হাদীস' সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আলেম মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন বাটালভী তাঁকে কাদিয়ান না গিয়ে দেশে ফিরে যেতে অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু মওলানার সত্যসন্ধানী মন সত্য গ্রহণে বদ্ধপরিকর ছিল বিধায় কোন বাধাই তাঁকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় তিনি কাদিয়ানের সমাজ পর্যবেক্ষণ করে এবং কয়েকদিন অবস্থান করে হযরত মির্যা সাহেবের প্রথম খলীফা হযরত মওলানা আলহাজ্জ হাফেজ নূরুদ্দীন(রা.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন।

কাদিয়ানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি বয়াত করে দেশে ফিরে তবলীগের ময়দানে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও তার আশেপাশে প্রায় বারশ মানুষ তাঁর মাধ্যমে বয়াত করেছিলেন। কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষ পতঙ্গের মত আহমদীয়াতের আলোর বৃত্তে এসে জমায়েত হয়েছিল। একপর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জনপদই বঙ্গীয় আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। যে সমস্ত ভক্ত মুরিদ তাঁকে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছিলেন তাদের কেউ কেউ তাঁর প্রধান শত্রু হয়ে ওঠেন। শুধু আহমদী মতবাদ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে যে কত প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, তা বর্ণনাতীত। বিরুদ্ধবাদীদের শত্রুতার ফলে তাঁকে কাজীর পদ ত্যাগ করতে হয়। এতে তাঁর আর্থিক অবস্থা নিতান্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু ধর্মের জন্য কীভাবে অনিত্য সংসারের মান-সম্ভ্রম ও অর্থ-সম্পদ ত্যাগ করে অম্লান বদনে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ধারণ করতে হয়, তিনি এর জ্বলন্ত আদর্শ দেখিয়ে দিয়েছেন।

আল্লামা জিল্লুর রহমান

তাঁর সমুদয় জীবনের উপার্জিত জ্ঞানের অমূল্য রত্নভাণ্ডার একটি বিরাট পুস্তকাগার ও বসতবাড়ির কিছু অংশ জামা'তকে দান করে গেছেন– যেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম মসজিদ 'মসজিদুল মাহদী' অবস্থিত। এই 'মসজিদুল মাহদী'তেই ২৫শে নভেম্বর ২০১২ তারিখে তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী উৎসব পালন শুরু হয়।

১৯১৩ সাল: বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালে। অবিভক্ত বাংলার আহমদীয়াতের প্রথম কেন্দ্র মৌলভী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক(রা.)-এর তাহরীকে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন হতে আহমদীগণ জুমু'আর নামায পড়তে এলে প্রত্যহ এক পয়সা, দুই পয়সা করে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে হযরত মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব প্রেসিডেন্ট এবং মুন্সী মোহাম্মদ দৌলত খাঁ সাহেব সেক্রেটারি ছিলেন।

পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)-এর যুগে ১৯১৬ সালে মওলানা সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আমীর নিযুক্ত হন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীয়াত আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

১৯১৫-১৯১৬ সালের মধ্যে একশ' জন সত্যানুসন্ধানী বয়াত গ্রহণ করেন। আল্লামা জিল্লুর রহমান ও সুফি মতিউর রহমান এই এক'শ জনের মধ্যে অন্যতম।

বিশ দশকে ভারতবর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের শুদ্ধি আন্দোলন শুরু। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করা। এই আন্দোলন প্রতিহত করে নব-দীক্ষিত মুসলমানদের স্বীয় ধর্মে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যুগ-খলীফার নির্দেশে অন্যান্যদের সাথে বাঙালি যুবক আল্লামা জিল্লুর রহমান শুদ্ধি আন্দোলন প্রতিহত করার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। যুগ-খলীফার সময়োপযোগী বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনার প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধি আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং আহমদী মুসলমানরা শতভাগ সাফল্য অর্জন করে।

১৯২৬ সাল: মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব মুবাল্লেগীন ক্লাস হতে পাশ করে অবিভক্ত বাংলার বাঙালি মুবাল্লেগ নিযুক্ত হন। এ সময় উত্তরে রংপুর- জলপাইগুড়ি, দক্ষিণে বরিশাল-পটুয়াখালী পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ তাঁর তবলীগের বিচরণক্ষেত্র ছিল। এ সময়ের তবলীগি সফরগুলোতে বহু তবলীগ ও মোনাযেরা হয়। তাঁকে বহু ধরনের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সময়ে তাঁর তবলীগে বহু বয়াত হয় এবং অনেকগুলো জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

তখন রংপুরের এক অঞ্চলের উপজাতিরা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল। মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব উক্ত অঞ্চল সফর করেন ও একাগ্রতার সাথে তবলীগ করেন। ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার জোয়ার থেমে যায় এবং তাদের একাংশ আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

১৯৩৮ সাল: ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যে ধর্মীয় বির্তকের আয়োজন করা হয়। মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব এবং মধ্যপ্রাচ্য ফেরৎ আহমদী মোবাল্লেগ মওলানা মুহাম্মদ সেলিম এই বিতর্কে আহমদীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এক পর্যায়ে অ-আহমদী মওলানাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আহমদী মোবাল্লেগ সেলিম সাহেব আরবী ভাষায় মোট ১৮ ঘন্টার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

১৯৩৭ সাল: এ বছর মার্চ মাসে কোলকাতায় পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন-এর অধিবেশনে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম প্রচার দ্বারা পৃথিবীময় ধর্মীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের বিরুদ্ধে কিছু অভিমত ব্যক্ত করেন। মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদে বগুড়া এডওয়ার্ড করনেশন হলে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া জামা'তের বার্ষিক জলসায় রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্য বলিষ্ঠ ভাষায় খণ্ডন করেন।

১৯৪০ সাল: কিশোরগঞ্জ জেলার

দক্ষিণ প্রান্ত কটিয়াদী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম প্রেমারচর। মওলানা তালেব হোসেন নামে একজন প্রখ্যাত মওলানা যিনি নিজ অঞ্চলে বড় মওলানা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সত্য বুঝতে পেরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ফলে এতদঞ্চলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এর ফলশ্রুতিতে অ-আহমদীদের পক্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ দশ গ্রামের উল্লেখযোগ্য আলেমদের নিয়ে মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে আহমদীদের সাথে এক ধর্মীয় বিতর্কের আয়োজন করে। আহমদীদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব। অ-আহমদী মওলানাগণ আহমদী মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের কুরআন ও হাদীস থেকে প্রদত্ত বক্তব্যের তোড়ে টিকতে না পেরে অযথা গোলমাল সৃষ্টি করে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এই বাহাসের ফলে এতদঞ্চলে আহমদীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৪০ সাল: আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব মওলানা রুহুল আমিন সাহেবের রচিত 'রদ্দে কাদিয়ানী' পুস্তকের যথোপযুক্ত জবাব হিসেবে 'হাদীসুল মাহদী' পুস্তক রচনা করেন। কালজয়ী এই পুস্তকটি অবিভক্ত বাংলায় একজন প্রশিক্ষিত মোবাল্লেগের মত কাজ করে চলেছে।

১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বর: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকনাথ ট্যাঙ্কের ময়দানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪৭তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসার প্রথম দিনে বিরুদ্ধবাদী মৌলভী-মওলানাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উস্কানিতে ইট-পাটকেল ও লাঠিসোঁটা ছুড়ে মারা হয়। এর ফলে নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত খাদেম মোহাম্মদ উসমান গণি ও তারুয়া নিবাসী মোহাম্মদ আব্দুর রহিম শাহাদাত বরণ করেন। এই হামলার বদৌলতে বাংলাদেশ জামা'তও প্রথম শহীদের মিছিলে শামিল হয় এবং আল্লাহর অশেষ রহমতের নিদর্শন লাভ করে।

১৯৭১ সাল: এ বছর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের আহমদীরা আহমদীয়াতের কেন্দ্র থেকে কিছুদিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। পরে যুগ-খলীফার নির্দেশনায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ স্বতন্ত্র দেশীয় জামা'তরূপে পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

১৯৮৭ সালের ২৭ শে এপ্রিল: খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের নামে উগ্র-ধর্মান্ধ গোষ্ঠী কৃর্তক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মসজিদে মোবারকসহ কয়েকটি মসজিদ দখল করা হয়।

এর কিছুকাল পর এরশাদ সরকারের ধর্মমন্ত্রী মওলানা আব্দুল মান্নান তার এক আহমদী বন্ধুকে এই মর্মে অবহিত করেন, সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে আহমদীদের অ-মুসলিম ঘোষণার বিল উপস্থাপন করতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন দেখুন, পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন।

১৯৯২ সালের ২৯শে অক্টোবর: এক শ্রেণির উগ্রবাদী মোল্লাদের দ্বারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্র ৪নং বকশী বাজার মসজিদ কমপ্লেক্স আক্রান্ত হয়। ৩৫ জন মুসল্লি আহত, কুরআন শরীফ ও বহু বই-পুস্তক আগুনে পোড়ানো হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে অ-মুসলিম ঘোষণা করার পাঁয়তারাও শুরু হয়। সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে সরকার কর্তৃক আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করার প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি নেয়া হয়। তৎকালীন সরকার প্রধানকে উদ্দেশ্য করে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর 'তিনকে চার' না করার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। [তিন-কে চার না করার তাৎপর্য: পাকিস্তানে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সে দেশের দু'জন সরকার প্রধান আহমদীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার রুদ্ররোষে পড়ে ধ্বংস হন। সউদী বাদশাহ ফয়সালও আহমদী বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ধ্বংস হন। বাংলাদেশ যেন সে পথ অনুসরণ করে চতুর্থ দৃষ্টান্তে পরিণত না হয় সেজন্য হুযূর (রাহে.) এ অনুরোধ করেন। [১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯২-এর খুতবা]।

১৯৯৯ সালের ৮ই অক্টোবর: খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে জুমু'আর দিন খুতবার আগে কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি নামাযীর ছদ্মবেশে প্রবেশ করে বোমাভর্তি ব্যাগ রেখে অগোচরে সরে পড়ে। এ ঘৃণ্য ও কাপুরুষোচিত বোমা হামলায় সাত জন আহমদী ভ্রাতা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। মোবাল্লেগ মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকীসহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। পরবর্তী চিকিৎসার সময়ে ইমাম মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের ডান পা হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়েছে। জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব একটি চোখ ও অর্ধেক পায়ের পাতা হারান, জনাব গাজী ওমর ফারুক একটি আঙ্গুল হারিয়েছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্বাস নালীর পাশে স্প্রিন্টারসহ কাটান।

২০০৩ সালের ৩১ শে অক্টোবর: উগ্রবাদী মোল্লাদের লাঠির আঘাতে যশোরের ঝিকরগাছার রঘুনাথপুরবাগ গ্রামের আহমদীয়া মসজিদের ইমাম শাহ আলম সাহেব শাহাদাত বরণ করেন।

২০০৪ সাল : খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশের আমীর মওলানা মাহমুদুল হাসান মমতাজী ও মুফতি নূর হোসেন নূরানী মিছিলসহ নাখালপাড়া আহমদীয়া মসজিদ দখলের চেষ্টা করেন। সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবি, বিদেশী কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায় এবং পুলিশের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তাদের মসজিদ দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

২০০৫ সালের ১৭ই এপ্রিল: মওলানা নূরানীর নেতৃত্বে তার অনুগত কয়েক হাজার লোক মিছিল করে লাঠিসোঠাসহ সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবনের প্রান্ত ঘেঁষা গ্রাম যতীন্দ্রনগরের আহমদীয়া মসজিদ আক্রমণ করে। আহমদীদের বাড়িঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। মসজিদ থেকে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্"** কলেমা খচিত সাইনবোর্ড অপসারণের চেষ্টা করা হয়। এ সময়ে স্থানীয় আহমদীদের বীরোচিত সাহসিকতায় আক্রমণকারীদের মসজিদ দখল ও কলেমা মুছে ফেলার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

শতবর্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অর্জন: বিগত এক শ' বছরে নানা রকম বিরোধিতা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশে আহমদীয়াতের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি প্রবহমান। বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের স্থানীয় জামা'তের সংখ্যা প্রায় ১২০টি; মসজিদের সংখ্যা প্রায় ১৫০টি, এছাড়া রয়েছে নামায সেন্টার ও মিশন হাউজ। বর্তমান কেন্দ্র ৪ নম্বর বকশী বাজার রোডে অবস্থিত মসজিদটি প্রথমদিকে কাঁচা ঘর ছিল। সেখানে এখন এক বিশাল সুপ্রসস্ত পাকা মসজিদ ও ৬ তলা কমপ্লেক্স স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জামেয়া আহমদীয়া, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাদ্রাসাতুয যাফর হেফযুল কুরআন ক্লাসসহ আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব কিছু আহমদীয়া জামা'তের প্রতি আল্লাহ তা'লার একান্ত ফযল ও সত্য জামা'তের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত
বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৭ জানুয়ারি ২০১৩ পৃষ্ঠা ৮

NEWAGE
MONDAY, JANUARY 7, 2013 PAGE 3

কালের কণ্ঠ
১১ জানুয়ারি ২০১৩, শুক্রবার পৃষ্ঠা ১১

দৈনিক পূর্বকোণ
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, মঙ্গলবার পৃষ্ঠা ১০

এছাড়াও বিভিন্ন সময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পক্ষ থেকে যেসব ক্রোড়পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে– তার একটি উপরে তুলে ধরা হল।

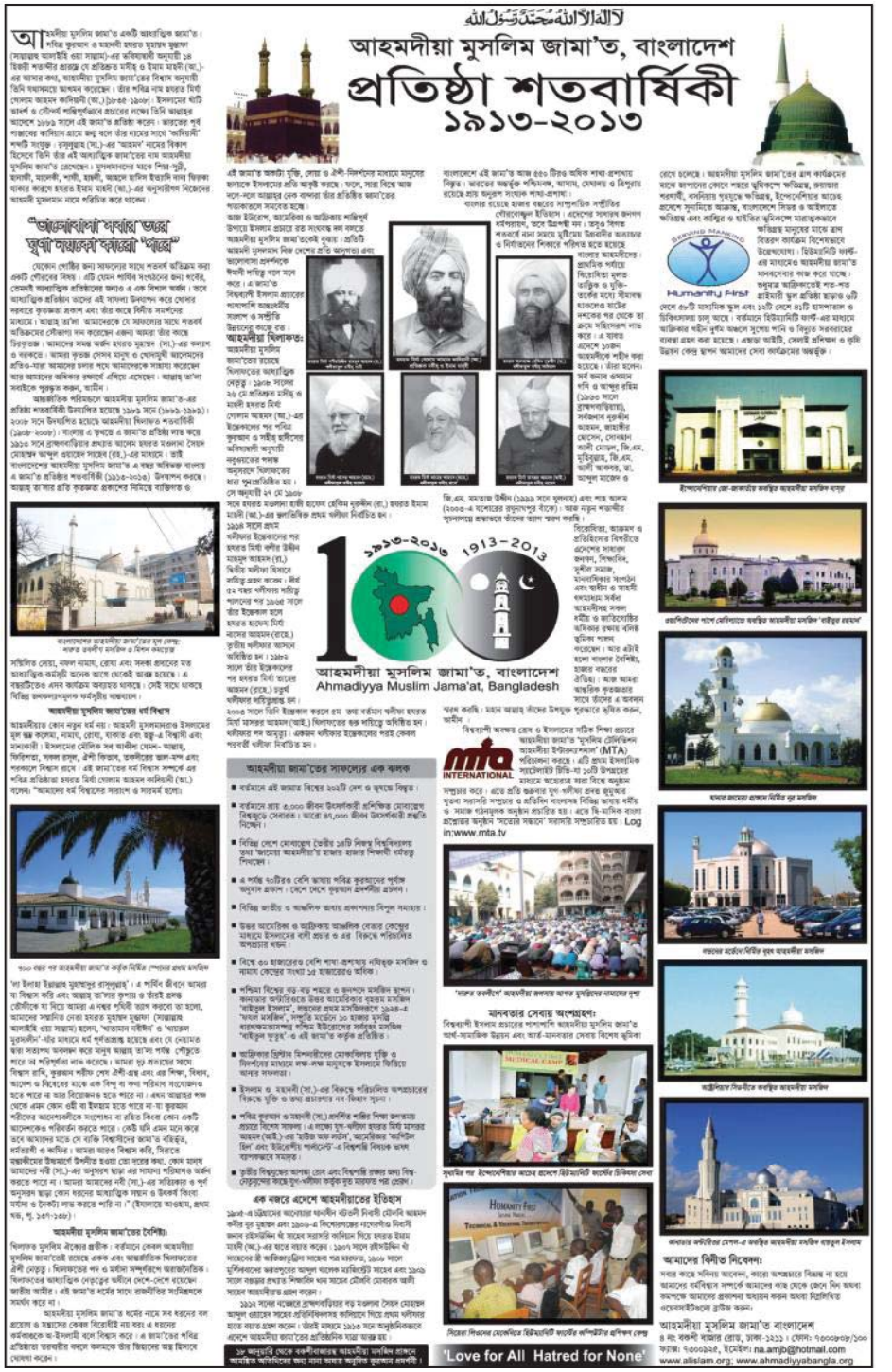

২৫শে নভেম্বর ২০১২ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদুল মাহদীতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায

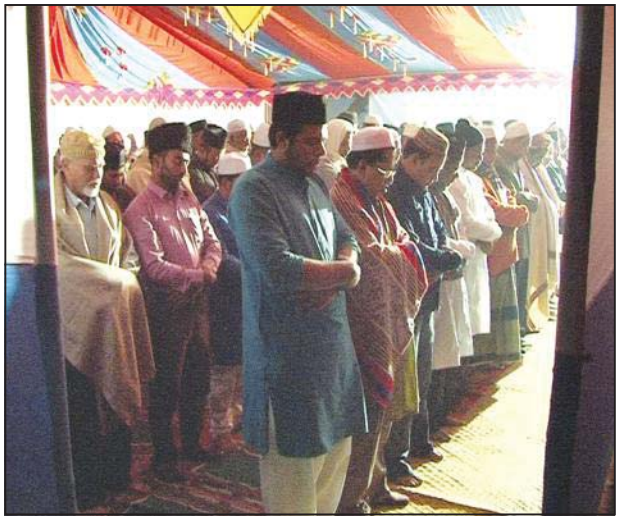

একই দিনে ফজরের নামাযের পরে দরস

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন

Centenary Celebrations of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

শতবর্ষ লোগো উন্মোচন ও সংবাদ সম্মেলন (The Ahmadis in gratitude on the occasion of their centenary)

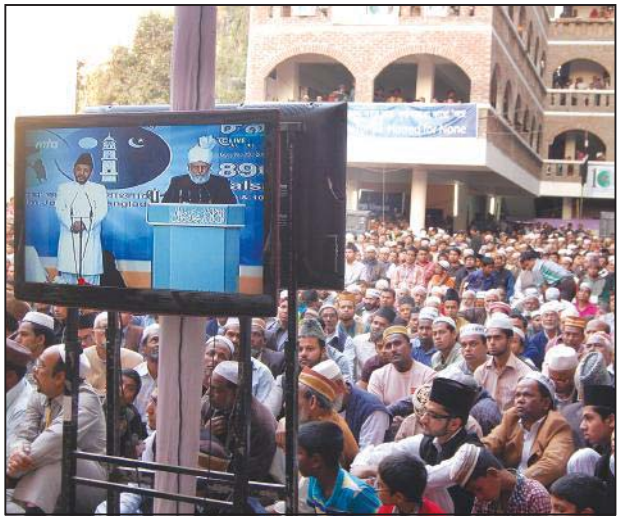

জলসাশেষে মিরপুর জামাতে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান

কৃতজ্ঞতা স্মারক গ্রহণ করছেন ড. কামাল হোসেন

স্মারক গ্রহণ করছেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

স্মারক গ্রহণ করছেন বর্তমান বিমান মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন

স্মারক গ্রহণ করছেন ড. সুলতানা কামাল

স্মারক গ্রহণ করছেন অধ্যাপক আসিফ নজরুল

পরবর্তীতে স্মারক গ্রহণ করছেন মইনউদ্দিন খান বাদল, এমপি

শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কুরআন প্রদর্শনী পরিদর্শন শেষে মন্তব্য খাতায় অনুভূতি লিখছেন ড. কামাল হোসেন

The Centenary Thanksgiving Ceremony: Darut Tabligh Complex, Jan. 18th 2013

শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবর্গ আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্রীয় কমপ্লেক্সে পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

PEACE
LOVE FOR ALL
HATRED NONE

WELCOME RECEPTION IN HONOUR OF THE HEAD
OF THE WORLDWIDE AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
HADHRAT MIRZA MASROOR AHMAD, KHALIFATU
ASIH V(ABA)

A MESSAGE OF PEACE

‘The tensions that capitalise on extremist philosophies can only be countered with a sincere effort for peace.’–

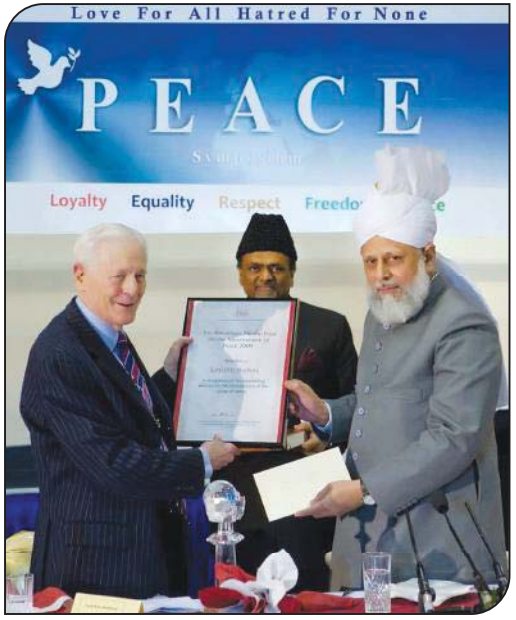

The Ambassador of Peace
Mirza Masroor Ahmad (aba)

শান্তির দূত খলীফা মাসরূর

বিশ্বব্যাপী বিরাজমান অস্থিরতা ও সংকট নিরসনে বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারকদের সামনে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা’তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষা বারবার তুলে ধরেন

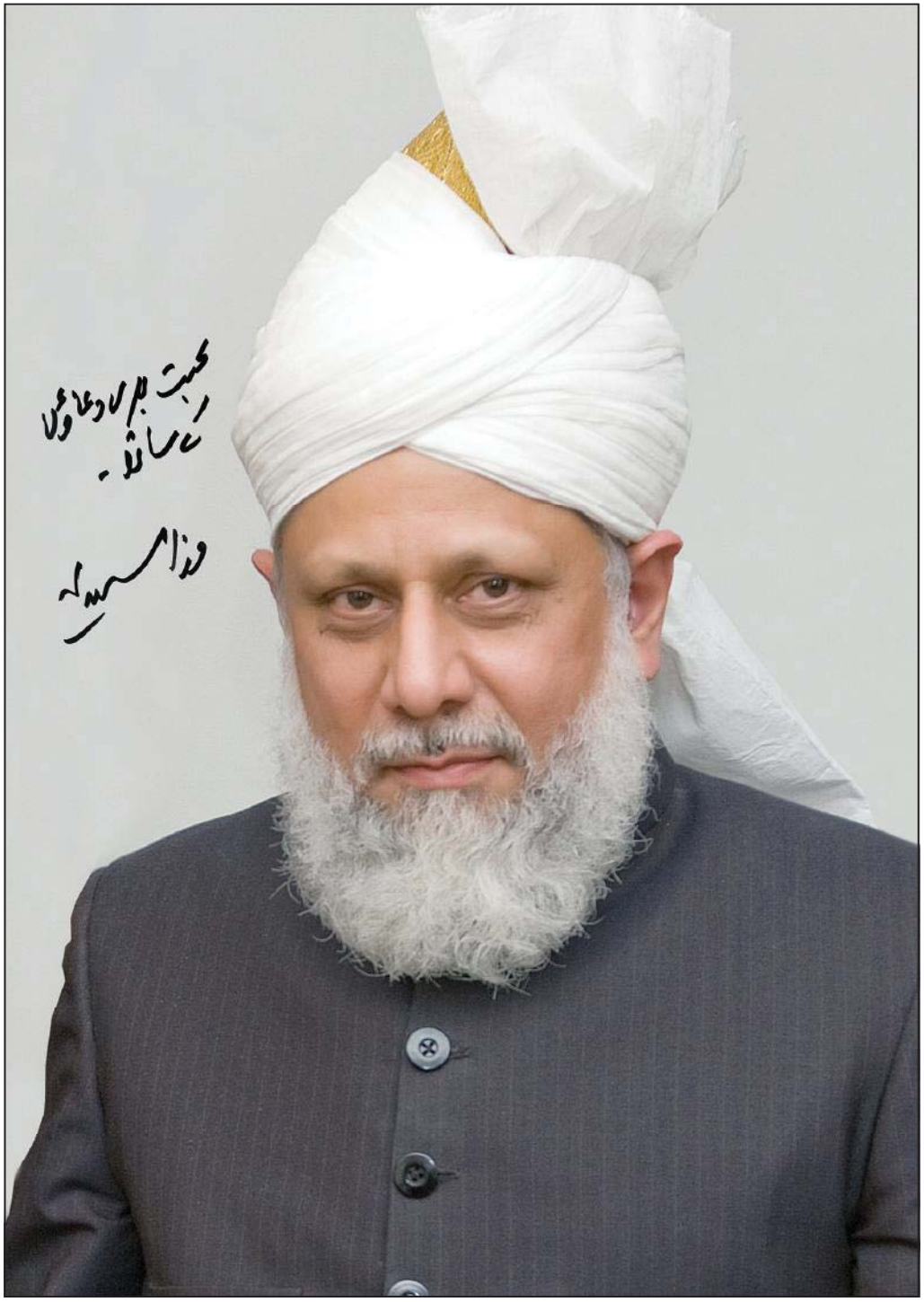

ধর্মীয় উগ্রবাদ বনাম প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ *(সূরা আনআম : ১০৮)*

ধর্মীয় উগ্রবাদের তথা উগ্র-ধর্মান্ধতার বিভিন্ন পর্যায় ও স্বরূপ রয়েছে। বর্তমানে এই দানবটির বীভৎসতম রূপ প্রকাশিত হয়েছে নাইজেরিয়ার 'বকো হারাম' ও এরপর উত্তর সিরিয়া ও ইরাকের 'আইসিস'-এর মাধ্যমে। এদের কথা হল, এরা প্রতিশোধ নিতে চায়। এরা গোটা পৃথিবীর দখল চায়। মুসলমানদেরকে এরা গোটা পৃথিবীর শাসক বানাতে চায় আর সব অমুসলমানকে তাদের দাসে বা সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায়। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে মুসলমানদের কোন না কোনভাবে আঘাত দিয়েছে এরা তার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। একইভাবে এরা শরীয়া আইন প্রত্যেক দেশে প্রতিটি মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে আগ্রহী। এরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা অন্যান্য মুসলিম ফির্কার নারীদের অপহরণ করতে, তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত করতে এবং কার্যত রক্ষিতা বানিয়ে দিতে, অন্তত জোরপূর্বক নিজেদের স্ত্রী বানাতে চায়। আইসিস তাদের মনগড়া ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম এবং ভিন্ন মতাবলম্বী সব ফির্কাকে ধ্বংস করতে উদ্যত এবং সেই অঞ্চলের বর্তমান মুসলমান সরকার ও রাষ্ট্রগুলোকে উৎখাত করতে সচেষ্ট।

পাঠকবৃন্দ! এ সমস্ত কর্মকাণ্ড পবিত্র ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে চালানো হচ্ছে বলে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় মুসলমানের অন্তর আজ ক্ষত-বিক্ষত আর বেদনায় ভারাক্রান্ত। কেননা, এ ধরনের বর্বর ও জঘন্য কর্মকাণ্ড শুধু ইসলাম কেন, কোন ধর্মই সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রে আর প্রতিটি স্তরে যে শিক্ষা প্রদান করে তার মূল লক্ষ্য হল, সব ধর্মের মানুষের জন্য যেন অধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর উম্মত হবার দাবি করে এরা যে কী নির্লজ্জভাবে তাঁরই(সা.) শেখানো ধর্মের অবমাননা করছে তা বলে বুঝানোর ভাষা আমাদের নেই। এরা মহানবী(সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের সেই উপদেশটিও মনে রাখে নি যেখানে তিনি তাঁর উম্মতকে সাবধান করে বলেছিলেন: **আলা লা তারজিউ বা'দী কুফ্ফারান ইয়াযরিবু বা'যুকুম রিকাবা বা'য** অর্থাৎ **'সাবধান! আমার মৃত্যুর পর তোমরা একে অপরের মুণ্ডপাত করে কাফের হয়ে যেও না'** *(বুখারী, কিতাবুল হজ্ব, বাব খুতবা ফিল মিনা)*। বরং আক্ষরিকভাবেই প্রতিপক্ষের গলাকেটে জবাই করে এরা সাব্যস্ত করে দিয়েছে, এরা সেই 'জল্লাদ সন্ত্রাসীর দল' যাদেরকে মহানবী(সা.) নিজে কাফের ঘোষণা করে গেছেন।

গত ৮ই নভেম্বর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.) এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের রাজনীতিবিদ ও নীতি-নির্ধারকদের একাংশের উপস্থিতিতে সেখানে অনুষ্ঠিত 'আহমদীয়া শান্তি সম্মেলনে' একটি প্রাঞ্জল বক্তৃতা প্রদান করেছেন। আমি সেখান থেকে এবং তাঁরই প্রদত্ত পূর্ববর্তী কিছু বক্তব্যের আলোকে আমার রচনাটি সাজিয়েছি।

পবিত্র কুরআন প্রদত্ত শিক্ষার দিকে তাকালে এবং মহানবী(সা.)-এর জীবনাদর্শের দিকে লক্ষ্য করলে একথা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কখনোই প্রথমে আক্রমণ রচনা বা যুদ্ধ করেন নি। মুসলমানরা কখনও যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেদের আত্মরক্ষা এবং অত্যাচারী আগ্রাসীর অনাচার প্রতিহত করা। দেশ দখলের বা অন্যদেরকে নিজেদের অধীনস্থ করার অভিপ্রায় নিয়ে তাঁরা কখনই যুদ্ধ করেন নি। মক্কার দীর্ঘ ১৩ বছরের জীবনে মহানবী(সা.) শান্তিপূর্ণভাবে কেবল ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারেরই কাজ করেছেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করে নি বরং অমানবিক জঘন্যতম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। মক্কাবাসীদের অত্যাচার অনাচার এমন এক ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যখন আল্লাহর আদেশে সঙ্গীদের নিয়ে মহানবী(সা.)-কে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে। মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করার পরও যখন মক্কাবাসীরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য মদীনার দিকে অগ্রসর হয় এমন নিরুপায় অবস্থাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি সূরা হজ্জের ৪০ এবং ৪১ আয়াতে এ ভাষায় মুসলমানদের প্রদান করা হয়:

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۝ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

আল্লাহ তা'লা বলছেন, 'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে (এখন) তাদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হল, কেননা তারা (এক দীর্ঘ যুগ ধরে)অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়ে এসেছে। আর আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।' 'এরা তারা যাদেরকে নিজেদের বাড়িঘর থেকে অন্যায়ভাবে কেবল 'আল্লাহ্ আমাদের একমাত্র প্রভু' বলার কারণে বের করে দেয়া হয়েছে। এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একদল মানুষকে দিয়ে যদি আরেক দলকে প্রতিহত করা না হত, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহও ধ্বংস করে দেয়া হত যেখানে আল্লাহর নাম বেশি করে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন যে (ধর্মের পথে) তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।'

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় স্পষ্ট করে বলছে, এক দীর্ঘকাল অত্যাচারিত নিপীড়িত হবার পর আল্লাহর আদেশে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করাটা ইসলামী জেহাদের একটি রূপ। আগ্রাসী হয়ে 'বাউন্টি হান্টার' সেজে নিরীহ মানুষ খুন করার নাম জিহাদ নয়– এটি সন্ত্রাস, স্পষ্ট নৈরাজ্য। আর এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ঘোরতর অপরাধ। আরও দেখুন, দ্বিতীয় আয়াতটিতে কী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য এ যুদ্ধ নয়। আত্মরক্ষার জন্য এই সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ। আর কেবল মুসলমানদের রক্ষার্থে এই যুদ্ধ নয় বরং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের স্বার্থ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে এই যুদ্ধ। বর্তমান যুগের উগ্র-ধর্মান্ধরা ইসলামের এই

সুবর্ণ নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে নিরীহ নিরস্ত্র মুসলমান-অমুসলমান উভয়কে নিধন করার নাম রেখেছে ইসলামী জেহাদ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক)।

একটু আগেই মদীনায় হিজরতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। মদীনায় হিজরতের পূর্বে সেখানে প্রধানত দু'টি দলের বসবাস ছিল। একটি ছিল, আরব পৌত্তলিকদের, অপরটি ছিল ইহুদীদের। মুসলমানরা হিজরত করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে দলের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় তিনটিতে– মুসলমান, ইহুদী এবং অমুসলিম আরব। মহানবী(সা.) সে সময় তিন দলের শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য একটি চুক্তি প্রস্তাব করেন যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠীকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হয়। প্রত্যেক গোত্রের প্রাণ ও সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পূর্ব-প্রচলিত গোত্রীয় রীতি-নীতি ও সামাজিক প্রথাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, মক্কা থেকে কেউ যদি মদীনায় কু-মতলবে আসে তাহলে চুক্তিবদ্ধ দলগুলোর কেউই তাকে আশ্রয় দিবে না আর তাদের সাথে কোন ধরনের চুক্তিও সম্পাদন করবে না। মদীনা বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে মদীনাবাসী সকলে সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু মুসলমানরা যদি মদীনার বাইরে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় বা মদীনার বাইরে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয় সেক্ষেত্রে মদীনার অমুসলিম গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য থাকবে না। ইহুদীদের পক্ষ থেকে পূর্বে সম্পাদিত সব চুক্তি বহাল থাকবে। মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম পালন করবে আর ইহুদীরা পালন করবে তাদের নিজ ধর্ম।

তিন দল এই চুক্তিতে সম্মত হবার পর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে মহানবী(সা.) মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে স্বীকৃত হন। কিন্তু এসত্ত্বেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম মানতে বা পালন করতে বাধ্য করা হয় নি। এখনই বলা হয়েছে, চুক্তিতে সবাইকে নিজ-নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে **'লিল ইয়াহুদে দীনুহুম ওয়া লিল মুসলিমীনা দীনুহুম'** ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম'। প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের এটি সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।
নবীজী(সা.)–এর এত স্পষ্ট শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও 'আইসিস' ও এর সমমনারা দাবি করে, শরীয়া আইন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার জন্য অবশ্য পালনীয় করা হবে। আশ্চর্য! মহানবী(সা.) নারীদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছিলেন। বলা হয়েছিল, কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বাড়ি থেকে অপসারণ করা যাবে না। যুদ্ধের সময়ও নিরস্ত্র নিরপরাধ নারীদের গায়ে হাত দেয়া যাবে না। তাহলে অমুসলিম নারীদের জোরপূর্বক নিজস্ব সম্পদ গণ্য করা বা রক্ষিতা বানানো– উগ্র-ধর্মান্ধদের এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড কীভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে? মদীনা সনদ অনুযায়ী, কাউকে কখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না বরং সবাই নিজ-নিজ বিশ্বাস মতে নিরাপদে জীবন কাটাবে। এমনকি এতে বলা হয়েছে ইহুদী এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোর প্রতি মুসলমানরা সৌহার্দ্যর ও ভালবাসার আচরণ করবে। মহানবী(সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম(রা.) জীবনভর এই চুক্তি মান্য করে গেছেন। যখনই এটি ভঙ্গ করা হয়েছে দুঃখজনকভাবে অ-মুসলমানদের পক্ষ থেকেই তা করা হয়েছে– যার দরুন আইনগত ব্যবস্থাও নবীজী(সা.)-কে নিতে হয়েছে। অতএব এটি ছিল প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা– যা মহানবী(সা.) নিজ জীবদ্দশায় দাঁড় করিয়ে গেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর একই নীতিতে রাজ্য পরিচালনা করেছেন মুসলমানদের চার খুলাফায়ে রাশেদীন(রা.)। ধর্মীয় উগ্রবাদীদের কল্পিত স্বর্গরাজ্যের সাথে নবীজী(সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মিল নেই।

ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে পবিত্র ইসলাম কারও বিরুদ্ধে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ সমর্থন করে না বরং ধর্মের সার্বজনীনতা স্মরণ করায়। পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে,**'ওয়া ইম্ মিন্ উম্মাতিন ইল্লা খালা ফীহা নাযীর'** *[সূরা ফাতের: ২৫]* আরও বলে, **'ওয়ালি কুল্লি কাওমিন হাদ'** *(সূরা রা'দ: ৮)*। অর্থাৎ, 'এমন কোন জাতি নেই যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী রসূল আসেন নি'। আরও বলে, 'প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক এসেছেন'। আল-কুরআনে মুসলমানদের একথা ঘোষণা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে: **'লা নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম্ মির্‌রুসুলিহি'–** অর্থাৎ, 'আমরা তাঁর প্রেরিত রসূলদেরকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করি না।' ইসলাম ধর্ম সবাইকে নিজের একান্ত আপন বলে দাবি করে। অন্যান্য নবী-রসূল যেসব বাণী নিজ-নিজ জাতি এবং গণ্ডিতে প্রচার করে গেছেন ইসলাম এরই পূর্ণাঙ্গীন রূপ। তাই ইসলাম সব নবী-রসূলকে সত্য বলে আখ্যায়িত করে এবং তাঁদের মৌলিক শিক্ষার সত্যায়ন করে। এই আন্তঃধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধন ইসলামের শিক্ষা এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য। অতএব এ ধর্মে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কোন সুযোগ নেই, থাকতেই পারে না।

আরও দেখুন, শিরক বা খোদা তা'লার অংশীবাদিতাকে কুরআন শরীফে সবচেয়ে গর্হিত আধ্যাত্মিক অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিরক ক্ষমা করা হবে না। এ সত্ত্বেও প্রতিমাপূজায় বাধা দিতে বলা হয় নি। বরং প্রতিমাকে গালি দিতে এবং সেগুলোকে অসম্মান করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে *(সূরা আনআম: ১০৮)*! যেক্ষেত্রে শিরকের বিষয়েও এত চমৎকার সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে অন্যান্য মতবিরোধের বেলায় তো অসহিষ্ণু হবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বড়ই আক্ষেপ, উগ্র-ধর্মান্ধদের জন্য। এরা যা করছে তার সাথে ইসলাম ধর্মের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই!

আইসিস একাধারে যুদ্ধবন্দিদের আটক করে যাচ্ছে। বন্দীদের একাংশকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করছে, আরেক অংশকে অমানবিক নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষছে। আরেকটি অংশকে তারা পণ্য হিসেবে বিক্রি করছে। এসব বর্বরতার ছবি ও তথ্য মিডিয়াতে ভরা। ইসলাম এ প্রসঙ্গে কী বলে?

একটু আগেই বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে যে আত্মরক্ষামূলক ধর্মযুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন তা কিন্তু সব ধর্মের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই দিয়েছেন, কেবল ইসলাম রক্ষার জন্য নয়। কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'লা যুদ্ধ-নীতিও বর্ণনা করেছেন। যেমন, সূরা বাকারার ১৯১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقٰتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقٰتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

তোমরা কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যারা প্রথমে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তোমরা সীমা অতিক্রম বা নির্দয় আচরণ করবে না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী ও অনাচারীদের ভালবাসেন না। সূরা নাহলের ১২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ۝

যুদ্ধের মাঝেও তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না। প্রতিশোধ কেবল ততটুকুই নেয়ার অনুমতি আছে যতটুকু তোমাদের সাথে

অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ধৈর্যধারণ করাটাই উত্তম। সূরা বাকারার ১৯৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

মুসলমানরা কেবল নৈরাজ্য দূর করার লক্ষ্যে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকল্পেই যুদ্ধ করবে। একবার এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেলে আর অত্যাচারী নিবৃত্ত হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা যাবে না। সূরা আনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, অত্যাচারীরা শান্তি চুক্তি তথা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি করে নিবে আর বিপক্ষ দলের দূরভিসন্ধির বিষয়ে প্রশ্ন তুলবে না। সূরা তওবার ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, মুশরিকেদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গ না হয়ে থাকলে এবং তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা পালিত না হয়ে থাকলে তাদের সাথে কৃত চুক্তিও পূর্ণ করবে। আর এটিকে খোদাভীরুতার জন্য আবশ্যক বলা হয়েছে। সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কোন জাতির শত্রুতাও যেন মুসলমানদেরকে অবিচার ও অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে। বরং সর্বাবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে। এটিই খোদাপ্রেম ও খোদাভীরুতার পরিচয়।

সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত রসূলের পক্ষেও যুদ্ধবন্দি আটক করা সমীচীন নয়। কেননা এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের স্থলে জাগতিক সুখ-সম্ভোগের প্রতি আকর্ষণ প্রতিভাত হবে। এই আয়াতটি স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া যুদ্ধবন্দি আটক করা নিষেধ। এর বিপরীতে বর্তমানে আমরা দেখছি এই তথাকথিত 'ইসলাম সেবকরা' অগণিত মানুষকে বিনা অপরাধে বন্দি বানাচ্ছে আর নারীদের বানাচ্ছে রক্ষিতা। সূরা মুহাম্মদের ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, যুদ্ধ শেষে যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করে দিতে হবে। এই রেহাই প্রদান মুক্তিপণ গ্রহণের পরও হতে পারে, আরও ভাল হয় যদি দয়াপরবশ হয়ে অনুগ্রহপূর্বক এই মুক্তি প্রদান করা হয়। দাসমুক্তির জন্য প্রয়োজনে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য কিস্তি নির্ধারণ করে দেয়ার বিধানও দেয়া হয়েছে আল কুরআনের সূরা নূরের ৩৪ নম্বর আয়াতে। এই বিধান নর ও নারী উভয় ধরনের আসামীর জন্য প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, সে যুগে রণক্ষেত্রে পুরুষদের রসদ সরবরাহ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য নারীরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারাও যুদ্ধবন্দি হয়ে যেত। তাদেরকেও তাড়াতাড়ি মুক্তি দেয়ার জন্য এই বিধান। কিন্তু কোনক্রমেই বন্দিদের কারও সাথে পাশবিক আচরণ করার অনুমতি নেই। সে যুগে প্রত্যেক যোদ্ধা যেহেতু নিজ-নিজ যুদ্ধ ব্যায় নির্বাহ করত তাই মুক্তিপণ গ্রহণের বিধানটি বলবৎ রাখা হয়েছিল।

এই হল, অতি সংক্ষেপে ইসলামের যুদ্ধ-নীতি। যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক এগুলোর সাথে উগ্র ধর্মান্ধদের আচরণ মিলিয়ে দেখলে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখতে পারবেন।

ইসলাম সর্বাবস্থায় দাসমুক্তির বিষয়টিকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে শিখিয়েছে। অথচ এই ধর্ম-সন্ত্রাসীরা করছে ঠিক এর উল্টো। ইসলাম এসেছিল মানবতার সম্মান প্রতিষ্ঠা করে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করতে। মহানবী(সা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাথে তা উৎখাত করার ব্যবস্থাও করে দেখিয়েছিলেন। আর এ যুগের স্বঘোষিত 'ধর্ম-রক্ষকরা' তা আবার ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। এদেরকে এক কথায় 'অন্ধকারের অধিবাসী'ই বলা যেতে পারে।

অবলা নারীদের প্রতি নির্যাতন 'বোকো হারাম' ও 'আইসিসের' একটি বিশেষ দিক। ইসলামের শিক্ষা হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'তার যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানোর প্রাক্কালে মহানবী(সা.) মুসলমানদের জন্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের স্থায়ী বিধি-নিষেধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন: **'তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কোন শিশু, কোন নারী বা অতিবৃদ্ধকে হত্যা করবে না। সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজকদের হত্যা করবে না। খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ কাটবে না। কোন ভবন ধ্বংস করবে না'** *(সীরাত বিশ্বকোষ: ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬ দ্র:)*। দেখা গেল, প্রকৃত ইসলামের সাথে এসব স্বঘোষিত 'ইসলাম সেবকদের' কোন মিল নেই।

পরিশেষে একটি মৌলিক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের অনেকের ধারণা, নাইজেরিয়াতে, মধ্যপ্রাচ্যে, আফগানিস্তানে অথবা পাকিস্তানে যা হচ্ছে আমাদের দেশে তা হবে না। কেননা আমাদের দেশ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আমরা নিরাপদ থাকব। –এটি আত্মপ্রসাদ বলে আখ্যায়িত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু একে আত্মঘাতী আত্মপ্রসাদ বলতে হবে। বিপদ দেখে উটপাখির মত মাথাটা বালির মধ্যে লুকালে কিন্তু রক্ষা পাওয়া যায় না। কেননা, 'তালেবানিত্ব' কোন জাতীয়তা বা কোন বিশেষ দেশের নাগরিকের নাম নয়। নির্দিষ্ট একটি সীমানায় আবদ্ধ কোন জীবেরও নাম নয়। এটি একটি বিকৃত মানসিকতার নাম। এটি যে কোন দেশে যে কোন সময় মাথাচাড়া দিতে পারে। তাই সময় থাকতেই পূর্ব-প্রস্তুতি আবশ্যক। উগ্র-ধর্মান্ধতা রোধকল্পে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দু'টি কাজ করতে হয়। প্রথমত, এদের অর্থের ও অস্ত্রের উৎসমূল ও সরবরাহ বন্ধ করা এবং দ্বিতীয়ত, এদের নেতাকর্মীদের দিকে অত্যন্ত কড়া ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। এ দু'টি পদক্ষেপও এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। বরং এর পাশাপাশি যুক্তি ও আদর্শের ভিত্তিতে উগ্র-ধর্মান্ধদের পরাজিত করাও আবশ্যক। নীতি ও আদর্শের লড়াইয়ে এদেরকে পরাস্ত করতে হবে। উগ্রবাদীরা যে ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পাশবিকতা চালাচ্ছে সেই ধর্মের উৎসমূল থেকে যদি তাদের অসারতা প্রমাণ করে দেয়া যায় তাহলে এরা নিশ্চয়ই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সমূলে উৎপাটিত হবে। এ ক'টি পদক্ষেপ সমন্বিত আকারে গ্রহণ করতে পারলে উগ্র-ধর্মান্ধদের খপ্পর থেকে আমরা সবাই রক্ষা পেতে পারব, ইনশা'ল্লাহ। কিন্তু এজন্য চাই ধৈর্য, আন্তরিকতা ও কঠোর অধ্যবসায়। যারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বা যারা একাজে অতি উৎসাহী তাদের জন্য মহানবী(সা.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ থেকে একটি সতর্কবাণী উল্লেখ করে আমার প্রবন্ধ শেষ করছি। তিনি বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

'হে মানবমণ্ডলী! সাবধান, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্বের জাতিগুলো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।' *(ইবনে মাজা, কিতাবুল মানাসিক, বাব কাদরু হাসরির রামি: ২য় খণ্ড, পৃ: ১০০৮, নম্বর ৩০২৯)*

আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে সুমতি দান করুন, আমীন।

উক্ত প্রবন্ধটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ আয়োজিত 'শান্তি সম্মেলন-২০১৪'-এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল যা ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাদিয়ানের সাতজন বাঙালি দরবেশ

মুহাম্মদ রাসেল সরকার

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছিল 'দাগে হিজরত'– অর্থাৎ হিজরতের চিহ্নাবলী। যদিও হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর যুগে এ ইলহামের তাৎপর্য পূর্ণরূপে বুঝা যায় নি তবে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির সময় এই ইলহামটির বিষয়বস্তু পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের ন্যায় কাদিয়ানে বসবাসকারী আহমদীরাও পাকিস্তানে হিজরত করেন। তবে হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.) ঐশী দিকনির্দেশনার আলোকে বদরী সাহাবীদের অনুরূপ ৩১৩ জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কাদিয়ানে থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। প্রথমে সকল আহমদীকে জিজ্ঞেস করা হয়, পবিত্র স্থানের হেফাযত এবং এর সামগ্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কারা নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছেন? আল্লাহ তা'লার ফযলে খোদা প্রেমিক আহমদীরা অকপটে নিজেদেরকে এর জন্য প্রস্তুত বলে সম্মতি জ্ঞাপন করে। হুযূর(রা.) এদের মধ্যে থেকে ৩১৩ জন দরবেশের প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.) এই সেবার জন্য কেবল কাদিয়ানে বসবাসকারী আহমদীদেরই সুযোগ দিয়েছিলেন এমন নয় বরং কাদিয়ানের বাইরে বসবাসকারী আহমদীদেরও এই সুযোগ দিয়েছিলেন। তখন কাদিয়ান সুরক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দু'মাস অন্তর-অন্তর অন্যান্য অঞ্চলের আহমদীরা আসবে এবং দু'মাস পরে যারা কাদিয়ানের বাইরে যেতে চায়, তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এই কর্মসূচির অধীনে কাদিয়ানের বাইরে থেকে মোট তিনটি কাফেলার আগমন ঘটে। প্রথম কাফেলায় আগমন করে ১০ জন, দ্বিতীয় কাফেলায় ১৫ জন এবং তৃতীয় কাফেলায় ৩৫ জন। এভাবে দরবেশ উপাধি প্রাপ্তদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৩ জনে।

১৯৪৭ সালের ১৬ই নভেম্বর কাদিয়ান থেকে সর্বশেষ হিজরতকারী কাফেলা চলে যাওয়ার পর এক নব যুগের সূচনা হয়, যাকে 'দওরে দরবেশ'– অর্থাৎ 'দরবেশদের যুগ' বলা হয়। দরবেশী যুগের সূচনাতে হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান জাট সাহেবের ওপর আমীরের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। আর এভাবে ৩১৩ জন সাহসী সৈনিক দৃঢ় সংকল্পের সাথে কাদিয়ানের সুরক্ষা, পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যতা রক্ষার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন। তারা এ-ও অঙ্গীকার করেন, আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম কুরবানী করে দিব, কিন্তু আহমদীয়াতের কেন্দ্রে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগতে দিব না। এরাই সেইসব লোক যাদেরকে খোদা তা'লা এই সিংহাসনের রক্ষক বা পাহারা দেয়ার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।

> "আমি স্বপ্নে এক ফিরিশ্‌তাকে একটি ছেলের আকৃতিতে দেখেছি, সে একটি বারান্দায় বসে ছিল। তাঁর হাতে একটি পবিত্র রুটি ছিল, যা ছিল খুবই উজ্জ্বল, তিনি সেই রুটি আমাকে দিলেন এবং বললেন, "ইয়ে নান তেরে অওর তেরে সাথ কে দরবেশোঁ কে লিয়ে হে"– অর্থাৎ এটা তোমার এবং তোমার অনুগামী দরবেশদের জন্য।"

কাদিয়ানকে সুরক্ষিত রাখতে সকল বয়সের মানুষই ছুটে এসেছিল। এদের মধ্যে যুবক ছিলেন ২২১ জন, মধ্যবয়সী ছিলেন ৫৭ জন এবং বৃদ্ধ বয়সের ছিলেন ৩৫ জন। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর এক স্বপ্ন অনুযায়ী দরবেশরা হলেন হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। তিনি(আ.) বলেন, "আমি স্বপ্নে এক ফেরেশ্‌তাকে একটি ছেলের আকৃতিতে দেখেছি, সে একটি বারান্দায় বসে ছিল। তাঁর হাতে একটি পবিত্র রুটি ছিল, যা ছিল খুবই উজ্জ্বল, তিনি সেই রুটি আমাকে দিলেন এবং বললেন, 'ইয়ে নান তেরে আওর তেরে সাথ কে দরবেশোঁ কে লিয়ে হে'– অর্থাৎ, এটা তোমার এবং তোমার অনুগামী দরবেশদের জন্য।" *(তাযকেরা পৃষ্ঠা: ১৮)*।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.) দরবেশদেরকে 'আসহাবে সুফফা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.) দরবেশদেরকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন– "আপনারা হচ্ছেন সেইসব ব্যক্তি যাদেরকে হাজার-হাজার বছর পর্যন্ত আহমদীয়াতের ইতিহাসে আনন্দ এবং গর্বের সাথে স্মরণ করা হবে এবং আপনাদের সন্তানদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং খোদা তা'লার কল্যাণের উত্তরাধিকারী করা হবে। কেননা খোদা তা'লার ফযল কোন কারণ ছাড়া কাউকে নির্বাচিত করে না।" *(আল ফুরকান, দরবেশানে কাদিয়ান সংখ্যা)*

আমরা বাঙালি। আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দ এবং গর্বের বিষয়, খোদা তা'লা আমাদেরকে কখনোই কোন নেয়ামত এবং সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি। এক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। কেননা ৩১৩ জন দরবেশের মধ্যে ১১৫ জন ছিলেন কাদিয়ানের বাইরের এলাকার। সেই ১১৫ জন দরবেশের মধ্যে আমাদের এই সুজলা-সুফলা সোনার বাংলার ছিলো সাত বাঙালি। কাদিয়ানে তাঁরা গিয়েছিলেন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশে। আর সেই উদ্দেশ্য পূরণে তারা ভর্তি হয়েছিলেন দেহাতী মোবাল্লেগীন কোর্সে। কিন্তু যখনই যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে কাদিয়ানের হেফাযতের ব্যাপারে আহ্বান আসল তখনই তারা নিজেদেরকে খলীফার ইচ্ছার কাছে সমর্পিত করে দেন। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের কুরবানী বাঙালি জাতিকে নিয়ে গেছে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে। তাঁরা রেখে গেছেন আমাদের সামনে অনুপম আদর্শ। বাঙালি জাতি তাদেরকে আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। লালন করবে তাদের গৌরবোজ্জ্বল সোনালী ইতিহাস।

সেই সাত বীর বাঙালি হলেন– ১. দরবেশ মওলানা মোহাম্মদ উমর আলী সাহেব, পিতা: বশীর উদ্দিন সাহেব, ২. দরবেশ মওলানা আব্দুল মোতালেব সাহেব, পিতা- দায়েমুল্লাহ সাহেব, ৩. দরবেশ মৌলভী উবায়দুর রহমান ফানী সাহেব, পিতা: হাফেজ আতাউর রহমান সাহেব, ৪.

দরবেশ মৌলভী তৈয়ব আলী সাহেব, পিতা: আব্দুল বারী সাহেব, ৫. দরবেশ মৌলভী মোহাম্মদ উসমান আলী সাহেব, পিতা: আব্বাস আলী সাহেব, ৬. দরবেশ মৌলভী আব্দুস সালাম সাহেব, পিতা: মোহাম্মদ কালু হাজী সাহেব, ৭. দরবেশ মোতাহার আলী সাহেব, পিতা: আকবর আলী সাহেব, । আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় তাদের সম্পর্কে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(১) দরবেশ মওলানা উমর আলী :
উমর আলী দরবেশ বাগিচার এক সুরভিত ফুল ছিলেন। তিনি ২০০৩ সালে নিজ জীবনীতে লিখেন, 'আমার নাম মোহাম্মদ উমর আলী দরবেশ, খাকসার

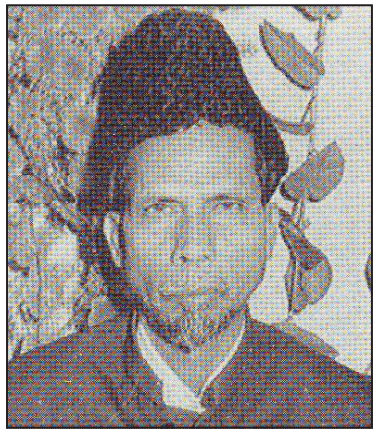

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘাটুরাতে জন্মগ্রহণ করি। তার স্ত্রী লিখেন, ১৯৪৭ সালে তাঁর বয়স ১৭ বছর ছিল।' সেই হিসেবে তিনি ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দরবেশ সাহেব লিখেন, 'আমাদের গ্রাম শহর থেকে দু'মাইল দূরে ছিল। ঐ গ্রামে মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। আমার নানী এবং মা সর্বপ্রথম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তারপর বাবা ও ভাইয়েরা বয়াত করেন। মওলানা এজাজ আহমদ সাহেব আমাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি আমাকে কাদিয়ান পাঠানোর জন্য মায়ের সাথে আলোচনা করতেন। অথচ আমি সেই সময় বাচ্চা ছিলাম। মৌসুমী ছুটিতে আমি কিছু ছেলের সাথে কাদিয়ান আসি।'

তাঁর স্ত্রী লিখেন, দরবেশ উমর আলী সাহেব হিন্দুস্থান বিভক্তির সময় 'মরকযে আহমদীয়াত' সুরক্ষার জন্য অবস্থান করে দরবেশ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। হিন্দুস্থান ভাগের পর পুনরায় মাদরাসা আহমদীয়া চালু হলে শিক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের তৌফিক হয়।

দরবেশী যুগে যাদের মসজিদে আকসা এবং মসজিদে মোবারকে দরস দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তিনি তাদের মধ্যে একজন। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় ফিকাহ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মাদরাসা আহমদীয়ায় শিক্ষকতা করার সুযোগ লাভ করেন। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ সিনিয়ার মোবাল্লেগ তাঁর ছাত্র। তাঁর প্রবন্ধ বদর পত্রিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে(রাহে.) তাঁকে শেষ বয়সে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার একজন আলেম হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে, তিনি ছাত্রদের সাথে স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁর সকল ছাত্রই এটি সাক্ষ্য দিবে, তিনি নম্র স্বভাবের, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। তিনি নামাযের বিষয়ে খুব যত্নবান ছিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) দরবেশ মওলানা আব্দুল মোতালেব :
তিনি বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার নাওঘাট গ্রামে আনুমানিক ১৯২৩/২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার নাম আব্দুল মোতালেব দরবেশ। আমার পিতার নাম মুন্সি দায়েমুল্লাহ সাহেব। মায়ের নাম খাতেবুন্নেসা। আমরা ছয় ভাই ও দুই বোন। আমার পিতা তাঁর বড় বোনের জন্য এক নেক পাত্রের সন্ধান করছিলেন। অবশেষে একজন পাত্রের সন্ধান পান। পাত্রটি স্বনামধন্য মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.) সাহেবের ছাত্র ও তাঁরই মাধ্যমে বয়াতকৃত আহমদী। পাত্রের নিবাস ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তাঁর নাম আব্দুর রহমান সরকার। তিনি একজন তহসীলদার ছিলেন। তাঁকে আমরা উপহাস করে বলতাম, কাদিয়ানী নেশা। আমাদের বাড়ির সকলে মাছীহাতা গ্রামের পীরের মুরিদ ছিলেন। তাকে সবাই কদমবুচি করতেন। আমার ভাইয়েরা তাকে অনেকবার কদমবুচি করেছিলেন। কিন্তু আমার ভাইদের চেষ্টা সত্ত্বেও আমি কখনই তা করি নি। তাই আজও আমি চিন্তা করি, কী কারণে সেই সময়ে আমি পীর সাহেবকে কদমবুচি করি নি।

যাহোক, আমার কাছে ভাদুঘরের মৌলভী আজিজ উদ্দিন সাহেবের দরস ও কুরআন পাঠ অতি মধুর লাগত। আমি তখন ১২/১৩ বছরের বালক এবং ঐ বছরেই– অর্থাৎ, ১৯৩৬ সনে মৌলভী সাহেবের মাধ্যমে বয়াত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করি।

১৯৩৭ সালে গ্রামের সকল বয়োজ্যেষ্ঠরা একজোট হয়ে আমার বড় ভাইয়ের নিকট এসে বলেন, আপনি যদি আমাদের সাথে থাকতে চান তাহলে আপনার ভাইকে ত্যাগ করুন আর যদি আপনার ভাইকে চান তাহলে আমাদের ত্যাগ করুন। এ সময় আমার পিতার মৃত্যুতে আমার ভাই-ই আমার অভিভাবক এবং আমাদের এলাকার প্রধান। ভাই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই তিনি আমাকে বললেন, এলাকার লোক এ প্রস্তাব রেখেছে। কাজেই তুমি তওবা কর। তাছাড়া তুমি তো আমাদের চেয়ে জ্ঞানী হও নি। আর তোমার বয়সও কম। বিষয়টি যদি ভাল হয় তবে আমরাও গ্রহণ করব। তখন

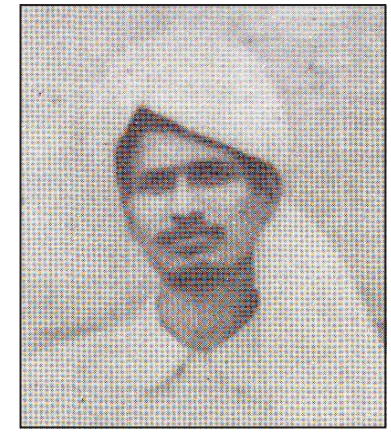

তুমিও তা গ্রহণ করতে পারবে। আমি বললাম, যা সত্য বলে জেনেছি তাই গ্রহণ করেছি আর ধর্মের ব্যাপারে ছোট-বড় প্রশ্ন নেই। আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন সে ছোট হলেও সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ সত্যের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইতিহাস-ই তার প্রমাণ যেমন হযরত আলী(রা.)। তখন তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন। অবশেষে আমার শেষ কথা ছিল, আপনি এলাকার সকলকে নিয়ে থাকুন এবং আমাকে ত্যাগ করুন। এই বলে আমি বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেলাম। এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জলসা হচ্ছিল। জলসায় গিয়ে আমার বিপদের কথা বললে সরাইলের অধিবাসী মীর সেকান্দর আলী সাহেব আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান এবং থাকা-খাওয়া, লেখাপড়াসহ যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজ কাঁধে তুলে নেন।

১৯৪৭ সালে আমি যখন নবম শ্রেণিতে পড়ি এমন সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.) দেহাতী মোবাল্লেগীনের জন্য তাহরীক করেন। আমি দেহাতী শব্দটিকে জেহাদী মনে করি আর জেহাদী মনে করেই দরখাস্ত পাঠাই এবং হুযূর(রা.) তা মঞ্জুরও করে দেন। কিন্তু চতুর্দিক হতে বাধা আসতে লাগলো, কমপক্ষে বি.এ. পাশ করে যাও। আমি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে দোয়া করতে

থাকি। এমনকি ইস্তেখারা পর্যন্ত শুরু করে দেই। আর ইস্তেখারার এক পর্যায়ে দেখতে পেলাম, মৌলভী এ এইচ এম আলী আনোয়ার সাহেব কাদিয়ানের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করলেন। এরপর সকল বাধা-বিঘ্ন ঠেলে ১৯৪৭ সালের ১৭ই মার্চ কাদিয়ান উপস্থিত হই। এখানে এসে জানতে পারি, জেহাদী নয় দেহাতী মোবাল্লেগীনের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। যাহোক, সকলের পরামর্শে মাদ্রাসা আহমদীয়াতে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সিদ্ধান্ত হল, ৩১৩ জন দরবেশ মরকয (কাদিয়ান) হেফাযতের জন্য থাকবে। অনেক কষ্টে হুযূরের অনুমতি পেয়ে মাদ্রাসা থেকে ছুটি নিয়ে রয়ে গেলাম। আমার দরবেশ নম্বর ৩৮ ছিল। মাদ্রাসা আহমদীয়া পুনরায় চালু হলে ট্রেনিং দেওয়ার পর ১৯৫০ সালে ডিসেম্বরে কাদিয়ান হতে কোলকাতায় প্রেরিত হই।

তৎকালীন মিশনারি ইনচার্জ-এর নির্দেশে জামা'তে আহমদীয়া ইব্রাহীমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ হিসেবে কার্য পরিচালনা আরম্ভ করি। এখানে অবস্থানকালে জামা'তের কয়েকজন মিলে আমাকে ইব্রাহীমপুর নিবাসী জনাব ইয়াকুব হোসেন সাহেবের প্রথম কন্যার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ফলে আমি তাতে রাজী হয়ে বিয়ে করে ফেলি। তারপর আমি বিভিন্ন স্থানে তবলীগের কাজ করতে থাকি। এর মধ্যে মহালন্দী, সুন্দরপুর, মমিনাবাদ, কয়থা, নবগ্রাম, বাজিতপুর প্রভৃতি অন্যতম। এভাবে বহু পুরোনো জামা'তগুলো ধীরে-ধীরে সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং জামা'তের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি হতে থাকে। কিছুদিন পর বাসড়া থেকে মৌলভী উবায়দুর রহমান ফানী ও মৌলভী উসমান আলী সাহেব ভরতপুরে একত্র হন এবং অনেকদিন পর্যন্ত আমরা তিনজন মোবাল্লেগ এ এলাকায় কাজ করেছি। হিন্দুদের বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা করে আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছিয়েছি।' তাঁর ছেলে মোকাররম সুলতান সালাহ উদ্দিন কবির, শিক্ষক, জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন, কাদিয়ান লিখেন– মৃত্যুর দিন– অর্থাৎ, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে আমার বাবা কাদিয়ানের সকল বন্ধুবর্গ ও অন্যান্য সদস্যগণের সাথে সাক্ষাৎ করে আসেন। রাতে তাঁর সামান্য কষ্ট হয় এবং তাহাজ্জুদের সময় তিনি তাঁর প্রকৃত প্রভুর সাথে মিলিত হন।

(৩) দরবেশ মৌলভী উবায়দুর রহমান ফানী :

চট্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পীর বংশে এই উজ্জ্বল নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি দরবেশ উপাধি লাভ করেন। কাদিয়ানে দেহাতী মোবাল্লেগীন কোর্স সম্পন্ন করার পর বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে ধর্মের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি নেক স্বভাব, সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং প্রখ্যাত ক্বারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর বংশে একাই আহমদী হয়েছিলেন। গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭২ সালে জলসা সালানায় অংশ নেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে কাদিয়ানে আসেন এবং তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অমৃতসর হাসপাতালে ভর্তি

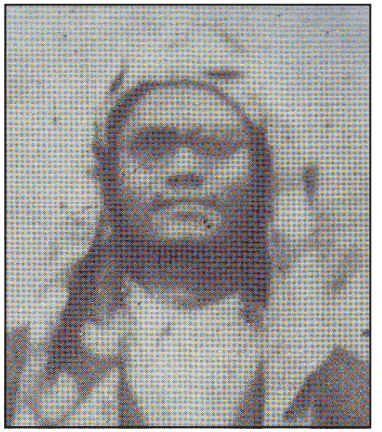

হন এবং সেখানেই ১৪ই এপ্রিল ১৯৭২ সালে তিনি পবিত্র প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর ওসীয়্যত নম্বর ১২৪৮২। *(সমস্ত তথ্য বেহেশ্‌তী মাকবেরায় তাঁর কতবায় সংরক্ষিত)*।

(৪) দরবেশ মৌলভী তৈয়ব আলী

তৈয়ব আলী দরবেশ ১৯২৮ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার প্রেমারচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাই ও এক বোন। তিনি মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এলাকায় আহমদীদের সাথে অ-আহমদীদের বহসের প্রেক্ষিতে জানতে পারলেন, এক ব্যক্তি ভারতের কাদিয়ান নামক গ্রামে ইমাম মাহদী হবার দাবি করেছেন। তারপর তিনি প্রাথমিক সত্যতা যাচাই-বাছাই করার পর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-ই এ যুগে খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। পরবর্তীতে তিনি ১৯৪৫ সালে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন।

বয়াতের পর তাঁর মনের অবস্থা একেবারেই বদলে যায়। পবিত্র ভূমি কাদিয়ান দর্শনের জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ানে যান। সেই দিনটি ছিল কাদিয়ান জলসার দ্বিতীয় দিন। সেখানে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী(আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্রের নূরানী চেহারা। প্রথম দেখাতেই মানুষটির প্রেমে পড়ে গেলেন। ধীরে-ধীরে কাদিয়ানের পবিত্র পরিবেশে পরম প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলেন।

তিনি বলেন, 'কাদিয়ান আসার পর দেশে ফিরে যাওয়ার চিন্তা আমার মনে বেশি হয় নি। এই স্থানের পরিবেশ এমন মোহনীয়– যার ফলশ্রুতিতে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পবিত্র ভূমির প্রতি এক হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়।' তবে ১৯৬২ সালে তিনি একবার দেশে

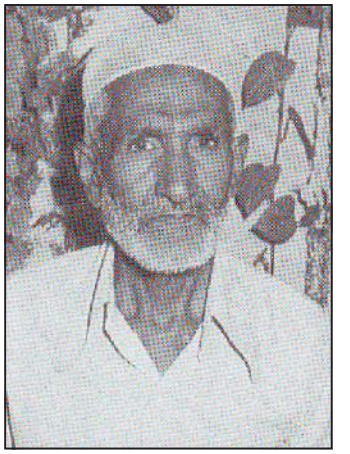

আসেন এবং দ্রুতই ফেরত চলে যান। ১৯৬২ সালে কেরেলা প্রদেশে এক তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে বিয়ে করেন।

হাঁটুর ব্যাথা ও অলৌকিক আরোগ্য লাভ:

হাঁটুর ব্যথায় তার এমন অবস্থা ছিল যে, দু'পায়ে ভর করে দাঁড়ানো সম্ভব হত না। বাধ্য হয়ে তিনি হুইল চেয়ারে বসেই অনেক কষ্টে ঘর থেকে বের হতেন। ব্যথা দূরীকরণের জন্য ডাক্তাররা অপারেশনের পরামর্শ দিলেন এবং সাথে এই অপারেশনের জন্য তিন লাখ টাকা খরচের কথাও বলেন। কিন্তু তিনি অপারেশন করান নি। তার ধারনা ছিল, অপারেশনের পর যদি তিনি চলাফেরা করতে না পারেন তাহলে তার কারণে জামা'তের এতগুলো টাকা নষ্ট হবে। তাই তিনি সকাতরে খোদা তা'লার দরবারে দোয়া করতে থাকেন।

এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) তাঁর গৃহে আগমন করেছেন এবং তাঁকে বেহেশতী মাকবারার কিছু গুল্মলতা খাইয়ে দিলেন। তারপর তিনি অলৌকিকভাবে ধীরে-ধীরে সুস্থ হতে থাকলেন। আমরা ২০১৩ সালে যখন জামেয়া আহমদীয়ার পক্ষ থেকে কাদিয়ানে গিয়েছিলাম তখন তাকে মসজিদে আকসাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি

খুবই সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বিনয়, নম্রতা, স্বল্পতুষ্টি তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম দিক। বাঙালি দরবেশদের মধ্যে কাদিয়ানে একমাত্র তিনিই এখনো জীবিত আছেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৮৭ বছর। আল্লাহ তা'লা তাঁকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু দান করুন, আমীন।

(৫) দরবেশ মৌলভী মোহাম্মদ উসমান আলী

দরবেশ মোহাম্মদ উসমান আলী সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন– "আমি ১৬ই মার্চ ১৯২৪ সনে ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর থানাধীন আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। বর্তমান নিবাস নারায়ণগঞ্জ শহরের তল্লায় (চেয়ারম্যান বাড়ী)। গ্রামে আমার নাম দরবেশ মোহাম্মদ উসমান আলী। বাল্যকালে আমার বাবা মারা যান। তখন আমি ও আমার মা ছাড়া কেউ ছিল না। আমার বয়সও খুব কম ছিল। উপার্জন করার মত কেউ ছিল না আর আমার পড়ালেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ-সুবিধার অভাবে পড়তে পারি নি।

তখন কারো সহযোগিতায় মাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসি। বকশী বাজার এসে জানতে পারলাম, এখানে একজন লোক আছেন যিনি গরীবের প্রতি দয়া দেখান কিন্তু পরে কাদিয়ানী বানিয়ে নেন। তাই তাদের নিকট কেউ যেতে চায় না। তখন কাদিয়ানী বা আহমদীয়াত সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। বিরোধীদের বাধা সত্ত্বেও একবার মাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাই। যাবার পর দুই ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাত করি। তাঁদের কথাবার্তা ও আচার ব্যবহারেই আকৃষ্ট হয়ে যাই। তাঁরা আমাদের ঘটনাসমূহ শুনার পর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুদিন পর আমাকে একটি স্কুলে ভর্তি করে দেন। তখন কাদিয়ান হতে মেহমান বা মোবাল্লেগগণ আসতেন, তাদের নিকট থেকেও আহমদীয়াত সম্পর্কে অনেকটা অবগত

হলাম। যার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি গরীবদেরকে সহায়তা করার মাধ্যমে আহমদী বানিয়ে নেন এই স্বনামধন্য ব্যক্তিটি আর কেউ নন তিনি হলেন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব। তখন তিনি ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন এবং প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর ছিলেন। এরই মধ্যে জনাব খান বাহাদুর সাহেব চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি সপরিবারে কাদিয়ানে যাবার পরিকল্পনা করেন, আর সেই সাথে আমাকে এবং আমার মা'কেও নিয়ে যাওয়ার মত পোষণ করেন। আমরা বললাম আপনি যখন ২/৩ মাস পর পুনরায় আসবেন তখন আমরা কাদিয়ানে যাব।

যাহোক, সেই অনুযায়ী আমরা কাদিয়ান যাই। কাদিয়ানের পবিত্র পরিবেশ ও সুশৃংখল ব্যবস্থা দেখে হৃদয়ের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন দেখা দেয়। খান সাহেব আমাকে মাদ্রাসায়ে আহমদীয়ায় ভর্তি করে দেন।

২/৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠে। তাই তাঁর অনুমতি নিয়ে আমরা দেশে চলে আসি। আসার সময় খান বাহাদুর সাহেব বলেন, যদি পুনরায় কাদিয়ান আসার ইচ্ছা হয় চলে এস। কিন্তু দেশে এসে যেন অন্ধকারে পড়লাম এবং কাজকর্মে কোন মন বসল না। এর মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন আবার কাদিয়ান যাবার জন্য মন ছটফট করতে লাগলো। সকল ঘটনা উল্লেখ করে একটি চিঠি পাঠালাম এবং সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে কাদিয়ান চলে গেলাম।

এবার সেখানে যাওয়ার পর ১৯৩৯ সালে হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়াত কবুল করার সৌভাগ্য হয়। এর কয়েক বছর পর দেশ বিভাগের আন্দোলন শুরু হয়। এরপর হুযূরের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করে জীবন উৎসর্গের কথা বললে হুযূর খুশি হয়ে দোয়া করেন এবং বাংলাদেশ থেকে কীভাবে আসলাম জিজ্ঞাসা করেন। আর একবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল হুযূর যখন

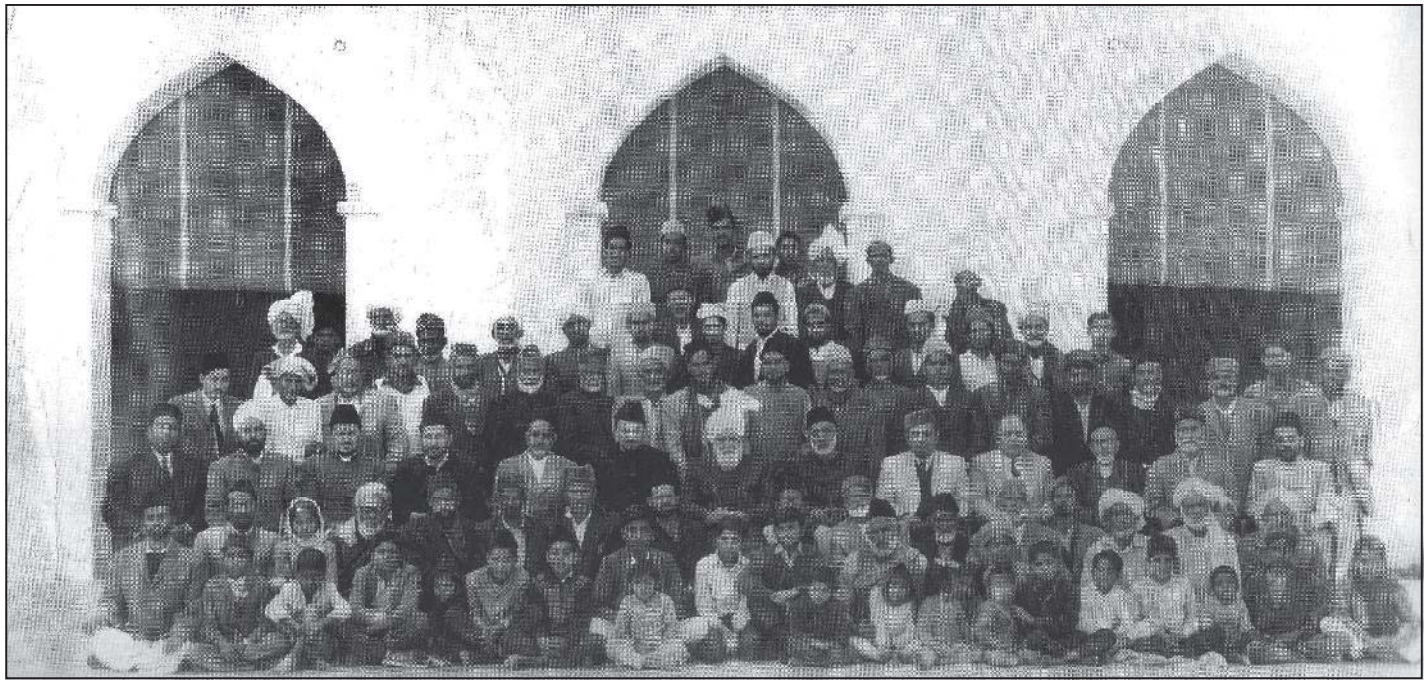

১৯৬৯ সালে রাবওয়ার জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রাহে.)-এর সাথে কাদিয়ানের দরবেশগণের গ্রুপ ছবি

মসজিদে মোবারকে মাগরিবের নামায শেষে মজলিসে এরফানে বসতেন তখন হুযূরের পবিত্র শরীর মালিশ ও স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এক শুক্রবার হুযূর তাহরীক করলেন, দেশের অভ্যন্তরে কিছু লোক জীবন উৎসর্গ করে তবলীগ ও তালীম-তরবিয়তের জন্য আত্মনিয়োগ করুন। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা সাতজন বাঙালি এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করি। চল্লিশ জন যুবক নিয়ে এই ক্লাস আরম্ভ হয় এবং এর মধ্যে দেশ বিভক্ত হয়ে যায়। হুযূর পূর্বেই অনুভব করতে পারলেন, দেশে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি হবে। দেশ বিভক্তির সাথে-সাথে শুরু হয় নির্যাতন ও মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করার পালা। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ(রা.) নির্দেশ দিলেন, আমাদেরকে কেন্দ্র ও পবিত্র স্থান সমূহ রক্ষা করতে হবে। এজন্য ৩১৩ জন দরবেশকে সেখানে থাকতে হবে। যদি মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর পবিত্র স্থানসমূহকে রক্ষা করতে জীবন দিতে হয় তবে এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা উপরোক্ত ৭ জন বাঙালি এই আহ্বানে জীবনদানে প্রস্তুত হই। ৩১৩ জন ছাড়া বাকী সবাই পাকিস্তান চলে যায়। হিন্দু ও শিখরা আমাদের পবিত্র স্থানসমূহ দখল করে নিতে অনেক চেষ্টা করেছিল। শিখরা আমাদের রাস্তায় বের হওয়া, হাট-বাজারে যাওয়া সবকিছুই বন্ধ করে দিয়েছে। আযান দেওয়ার সময় সমানে গুলিবর্ষন করেছে। তখন ডিউটি ছাড়া সবাই বেশির ভাগ সময় ইবাদত ও দোয়ায় মগ্ন থাকতেন। আমরা যাতাকলে গম ভাঙ্গিয়ে অথবা তা সিদ্ধ করে খেয়েছি। তারপরও আমরা মনোবল হারাই নি। কারণ আমাদের পিছনে আল্লাহর সাহায্য এবং প্রত্যেক আহমদীর দোয়া ছিল। সম্ভবত এসব ঘটনা হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর ইলহাম **'দাগে হিজরত' এবং 'ইয়ে নান তেরে অওর তেরে সাথকে দরবেশোঁ কে লিয়ে হে'** পূর্ণতার জন্যই ঘটেছিল।

হযরত আম্মাজান পাকিস্তান থেকে রুটি তৈরী করে পাঠান– যা তবারক হিসেবে প্রত্যেক দরবেশকে পরিবেশন করা হয়। আরো একটি ইলহাম ছিল, **'ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদ্‌দার'**– অর্থাৎ, তোমার চার দেয়ালের ভিতর যারা থাকবে আমি তাদের প্রত্যেককে রক্ষা করব। এই ইলহামের পূর্ণতা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। এদিকে আস্তে-আস্তে অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং আমাদের দু'ই বছরের দেহাতী মোবাল্লেগ কোর্স সম্পন্ন হয়।

স্থানীয় আমীর সাহেবযাদা হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের নির্দেশক্রমে আমরা যার-যার নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাই। আমরা তিনজন– খাকসার, আবদুল মোতালেব ও ওবায়দুর রহমান ফানী পশ্চিমবঙ্গে একসঙ্গে তবলীগ ও তালিম তরবিয়তের কাজ করতে থাকি। প্রথমে চব্বিশ পরগণার বাসরায় যাই এবং ওবায়দুর রহমান ফানীর সাথে সাক্ষাত করি। সেখান থেকে আসার পর ইনচার্জ মৌলভী সেলিম সাহেবের নির্দেশক্রমে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর যাবার সৌভাগ্য হয়। এখানে আব্দুল মোতালেবের সাথে পরামর্শ করে একটি স্কিম তৈরী করে কাছাকাছি জামা'ত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করি। বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের জামা'তসমূহে সফর করি। এক বছর এই খেদমত করার সুযোগ হয়। তারপর খাকসারকে ধর্মনগরে যাবার নির্দেশ দিলে, সেখানে যাবার সময় ঢাকা থেকে কিছু তবলীগি লিফলেট সংগ্রহ করে নিয়ে যাই। আর তবলীগ করার পর কিছু লিফলেট বিতরণ করি।

এ সমস্ত লিফলেট বিরুদ্ধবাদীদের নজরে পড়লে তারা আমাকে পাকিস্তানের গুপ্তচর মনে করল এবং সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মামলা দায়ের করল। আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দিল। আমি যখন হাজির হলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। এটা ভুল প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে পুলিশ হেফাজতে কারাবন্দী থাকতে হবে।

তখন জনাব খায়রুল বাসার উকিল তদবীর করে আমাকে জামিন (মুক্ত) করান। পুনরায় বিরুদ্ধবাদীদের উস্কানীতে জেল হাজতে প্রায় ৫/৬ মাস অসহনীয় নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার করে কারারুদ্ধ থাকতে হয়। ৬ মাস পর আমাকে যখন আদালতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন আমি এ ব্যাপারে আমার অবস্থান তুলে ধরি এবং আমি দৃঢ়তার সাথে বলি, আমাদের জামা'তের কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। আমাদের লক্ষ্য হল সেই স্বর্গস্থান প্রতিষ্ঠা করা– যা বড় বড় নবী-রসূল, ঋষি-মুনি, অবতারগণ স্থাপন করে গেছেন। জেলার সাহেব আমাদের জামা'ত সম্পর্কে আগে থেকেই অনেক কিছু জানতেন। আমাকে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা। তারপর আমার রিলিজ অর্ডার আসল। পরে আমি পশ্চিমবঙ্গে চলে যাই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাকে আনা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই বাধ্য হয়ে কেন্দ্রের অনুমতিক্রমে আমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসি এবং বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ শহরের তল্লা গ্রামে বসবাস করছি।"

এই আত্মনিবেদিত দরবেশ ২০১৩ সালের ৩ জুলাই তারিখে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(৬) দরবেশ মৌলভী আব্দুস সালাম সাহেব: ১৯১২ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার আলগীরচর গ্রামে দরবেশ আব্দুস সালাম সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মোহাম্মদ কালু হাজী। তিনি ১৯৪৪ সালে মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের তবলীগে তাঁর পরিবারের মধ্যে প্রথম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বয়াত গ্রহণ করার সাথে-সাথে তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা আরম্ভ হয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরা এক হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে ও তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তিনি তাঁর এলাকায় ও আশপাশে যারা সে সময়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতেন।

একদিন দরবেশ সাহেবের আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতায় তাঁর গ্রামের কিছু লোক তাঁকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় এবং দরবেশ সাহেবকে আহমদীয়াত ছেড়ে দিয়ে তওবা করার জন্য বলে। কিন্তু দরবেশ

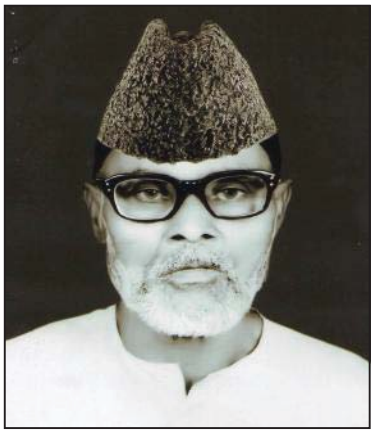

সাহেব বলেন, তিনি যে ইমাম মাহদী(আ.)-কে গ্রহণ করেছেন, তিনি সত্য এবং তাঁর জামা'ত সত্য। এ জামা'ত তিনি কখনই পরিত্যাগ করতে পারবেন না। এরপর বিরোধীরা খুবই ক্রোধান্বিত হয় এবং দেশীয় অস্ত্র, লাঠি-সোটা দেখিয়ে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। দরবেশ সাহেব এতেও কোন কর্ণপাত করেন নি। বরং তিনি শুধু দোয়ার সাথে আহমদীয়াতে অবিচল থাকার শপথ করেন।

বিরুদ্ধবাদীরা দরবেশ সাহেবকে আহমদীয়াত ছেড়ে দিলে কী কী সুবিধা পাবে এবং আহমদীয়াত ছেড়ে না দিলে কী

কী অসুবিধা হবে এসব পুনরায় তুলে ধরে। কিন্তু দরবেশ সাহেব তাদের কথায় নিশ্চুপ রইলেন এবং শুধু দোয়াই করতে থাকলেন। অত্যাচারীরা তাদের কথার কোন সাড়া না পেয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লাঠিসোঁটা দিয়ে আঘাত করতে থাকে। অত্যাচারীদের আঘাত যতই বাড়তে থাকে, তিনি উহ্-আহ্ না করে শুধু বলতেন, আল্লাহ্, আল্লাহ। পরে অন্যরা তাঁকে পার্শবর্তী গ্রামের সোনা মিয়া সাহেব নামক একজন নিষ্ঠাবান আহমদীর বাড়িতে নিয়ে যায়। সোনা মিয়া সাহেব দরবেশ সাহেবকে আশ্রয় দান করেন ও সেবা-যত্ন করতে থাকেন। তিনি সেই বাড়িতে প্রায় ছয় মাস অবস্থান করেন। এরপর সোনা মিয়া সাহেব ও এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট আহমদীরা ঢাকায় যোগাযোগ করেন। তাঁরা দরবেশ সাহেবকে ডেপুটি খলিলুর রহমান খাদেম সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন। ডেপুটি খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব নিজ খরচে দরবেশ সাহেবকে শিক্ষা লাভের জন্য কাদিয়ানে পাঠিয়ে দেন।

পরে দেশ বিভাগের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। হিন্দু ও শিখেরা মুসলমান গ্রামগুলো একের পর এক জ্বালিয়ে দিতে থাকে এবং নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করতে থাকে। তারা নগ্ন তরবারী নিয়ে পাঞ্জাবের প্রতিটি মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করে এবং অলি-গলিতে যেখানে মুসলমানদের দেখা পায় সেখানেই তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের এ অমানুষিক অত্যাচারে ভীত হয়ে মুসলমানরা দলে-দলেপাঞ্জাব ছাড়তে থাকে এবং পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে থাকে। এমন সময় দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ(রা.) ৩১৩ জন দরবেশ মনোনীত করেন। এর মধ্যে দরবেশ আব্দুস সালাম ছিলেন একজন। কাদিয়ানে শিখদের অত্যাচারের তীব্রতা দেখে রাত হলে দরবেশদের মনে হত, এটাই বুঝি তাঁদের শেষ রাত, আর দিন হলে বলত, এটাই বুঝি তাঁদের শেষ দিন। খাবারের প্রচন্ড সংকট ছিল। আটা পাওয়া যেত না । গম যাঁতা দিয়ে পিশে আটা করতে হত।

যাহোক, দরবেশরা খোদা তা'লার ওপর পরম আস্থা ও বিশ্বাস রেখে দিন কাটাতে থাকেন। দরবেশ আব্দুস সালাম সাহেব দীর্ঘ প্রায় আট বৎসর (১৯৪৪-১৯৫২) কাদিয়ানে অবস্থান করেন এবং কাদিয়ানে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে কাদিয়ানে গিয়েই ওসিয়্যত করেন। ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ(রা.)-এর অনুমতি নিয়ে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োজিত হন।

দরবেশ সাহেব ১৯৬১ সালে আহমদনগর, পঞ্চগড়ে যান এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১০ই জুলাই ১৯৮৭ সালে শুক্রবার রাত ১০.৩০ মিনিটে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দরবেশ আব্দুস সালাম সাহেব অত্যন্ত সহজ-সরল ও সদালাপী ছিলেন। তাঁর চেয়ে অনেক কম বয়সী ব্যক্তিদের সাথে তিনি সহজেই মিশে যেতে পারতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী ও অতিথিপরায়ণ। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে তাঁর কান্নাকাটি আশপাশের বাড়ি থেকেও শোনা যেত। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতেন। তিনি ছিলেন উর্দূ নযমে অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি ব্যাপক ভাবে উর্দূ নযম গাইতেন। তাঁর সাহচর্যে অনেক মানুষ সঠিক পথ লাভের প্রেরণা পেয়েছে এবং সঠিক পথ লাভে সফলও হয়েছে। মৃত্যুকালে দরবেশ আব্দুস সালাম সাহেব স্ত্রীসহ এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে যান। তাঁর স্ত্রী সাফিয়া বেগম ২০০৪ সালে পরলোক গমন করেন।

(৭) দরবেশ মোতাহার আলী :

দরবেশ সাহেব নিজে বলেন, "আমি মোহাম্মদ মোতাহার আলী, পিতা: আকবর আলী মন্ডল, গ্রাম- দিগদাইড়, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া। আমার জন্ম ১৯২৭ সনে। আমি জন্মগতভাবে একজন আহমদী। আমার চাচা হলেন খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী।

আমার চাচা জার্মানি থেকে ফিরে আসার পর আমার বাবা আহমদীয়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আমি ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর আমার চাচা মৌলভী মোবারক আলী খান সাহেবের সঙ্গে সম্ভবত ১৯৪৬ সালে কাদিয়ানে যাই। সেখানে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দরবেশী জীবনযাপন করি। ১৯৫৬ সালে কাদিয়ান থেকে নিজ গ্রাম দিগদাইড়ে ফিরে আসি। ১৯৫৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। মায়ের সেবার জন্য বাড়িতে অবস্থান করি। আল্লাহ তা'লার ফযলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আহমদীয়াতের

আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।"

আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে এসব পুণ্যবান ব্যক্তিত্বের আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের সর্বোত্তম সেবা করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) has refuted the greatest allegation leveled against Ahmadiyyat

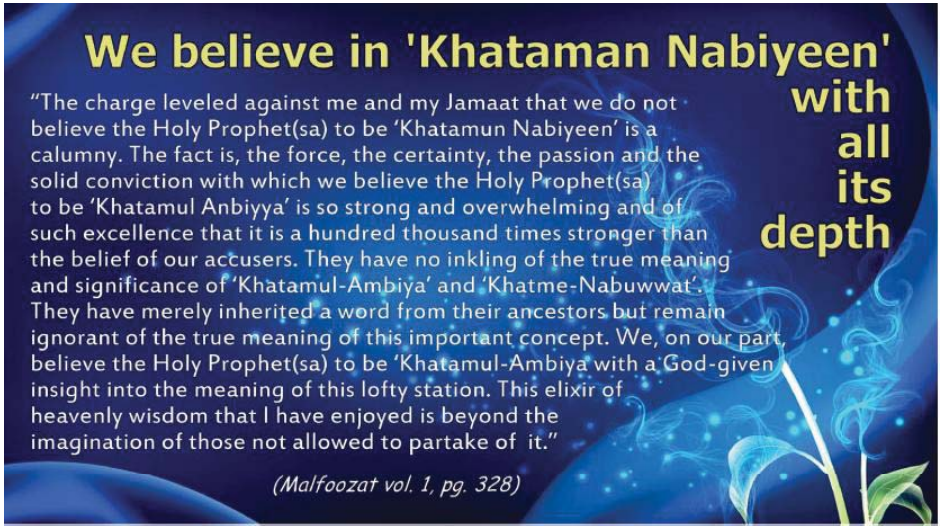

গাজী ওমর ফারুক-এর স্বহস্তে লিখিত অমর প্রেমের কাব্য

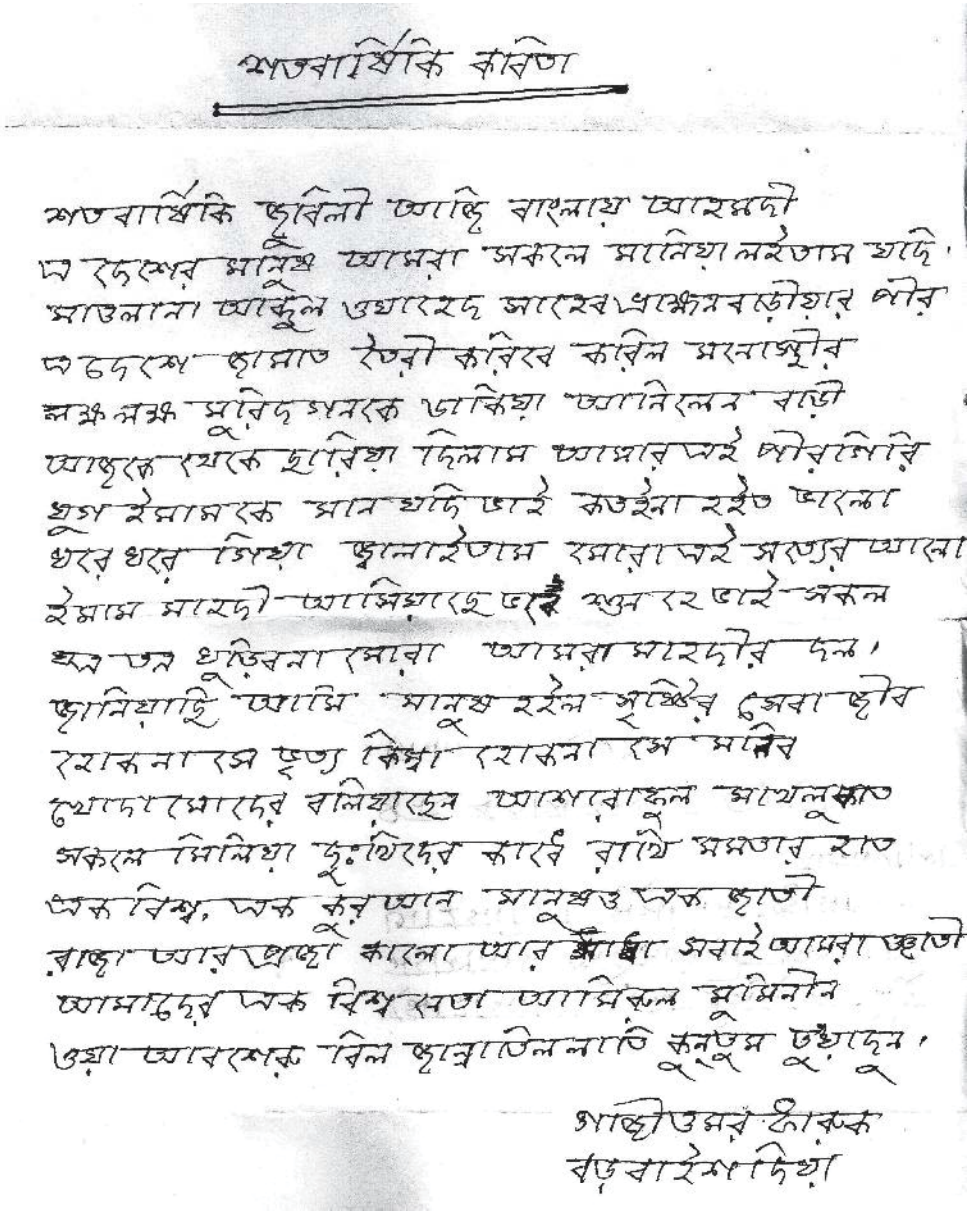

শতবার্ষিকি কবিতা

শতবার্ষিকি জুবিলী আজি বাংলায় আহমদী
এ দেশের মানুষ আমরা সকলে মানিয়া লইতাম যদি।
মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পীর
এ দেশে জামাত তৈরী করিবে করিল মনোস্থির
লক্ষ লক্ষ মুরিদগনকে ডাকিয়া আনিলেন বাড়ী
আজকে থেকে ছাড়িয়া দিলাম আমার এই পীরগিরি
যুগ ইমামকে মান যদি তাই কতইনা হইত ভালো
ঘরে ঘরে গিয়া জ্বালাইতাম মোরা এই সত্যের আলো
ইমাম মাহদী আসিয়াছে তাই শুন হে ভাই সকল
এর তরে ছাড়িবনা মোরা আমরা মাহদীর দল।
জানিয়াছি আমি মানুষ হইল সৃষ্টির সেরা জীব
হোকনা সে ভৃত্য কিম্বা হোকনা সে মনিব
খোদা মোদের বলিয়াছেন আশরাফুল মাখলুকাত
সকলে মিলিয়া দুঃখিদের কাছে রাখি মমতার হাত
এক বিশ্ব, এক কুরআন মানুষও এক জাতি
রাজা আর প্রজা কালো আর ধলা সবাই আমরা জ্ঞাতি
আমাদের এক বিশ্ব নেতা আমিরুল মুমিনীন
ওয়া আখেরু বিল জান্নাতিল্লাতি কুনতুম তুআদূন।

গাজীওমর ফারুক
বড়বাইশদিয়া

গাজী ওমর ফারুক সাহেব খুলনা বোমা হামলায় ১৯৯৯ সনে আহত হন। তাঁর হাতের একটি আঙ্গুল উড়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্বাসনালীতে একটি স্প্রিন্টার নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। খাদ্যাহারের সময় প্রতিটি গ্রাসে তাঁর বিষম লাগত। তিনি সুদীর্ঘ ১৪ বছর অত্যন্ত ধৈর্য, স্বর্গীয় আনন্দ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে জীবন কাটিয়ে গত ২০১৩ সনে মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের ইজতেমা শেষে বাড়ি ফেরার সময় পরলোকগমন করেন *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)*। তিনি তাঁর নিজ বাড়ি বড় বাইশদিয়ায় সমাহিত হন। তাঁর মৃত্যুর আগে শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর রচিত এবং তাঁর স্বহস্তে লিখিত কবিতাটি আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেটি তাঁর জন্য দোয়ার আবেদনসহ হুবহু ছাপিয়ে দেয়া হল।

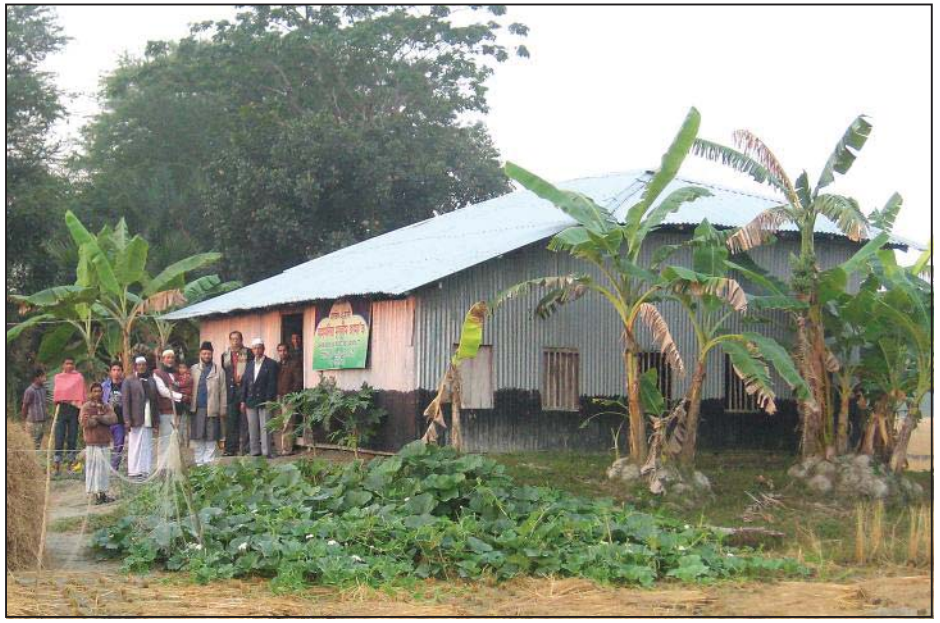

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে গাজী ওমর ফারুক

পুরুলিয়া জামা'তের গোড়ার কথা

মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম

সুন্দর, সুজলা-সুফলা, সোনালী ফসল আর সবুজ বৃক্ষ, তরু-লতায় ঘেরা প্রকৃতির এক অপরূপ চারণভূমির নাম পুরুলিয়া। গ্রামটি এখনও স্নিগ্ধ ধবল জ্যোৎস্নায় নান্দনিকতায় ভরিয়ে দেয় রঙ-বেরঙের ফুলের সৌরভ। অপরূপ সাজে সজ্জিত এ গ্রামটি বনলতা সেনের নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানার চলনবিলের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। গ্রামটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৯ ভাগ হানাফী মতাবলম্বী মুসলমান। পুরুলিয়ার দক্ষিণে মহারাজপুর গ্রামের মুসলিম সম্প্রায়ের ৯৯ ভাগ আবার আহলে হাদীস (যাদেরকে অনেকে ওহাবীও বলে থাকে) মতবাদে বিশ্বাসী। মহারাজপুর গ্রামের মরহুম শামসুর রহমান সরকারের বড় পুত্র 'মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সরকার "হানাফী আর ওহাবী আলেমগণের মাঝে বিদ্যমান ফতোয়াবাজী আর ঝগড়া-বিবাদে বিরক্ত হয়ে ষাটের দশকে দীক্ষা নিয়েছিলেন ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টধর্মে। ত্রিত্ববাদে দীক্ষিত হয়ে তিনি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। তাই খ্রিস্টান থাকা অবস্থাতেই গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যায়ন করতে থাকেন আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআন, আর রসূলে করীম(সা.)-এর হাদীসের গ্রন্থাবলী। তাতে তিনি দেখতে পেলেন, পবিত্র কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে- হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে কায়েম হবে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত। আর এ খিলাফত বিদ্যমান থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। খলীফার কাজ হবে ইসলাম ধর্মের আদর্শ বিকাশ ও প্রচার-প্রসার। এর ফলে পৃথিবীর ও এর একমাত্র ধর্ম হবে ইসলাম আর ইমাম হবেন হযরত মুহাম্মদ(সা.)। ইসলামের তিহাত্তর ফেরকার মাঝে কেবল নাজাতপ্রাপ্ত ফেরকা হবে হযরত ইমাম মাহদী(আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'ত।

১৯৭২ সনে তিনি তাঁর কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে সৌভাগ্যক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের প্রকাশিত 'পাক্ষিক আহমদী'র একটি পাতা হাতে পান। যাতে লেখা ছিল,'হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর অমৃতবাণী। তিনি বলেছেন, আমি গভীর মনোযোগের সাথে লেখাটি পাঠ করলাম। আর বারবার এ পাতায় ছাপানো হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)-এর ছবিটি দেখতে থাকলাম। 'হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)-এর চেহারা মোবারক দেখার পর আমার হৃদয়ে প্রশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করে।' আমি বিস্তারিত জানার জন্য পাক্ষিক আহ্‌মদীর (আঞ্জুমানে আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪ নম্বর বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১) ঠিকানায় পত্র লিখলাম। উত্তরে জানানো হল, 'আপনি আঞ্জুমানে আহমদীয়া, তেবাড়িয়া, নাটোর-এ কর্মরত মোয়াল্লেম জনাব মৌলভী নুরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করুন। পত্র পেয়ে জনাব নুরুল ইসলাম সরকার এবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললেন ঐশী নূরের অনুসন্ধানে মৌলভী নুরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের নিকট। নাটোরের তেবাড়িয়া জামা'তে কর্মরত মোয়াল্লেম মৌলভী নুরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে অবশেষে ১৯৭৪ সনের প্রথম দিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ(রাহে.)-এর হাতে বয়াত করে নুরুল ইসলাম সাহেব ইসলামের নাজাতপ্রাপ্ত ফেরকা আহমদীয়তের পতাকাতলে আশ্রয়গ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। তিনি যখন তাঁর পরিবার ও গ্রামবাসীদের নিকট হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর আগমনের সংবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন, তখন শুরু হল চরম বিরোধিতা। বিরোধিতার একপর্যায়ে গ্রামবাসী নাটোরের প্রসিদ্ধ আলেম মহারাজপুর গ্রামের অধিবাসী মওলানা দারজিছুর রহমান সাহেবের সাথে বহস করতে নুরুল ইসলাম সাহেবকে বাধ্য করলেন। শত শত মানুষের উপস্থিতিতে খোলা মাঠে বহসের আয়োজন করা হল। বহসের ময়দানে নুরুল ইসলাম সরকার সাহেব হযরত ঈসা(আ.)-এর মৃত্যুর সপক্ষে পবিত্র কুরআন থেকে একের পর এক আয়াত পেশ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। মওলানা দারজিছুর রহমান সাহেব জনাব নুরুল ইসলাম সাহেবের মোকাবেলায় হযরত ঈসা(আ.)-এর আকাশে জীবিত থাকার সপক্ষে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত উপস্থাপন করতে না পেরে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'বহসের আলোচ্য বিষয় সর্ম্পকে পবিত্র কুরআন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষে'। সুতরাং পবিত্র কুরআন যেখানে আমি সেখানে। আমি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)-কে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হিসাবে গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হচ্ছি। যারা সত্যের পূজারী তারা আমার সাথে বয়াত করতে পারেন। মওলানা সাহেবের সাথে জনাব নুরুল ইসলাম সরকারের ভ্রাতাগণসহ প্রায় ৫০-৬০ জন ওহাবী ফেরকার সদস্য-সদস্যা বয়াত করে হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর পতাকা তলে আশ্রয়গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন, আলহামদুলিল্লাহ্! নবদীক্ষিত আহমদীগণ মহারাজপুর ভিটাপাড়া নুরুল ইসলাম সরকার সাহেবের বাড়ির সামনে মসজিদ নির্মাণ করে জামা'ত ও নিজস্ব সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এ সংবাদ বিশেষ করে মওলানা দারজিছুর রহমান সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের বিষয়টি কয়েক দিনেই গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। আরম্ভ হল নবদীক্ষিত আহমদীগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন। যা সহ্য করতে না পেরে অনেকেই আবার ওহাবী ফেরকায় ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। বাকী রইলেন শুধু জনাব নুরুল ইসলাম সরকার, মওলানা দারজিছুর রহমান আর লোকমান হোসেন মুন্সি। মওলানা সাহেব বার্ধক্যের কারণে মহারাজপুর হতে ১৫ মাইল দূরে তেবাড়িয়া জামা'তে গিয়ে জুমুআ'র নামায আদায়ে অক্ষমতার দরুন সমাজ-জামা'ত ছেড়ে অনেকটা নির্জন জীবনযাপন আরম্ভ করলেন। নুরুল ইসলাম সরকার আর লোকমান হোসেন মুন্সি গোপনে গোপনে তবলীগের কাজ চালাতে এবং সাধ্যমত তেবাড়িয়া জামা'তের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব বলেছেন,"এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমার ঘরের দরজার সামনে দু'টি ফুটন্ত গোলাপ ফুল গাছ। গাছ দুইটির একটি আমি উঠিয়ে মহারাজপুর-পুরুলিয়ার বিল অতিক্রম করে পাঁচপুরুলিয়া গ্রামের শেষ প্রান্তে রোপন করলাম।" দীর্ঘ কয়েক বছর চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর দোয়ার মাধ্যমে পুরুলিয়া স্কুলের শিক্ষক জনাব আবুল কালাম আজাদ, পিতা মোহাম্মদ ফয়জুদ্দিন ১৯-১০-১৯৭৭ তারিখে খলীফাতুল মসীহ সালেস(রাহে.)-এর যুগে বয়াতের মাধ্যমে

খিলাফতে আহমদীয়ার পতাকাতলে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এবার দু'জনে সম্মিলিতভাবে আহমদীয়াত প্রচার-প্রসারের কাজে রত হলেন।

আবার শুরু হল বিরোধিতা। এরই এক পর্যায়ে পুরুলিয়া স্কুল মাঠে ওহাবী আর হানাফী আলেমদের সাথে ওফাতে ঈসা আর হায়াতে ঈসা(আ.) বিষয়ে তেবাড়িয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে কর্মরত মোয়াল্লেম মৌলভী আবু তাহের আহমদ সাহেবের বাহাস অনুষ্ঠিত হল। বহসে আহমদী বিদ্বেষী আলেমগণ শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন। বিষয়টি এলাকাতে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। এর ফলে পাঁচপুরুলিয়া গ্রামের শেষ প্রান্তের অধিবাসী চিশতিয়া তরিকাপন্থি পীর জনাব হাসান আলী দেওয়ান ও তাঁর ছোট ভাই জনাব ইয়াসিন আলী দেওয়ানের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য ১৫ জানুয়ারি, ১৯৮৩ তারিখে হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-র হাতে বয়াত গ্রহণের মহাসৌভাগ্য অর্জন করেন। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের বয়াতের সাথে সাথে রমযানের প্রথম শুক্রবার জনাব আবুল কালাম আজাদ সাহেবকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পুরুলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁরা অ-আহমদী সমাজ ও তরিকা পরিত্যাগ করে হাসান আলী দেওয়ান সাহেবের বৈঠকখানাতে জুমুআ'সহ পাঁচ ওয়াক্ত আযান দিয়ে নামায আদায় করা শুরু করেন। রমযানের প্রথম শুক্রবারেরই জনাব ইয়াসিন আলী দেওয়ান সাহেবের মাধ্যমে আমার নিকট 'আহমদীয়াতের পয়গাম' নামক বইটি আসে। আমি বইটি ৪/৫ বার পাঠ করে রমযানের দ্বিতীয় শুক্রবার ডোবারপাড়া জামে মসজিদে নিয়ে পুনরায় পাঠ করে আগত মুসল্লিদের শোনাতে থাকার অপরাধে মসজিদের ইমাম মওলানা নুরুল ইসলাম আমাকে কাফের ফতোয়া দিয়ে মসজিদ থেকে জোরপূর্বক বের করে দেন। আমি এ কাফের ফতোয়ার যোগ-বিয়োগ মিলাতে না পেরে বিষয়টি আমার আব্বা মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলামকে (যিনি অবৈতনিকভাবে ডোবরপাড়া জামে মসজিদে দীর্ঘকাল ইমামতি করেছেন) বলি। আমার কথা শ্রবণ করা মাত্রই আব্বা মওলানা নুরুল ইসলাম সাহেবের বাড়িতে ছুটে যান এবং তার কাছে আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার কারণ জানতে চান। মওলানা নুরুল ইসলাম সাহেবের উত্তরে সন্তুষ্ট না হতে পেরে ফিরে এসে পুরুলিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল কালাম সাহেবের মাধ্যমে মৌলভী আবু তাহের সাহেবকে তেবাড়িয়া হতে ডেকে এনে আমার দাদা মোহাম্মদ মোবারক আলী শিকদারসহ পরিবারের ১৫জন সদস্য-সদস্যা নিয়ে বায়াত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! বয়াতের পরেই আব্বা বললেন, এখন আর বৈঠকখানা নয় জুমুআ'র নামায আদায় করব মসজিদে। এরপর তিনি মসজিদের জন্য জমি দান করেন। পরের শুক্রবার ওয়াকফ্কৃত জমিতে এক বান টিন দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করে জুমুআ'র নামায আদায়ের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পুরুলিয়া প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহর ফযলে সেই একবাণ্ডিল টিনের মসজিদ এখন সেমিপাকা মসজিদে পরিণত হয়েছে এবং পুরুলিয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর কেন্দ্রের আন্তরিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহারাজপুর, মেরীগাছা ও নাজিরপুর নামে তিনটি জামা'ত। দিন দিন এ অঞ্চলে আহমদীয়াত আরও উন্নতি করবে ইনশা'ল্লাহ। সবার কাছে দোয়ার আবেদন।

মহানবী(সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী(আ.) মুহাম্মদ(সা.)-এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:

'আমরা যখন পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে তাকাই তখন সমস্ত নবুওতের ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে বেশি সাহসী এবং সবচেয়ে জীবন্ত আর আল্লাহ তা'লার অতি প্রিয় নবী হিসেবে কেবল একজনকেই দেখতে পাই। অর্থাৎ তিনিই যিনি হলেন, সমস্ত নবীর নেতা এবং সমস্ত রসূলের গৌরব, সব প্রেরিতদের মাথার মুকুট। যাঁর নাম হল, মুহাম্মদ মোস্তফা ও আহমদ মুজতবা(সা.)- যাঁর আনুগত্যে দশ দিন কাটালে এমন অসাধারণ জ্যোতি লাভ হয় যা ইতোপূর্বে হাজার বছরেও লাভ করা যেত না।

(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন দ্বাদশ খণ্ড, পৃ: ৮২)

এক নিষ্ঠাবান আহমদী জনাব ইউনুস রহিম সাহেব

জনাব ইউনুস রহিম (মে'মান)
জন্ম-১৯১৩, মৃত্যু-১৯৯৬ খ্রি.

গুজরাতের বিখ্যাত কাচ্ছি মে'মান বংশের জনাব ইউনুস রহিম (মে'মান) ১৯৫৩ সালে ইমাম মাহদী(আ)-কে মান্য করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে অবস্থানকালে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জামা'তের বিভিন্ন পদে থেকে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি মসজিদে আযান দেয়ার জন্য এবং জামাতী সভাগুলোতে নযম পড়ার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে 'আসীরে রাহে মাওলা' হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি একজন মূসী ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিনগুলো আহমদীয়াতের কেন্দ্র রাবওয়ায় অতিবাহিত করেন। তিনি রাবওয়ার বেহেশতি মাকবারায় সমাহিত হন। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন রইল।

দোয়াপ্রার্থী
মরহুমের সন্তান
সিদ্দিক রহিম ও মিসেস সুলতানা শওকত

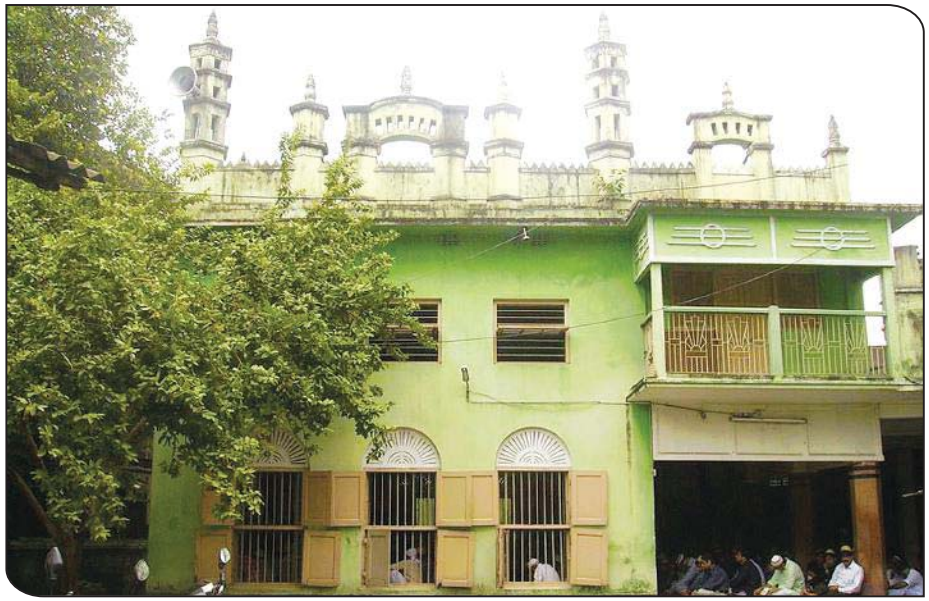

আহমদীয়া জামে মসজিদ, নিউ পার্ক স্ট্রীট, কোলকাতা, ভারত
Ahamadiyya Mosque, New Park Street, Kolkata, India

নারারভিটা মসজিদ, অভয়পুরী, আসাম, ভারত
Nararvita Mosque, Circle Avayapuri, Assam, India

২০০৮ সালে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর স্বেচ্ছাশ্রম শেষে কোলকাতা খোদ্দামদের একটি দল (Kolkata Khuddam after Khilafat Centenary Waqar-e-Amal)

বিথারি আহমদীয়া মসজিদ, ২৪ পরগনা

আহমদীয়া মসজিদ নূর, শিলিগুড়ি

আহমদীয়া মসজিদ রাজখণ্ড

কবিরা আহমদীয়া মসজিদ, ডায়মণ্ড হারবার

একই বৃন্তের দু'টি ফুল...

ভরতপুর আহমদীয়া চিকিৎসা কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয়

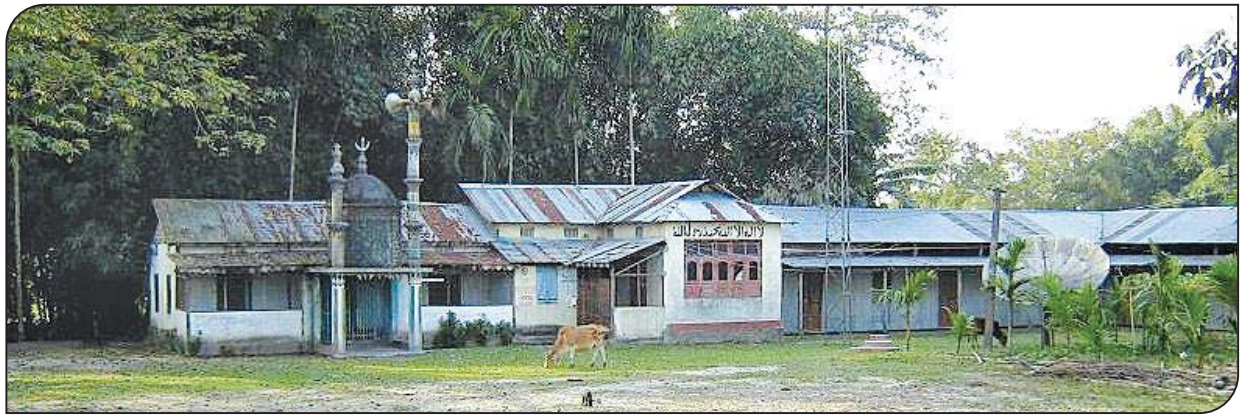

তাপাজুলি আহমদিয়া মসজিদ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, আসাম

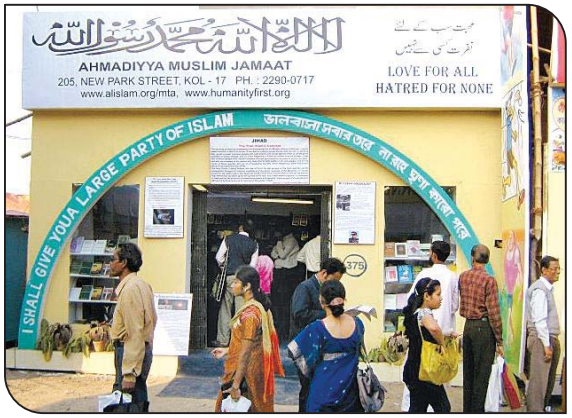

কোলকাতা বই মেলায় আহমদীয়া স্টল

আলোর দিশারী

(জনাব মির্যা আলী আখন্দ স্মরণে)

আমাতুল শাফী জাকিয়া

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পন করেছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনেক খোদাপ্রেমিক, ধর্মের অকৃত্রিম সেবক তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম ও দোয়ার মাধ্যমে এই জামা'তকে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছাতে সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন। এমন পুণ্যবান ব্যক্তিদের জীবনের অনেক ঘটনা এখনও আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করতে এবং ধর্মের পথে কুরবানী করতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। তেমনি এক খোদাপ্রেমিকের জীবনের কিছু কথা এখানে তুলে ধরছি– যা আমাদের সেসব গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেবে।

মির্যা আলী আখন্দ সাহেব ১৯১৬ সালে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার বেতাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ আহমদী। বাল্যকাল থেকেই তিনি অনেক মেধাবী ছিলেন, সেই সাথে ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। যার ফলে তিনি তৎকালীন মাসিক ৬/- টাকা হারে সম্মানী বৃত্তি লাভ করতেন। সে সময় তিন-চার টাকাতেই সারা মাসের খরচ চলে যেত। ১৯৩৫ সালে তিনি যখন মেট্রিক পরীক্ষার্থী তখন তাঁর পিতা মুসলিম আখন্দ সাহেব পরলোক গমন করেন। পিতার অসুস্থতা ও মৃত্যুর কারণে দুই তিন মাস তিনি পড়াশুনা করতে পারেন নি। তারপরও খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। ১৯৪১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। সত্যপিপাসু মির্যা আলী আখন্দ সাহেব ছাত্রকাল থেকেই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। মনোহরদী থানার লাখপুর শিমুলিয়া হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন তিনি আহমদীয়া (লাহোরী) জামা'তের ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি লাইট' পড়ার সুযোগ পান। সেখানেই তিনি হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর আগমনের সুসংবাদ লাভ করেন। এ ব্যাপারে অধিকতর জানার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ঘটনাক্রমে তখন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী (ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস) তাদের স্কুল পরিদর্শনে যান। খান সাহেবের শান্ত, সৌম্য এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব দেখে মির্যা আলী আখন্দ সাহেব অত্যন্ত অভিভূত হন।

যাহোক, এ ঘটনার কিছুদিন পর এক ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচারমূলক একটি বিজ্ঞাপন পান। আহসানউল্লাহ চৌধুরী সাহেব (ফুড ইন্সপেক্টর) এসব প্রচারপত্র বিলি করতেন। আহমদীয়াতের সন্ধানে মির্যা আলী আখন্দ তখন পাগলপ্রায়। এমতাবস্থায় বাড়ি আসার পর তাঁর এক মামাতো ভাই আবদুল লতিফ তাঁকে জানান, বীরপাইকশার সোনা মিঞা কাদিয়ানী হয়ে গেছে! এ কথা শোনামাত্র তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে পড়েন। তাদের গ্রামের অনেক মানুষ লাউন্দিয়ার পীরের মুরিদ ছিল। তারা বলল, লাউন্দিয়া পীরের ওরশে যাবার পথেই সোনা মিঞা কাদিয়ানীর বাড়ি। এ কথা শুনে তরুণ মির্যা আলী আখন্দ তাদের সাথে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু সেদিন সোনা মিঞাকে পাওয়া গেল না। জানা গেল তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি শিমুলিয়ায় চলে গেছেন। সোনা মিঞা সাহেবের বাড়িতে একটি মসজিদ ছিল। সেই মসজিদে একজন বৃদ্ধ লোককে দেখতে পেয়ে মির্যা আলী আখন্দ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, সোনা মিঞা সাহেব কি এখন নামায পড়ে? বৃদ্ধ উত্তরে বলল, সে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নামায পড়ে। সোনা মিঞা

মির্যা আলী আখন্দ

সাহেবের সাথে দেখা করতে না পারার দুঃখ নিয়ে মির্যা সাহেব বাড়ি ফিরে এলেন।

কিন্তু সত্যের সন্ধানে তিনি আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। তাঁর অনুসন্ধানী মন তাঁকে আবার সোনা মিঞা সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল। যার ফলশ্রুতিতে তিনি কিছুদিন পর আবার তাঁর সাথে দেখা করতে রওনা হন। তিনি সোনা মিঞা সাহেবের এলাকায় পৌঁছে তাঁর সম্বন্ধে কোন বড় মানুষদের কাছে জিজ্ঞেস না করে ছোটদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। কেননা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন সোনা মিঞা সাহেব এখন সামাজিক বয়কটের মধ্যে আছেন। কিন্তু বিধিবাম! এবার তিনি শুনতে পেলেন সোনামিঞা সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেছেন। সম্ভবত ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসা হচ্ছিল। এর কিছুদিন পর আবার তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন কিন্তু এবারও সোনা মিঞা সাহেব তাঁর কোন আত্মীয়ের বাড়ি ছিলেন। এবার মির্যা সাহেবকে দেখে তার বাড়ির কাজের ছেলে বলল, পার্শ্ববর্তী বানিয়া গ্রামের সৈয়দ আলী হাজীও কাদিয়ানী হয়ে গেছে। আপনি তাঁর সাথে দেখা করেন। তখন মির্যা আলী আখন্দ আহমদীয়াতের সন্ধানে এতটাই উন্মুখ ছিলেন, সাথে-সাথে তিনি হাজী সৈয়দ আলীর সাথে দেখা করেন। হাজী সাহেব তাকে বললেন, আমরা শুক্রবার ইনশা'ল্লাহ জুমুআ'র নামায শেষে আপনাদের বাড়িতে যাব। সোনা মিঞা ও হাজী সৈয়দ আলী সাহেব যখন তাঁর বাসায় গেলেন তখন তাঁর বাবা খুবই অসুস্থ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর পিতা তাদেরকে খুবই আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন এবং খুবই আন্তরিকতার সাথে আতিথেয়তা করেন। মির্যা সাহেবের আর তর সইছিল না। তিনি বয়াতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে সোনা মিঞা সাহেব তাঁকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে তাঁকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে বয়াত করতে বলেন। আর এভাবেই সোনা মিঞা সাহেবের বাড়িতে ১৯৩৫ সালে বয়াত গ্রহণ করে মির্যা আলী আখন্দ সাহেব আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বয়াত গ্রহণ করার পর মির্যা আলী আখন্দ সাহেব সত্যের প্রচার সকলের মাঝে

পৌঁছে দেয়ার প্রেরণায় নিজেকে এই মহতী কাজে নিয়োজিত করেন। চতুর্দিকে বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র বিলি করতে থাকেন। প্রেমারচরের মৌলভী আবু মূসা ফজলুল করিমের ঠিকানায় ঢাকা থেকে জামা'তের বইপত্র আনার ব্যবস্থা করেন। জনাব ফজলুল করিম সাহেব সূরা ফাতিহার তফসীর পাঠ করে তাঁর মাকে (মৌলভী তালেব শেখের বোন) বলতেন, মা! আব্বা যে বলতেন, ইমাম মাহদী(আ.) আগমন করবেন, তিনি তো এসে গেছেন– এ কথা সত্য।

তখন পাকুন্দিয়ার মির্যা আলী নামক একজন বড় মওলানা তালেব হোসেন সাহেবের বাড়িতে আসেন। তাকে যখন বলা হল, আপনি কি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সাথে বহস (বিতর্ক) করতে পারবেন? তিনি দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'দূর থেকে তাঁকে সালাম জানাই, তাঁর সাথে বহস করে এমন আলেম এই পূর্বাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে।' আবু মূসা ফজলুল করিম সাহেব মওলানা তালেব হোসেন সাহেবকে হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বললেন, হিন্দুস্থানের আলেমরা তো তাঁকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে। তখন আবু মূসা ফজলুল করিম সাহেব তালেব হোসেন সাহেবকে বললেন, আপনি শরীয়তের একজন বিদগ্ধ আলেম, আপনাকে হয় তাকে গ্রহণ করতে হবে, না হয় তাঁর(আ.) দাবি খণ্ডন করতে হবে। তখন মওলানা তালেব হোসেন বললেন, আপনি আমাকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর জীবনী সংক্রান্ত কোন বই দিন। তার কথা শুনে মির্যা আলী আখন্দ সাহেব বৃষ্টিতে ভিজে বাজিতপুর যান। সেখানে সাব-রেজিস্ট্রার আবুল হোসেন সাহেব এবং পাশের গ্রামের কেনু মিঞা (আবদুল জব্বার) সাহেব আহমদী ছিলেন। তিনি তাঁদের উভয়ের কাছ থেকে ইমাম মাহদী(আ.)-এর লেখা 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকসহ আরও কিছু বই নিলেন এবং এ সমস্ত বই-পুস্তক তালেব হোসেন সাহেবকে দিয়ে তাঁকে দোয়া এবং মনোযোগের সাথে এগুলো অধ্যায়ন করতে অনুরোধ করেন। ঐশী জামা'তের ঐশী নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবু তালেব হোসেন দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর বই পাঠ করে আমার জ্ঞান চল্লিশগুণ বেড়ে গেছে, এখন আমি এই যুগের মৌলভীদের চল্লিশটায় এক হালি মনে করি। এরপর তিনি প্রকাশ্যে আহমদী হবার ঘোষণা দিলেন। এলাকার লোকজন এসে বলল, হুযূর! আপনি আমাদেরকেও সাথে নিয়ে যান। তিনি জবাব দিলেন, 'বেহেশত আমাকে ডাকছে, তোমাদের জন্য কি আমি বসে থাকতে পারি?'

তখন এলাকার লোকজন বলল, আমরা দুই পক্ষের মধ্যে একটা বহস দেখতে চাই। এ এলাকায় আহমদী এবং অ-আহমদীদের মধ্যে বহস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম বহসে সব মৌলভীরা একপাশে বসল এবং অপরপাশে মওলানা তালেব হোসেন, সোনা মিঞা সাহেব, এ.এইচ.এম. আলী আনোয়ার সাহেব এবং ঢাকা থেকে আগত আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব বসলেন। হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর পর নবী আসতে পারে কি না সেই প্রশ্নে বহস শুরু হল। আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব বললেন, আগে প্রমাণ করতে হবে ঈসা(আ.) জীবিত আছেন নাকি মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি ঈসা(আ.) জীবিত থাকেন তাহলে হযরত মির্যা সাহেব(আ.)-এর দাবি মিথ্যা। এ কথা শুনে বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা বলতে লাগল, ঈসা(আ.) জীবিত না মৃত তা আমরা জানতে চাই না। হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর পর কোন নবী আসতে পারে কি না আমরা তা জানতে চাই। যাহোক, বহস শুরু হল। আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে আয়াত পাঠ করে হযরত ঈসা(আ.)-এর মৃত্যু হয়েছে বলে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে থাকলেন। হঠাৎ সেই গ্রামের আসমত আলী সরকার নামক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হল এর মধ্যে আপনাকে আপনার বক্তব্য শেষ করতে হবে। এ কথা শুনে জনতার মাঝে কলরব শুরু হল, আহমদী আলেমকে কেন বেশি সময় দেয়া হবে না? এটা তো ন্যায়বিচার নয়। আর এভাবে সেদিনের মত বহস ভেঙ্গে যায়।

জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন দেখুন। চেয়ারম্যান আসমত আলী সরকার কিছুদিনের মাথায় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। স্থানীয় এল.এম.এফ. ডাক্তার রোগী মৃত্যুবরণ করলে ডাক্তার দায়ী নয়-এই মুচলেকা গ্রহণ করে তার অপারেশন করলেন। কিন্তু অপারেশনের পর আসমত আলী চেয়ারম্যান মারা যান। এই ঘটনা উক্ত বহসের দুই বছরের মধ্যে ঘটেছে বলে আমার পিতা মির্যা আলী আখন্দ সাহেব আমাকে জানিয়েছেন।

মির্যা আলী আখন্দ সাহেব তাঁর তবলীগি অভিজ্ঞতা নিয়ে সব সময় গল্প করতেন। দ্বিতীয় বহসের সময় অ-আহমদীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবকে সাথে নিয়ে আসে। তিনি আহমদীদের বলেন, আমি তো বহস করতে আসি নি, ওয়াজ করতে এসেছি। তখন স্থানীয় প্রভাবশালী আহমদীরা বলেন, যদি বহস করতে না আসেন তাহলে আপনি আপনার ওয়াজে ইমাম মাহদী(আ.)-এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারবেন না। কিন্তু পরবর্তীতে অ-আহমদীদের চাপে মৌলভী সাহেব বহসে রাজি হন। আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব যখন পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ নম্বর আয়াত **'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসুল...'** তেলওয়াত করলেন এবং মওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ করলেন, দয়া করে আপনি এ আয়াতের অর্থ করুন তখন তিনি বললেন, এর অর্থ করার দরকার কী? তখন উপস্থিত লোকজন গো ধরে বলল, কেন অর্থ করবেন না? এ-ও নিয়ে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা পাট খেত দিয়ে পালিয়ে যায়।

চাকুরিসূত্রে জনাব মির্যা আলী আখন্দ সাহেব সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি সর্বদা তবলীগে ব্যস্ত থাকতেন এবং জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে হোমিও চিকিৎসা করতেন। দোয়া ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সাথী। আল্লাহ তা'লার ফযলে অনেক লোক তাঁর তবলীগে বয়াত করে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করেছে। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও তবলীগের ফলে বেশ কয়েকটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৪৩ সনের কথা। তিনি থানা সার্কেল ইনস্পেক্টর (জুট)-এর চাকুরি নিয়ে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর-এর নকীপুরে গমন করেন। তখন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী। নকীপুর-শ্যামনগর হিন্দু প্রধান এলাকা। হিন্দুদের সামনে বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তিরাও চেয়ারে বসতেন না। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য ইউনিয়ন ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। মির্যা সাহেব এতে মুসলমানদের কিছু-কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী অগ্রাধিকার প্রদান করেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন মহলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু সততা, নিষ্ঠা এবং সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ এসব অভিযোগ কখনোই তাঁর চাকুরী জীবনে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নি।

মুসলমানদের প্রতি তাঁর এরূপ সহানুভূতিশীল আচরণ দেখে অনেক বিশিষ্ট মুসলমানরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

যতীন্দ্রনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব শামসুর রহমান সাহেব। তিনি প্রায় ৮/৯ মাইল দূর থেকে এসে মির্যা আলী সাহেবের সাথে দেখা করতেন। মির্যা আলী

সাহেব চেয়ারম্যান সাহেবকে আহমদীয়াতের দাওয়াত দেন।

এছাড়া সুফী সাকিম উদ্দীন (ভেটখালী নিবাসী) নামক আরও এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি আদালতে চাকুরি করতেন। মির্যা সাহেব তাঁকেও আহমদীয়াতের সংবাদ দিলেন। এ দু'জন ব্যক্তি আহমদীয়াত বুঝার জন্য, ভালভাবে জানার জন্য অসংখ্যবার মির্যা আলী সাহেবের ঢাকেশ্বরীর বাসায় এসেছিলেন। ১৯৬২ সালে শামসুর রহমান সাহেব রাবওয়ায় গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করার মাধ্যমে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। সূফী সাকিম উদ্দীন সাহেবের পূর্বেই বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় জামা'ত সুন্দরবনের সূচনা এমনিভাবে হয়েছিল।

মির্যা আলী আখন্দ সাহেবের সততার একটি উদাহরণ: মির্যা সাহেব কীরূপ সৎ, নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত ছিলেন নিম্নের ঘটনাটি থেকে আশা করি আমরা সকলে বুঝতে পারব। তিনি যেহেতু খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন সেজন্য গরীব-দুঃখী, অসহায়দের জন্য সরকারী ত্রাণ হিসাবে অনেক কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল, দুধ-চিনি আসত। একদিন জনাব শামসুর রহমান সাহেব ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে মির্যা আলী আখন্দ সাহেবের সাথে দেখা করতে আসেন। কথাবার্তায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে মির্যা সাহেব তাঁদের চা খাওয়ানোর জন্য কাজের ছেলেকে দুধ-চিনি আনতে দোকানে পাঠান। উপস্থিত মেহমানরা অবাক হয়ে বললেন, আপনার কাছে এত দুধ-চিনি মওজুদ থাকতে সামান্য দুধ-চিনি আনতে দোকানে পাঠাচ্ছেন? মির্যা আলী সাহেব তাঁদের উত্তরে বললেন, এ সব দুধ-চিনি গরীব-দুঃখীদের জন্য। এগুলো আমি কখনও স্পর্শও করতে পারি না। তাঁর কথা শুনে উপস্থিত মেহমানরা খুবই বিস্মিত হন। তাঁরা ভাবতে থাকেন, এ যুগেও এমন সৎ, নিষ্ঠাবান মানুষ হয়! পরবর্তীতে এদের অনেকে সততায় মুগ্ধ হয়ে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তের ঐশী ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে জনাব মির্যা আলী সাহেব সার্কেল অফিসার উন্নয়ন (জুট) হিসেবে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জে বদলি হন। তখন রিলিফের দুধ ও কাপড় তাঁর মাধ্যমে বিতরণ করা হত। ইউনিয়ন খাদ্য কমিটির মাধ্যমে এই কাজ করা হত। ভাতগাঁও-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর বীরগঞ্জের বাসায় আসা-যাওয়া করতেন। এই কাজে তিনি মাঝে মধ্যে ঠাকুরগাঁও মহকুমা সদরেও সফর করতেন। সেখানে তিনি তৎকালীন বিখ্যাত বামপন্থি নেতা হাজী দানেশ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে তবলীগ করে 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-সহ আরও কিছু বই প্রদান করেন। এক পর্যায়ে বৃটিশ সরকার ট্যাংক উন্নয়ন বিভাগ গঠন করলে মির্যা আলী সাহেবকে ট্যাংক উন্নয়ন বিভাগের ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হয়। সমগ্র দিনাজপুর জেলা তাঁর অধীনে ছিল। তিনি দিনাজপুরে বাসা নিয়ে থাকতেন এবং বীরগঞ্জে সাইকেল দিয়ে যাওয়া-আসা করতেন।

একদিন যাত্রাপথে হঠাৎ বৃষ্টি নামে। তিনি ভাতগাঁও-এর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান-এর বাসায় চলে যান। সেখানে ফজলুর রহমান নামক এক যুবক তাঁর সেবা-যত্ন করেন। এই যুবক কথা প্রসঙ্গে বলল, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম মাহদী না আসেন। মির্যা আলী সাহেব তখন ফজলুর রহমান সাহেবকে ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ দেন। ফেরার পথে তিনি ফজলুর রহমানকে তাঁর সাথে দিনাজপুরের বাসায় নিয়ে আসেন। তাঁকে সাত দিন পর্যন্ত মির্যা আলী আখন্দ সাহেব নিজের বাসায় রেখে তবলীগ করতে থাকেন। খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব তখন দিনাজপুরের এস.ডি.ও. ছিলেন। তিনিও মির্যা আলী সাহেবের বাসায় আসতেন। তাঁর সাথে সোহাগীর পণ্ডিত আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরীও আসতেন। মনে হয় সবকিছু মিলিয়ে তবলীগের এক বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে থেকে অনেকে বয়াত গ্রহণ করে এই পরম সত্যকে মেনে নেয়।

সে সময় ভাতগাঁও এলাকার একজন বুযুর্গ মহিলা এবং গাজিউর রহমান নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইমাম মাহদী(আ.)-এর আগমন সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখেন। সেই বুযুর্গ মহিলা স্বপ্ন দেখেন, উত্তর-পশ্চিম আকাশ আলোকিত করে হযরত ইমাম মাহদী(আ.) আবির্ভূত হয়েছেন, সারা এলাকা জুড়ে যেন সাজ সাজ রব সৃষ্টি হয়েছে।' গাজিউর রহমান স্বপ্নে দেখেন, 'হযরত ইমাম মাহদী(আ.) যেন ঘোড়ায় চড়ে তাঁর দরজায় হাজির হয়েছেন।' তখন খান সাহেব মোবারক আলী বাংলার আমীর ছিলেন। যখন তিনি এ সমস্ত কথা জানতে পারলেন তখন তিনি মওলানা মুহিবুল্লাহ্ সাহেবকে ভাতগাঁও প্রেরণ করেন। তাঁর তবলীগে ভাতগাঁও-এর আশেপাশের অনেক লোক বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়াতে দাখিল হন। মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবও দিনাজপুর আসেন। মির্যা আলী সাহেব তাঁকে নিয়ে ভাতগাঁও যান। বাজারে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এক ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। মওলানা এজাজ আহমদ সাহেবের মনোমুগ্ধকর বক্তৃতায় লোকজন বিমোহিত হয়ে যায়। তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। তাঁর তবলীগেও সেখানে অনেক লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর এমনিভাবে ১৯৪৫-১৯৪৮ সালের মাঝে ভাতগাঁও জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রথম বীজ মির্যা আলী আখন্দ সাহেব রোপন করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

পাকিস্তান হবার পর তিনি এ.জি. অফিসে চাকুরিতে যোগ দেন। এস.এস. পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি একাউন্ট অফিসার পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং কুমিল্লায় বদলি হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য সরকারী যে বাসা ছিল সেখানে তিনি বসবাস করতেন। তিনি যেদিন কুমিল্লায় আসেন সেই সময় ছিল ১৯৬৩ সাল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীয়া জলসা চলাকালীন অনুষ্ঠানে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ চালায়। এতে দুইজন শাহাদাত বরণ করেন এবং অনেকে গুরুতর আহত হন।

তখন কুমিল্লার নন্দনপুরে কিছু আহমদী ছিলেন। মির্যা আলী সাহেব কুমিল্লায় আগমনের পর থেকে তাঁর বাসাতেই জুমুআ'র নামায হত। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এ বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। এক পর্যায়ে মামলাটি কুমিল্লায় স্থানান্তরিত হয়। তখন জামা'তের অনেক বড়-বড় আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কুমিল্লায় আসতেন। তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, মওলানা এজাজ আহমদ সাহেব, এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব, আহমদ তৌফিক চৌধুরী প্রমুখ অন্যতম। আল্লাহ তা'লা মির্যা আলী সাহেব এবং তাঁর পরিবারকে এ সমস্ত মেহমানদের সেবা করার অনেক সুযোগ দিয়েছেন।

মির্যা আলী আখন্দ সাহেব খুবই সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তবলীগ ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সাথী আর মানবসেবা ছিল তাঁর নেশা। তিনি ছিলেন একজন প্রাণবন্ত লেখক, নির্মল স্বভাবের কবি। আহমদীয়াতের সেবায় নিজের দেহ-মন উজাড় করে খেদমত করাকে খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ মনে করতেন। ইসলামের এই মহান সেবক ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬ সনে ইহধাম ত্যাগ করে তাঁর প্রিয় প্রভুর সকাশে মিলিত হন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর সমুজ্জ্বল কুরবানীর স্পৃহাকে ধারণ করে সম্মুখে পথ চলার তৌফিক দান করুন (আমীন)।

স্মৃতিতে ময়মনসিংহ জামা'ত

আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী

আজ ২০১৪, দীর্ঘ বায়ান্ন বছর হল ময়মনসিংহের সাথে আমার সম্পর্ক। আমার জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার বীরগাঁও-এ আমার নানার বাড়িতে, আর জীবনের প্রথম কয়েক বছর নিজ গ্রাম সেলবরষে কাটলেও এই ময়মনসিংহেই কেটেছে আমার শৈশবের বড় অংশ, বাল্যকাল, কৈশোর আর যৌবনের প্রথম দিক। জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে আমার ময়মনসিংহে। তাই একে ঘিরে অনেক স্মৃতি, অনেক কথা। আজ এখানে আমি আমার স্মৃতিতে ময়মনসিংহ জামা'ত নিয়ে কিছু কথা বলব।

১৯৬২ সালে ২৭ শে অক্টোবর আমরা সপরিবারে সেলবরষ থেকে ময়মনসিংহে চলে আসি বসবাস করার জন্য। আমরা যখন ময়মনসিংহ এলাম তখন আমাদের মসজিদ ছিল না বিধায় শহরের নওমহল এলাকায় অবস্থিত চৌধুরী আব্দুল ওয়াহেদ পণ্ডিত সাহেবের বাসায় জুমুআ'র নামায আদায় করা হত। পণ্ডিত সাহেবের মূল বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ এলাকায়। তিনি হলেন বর্তমানে বগুড়া নিবাসী নূর আহমদ প্রিন্স-এর দাদা। সে সময় পণ্ডিত সাহেব, তাঁর ছেলেরা, আমি আর আব্বা ছাড়া আর কে-কে নামাযে আসতেন তা আমার স্মরণে নেই। তবে সংখ্যা এর চেয়ে খুব বেশি ছিল না।

এর কিছুদিন পর জুমুআ'র নামাযের স্থান শহরের বাউণ্ডারী রোডস্থ জনাব আবুল হোসেন সাহেবের বাসা 'আহমদীয়া কটেজ'-এ স্থানান্তরিত হয়। আবুল হোসেন সাহেব যদিও ইন্সপেক্টর অব রেজিস্ট্রার্স হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন তথাপি তিনি আবুল হোসেন সাব-রেজিস্ট্রার সাহেব নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের সাবেক ন্যাশন্যাল সেক্রেটারি উমুরে 'আমা জনাব আহমদ জহুর হোসেন সাহেবের পিতা এবং জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া সাহেবের শ্বশুর। তিনি আমার পিতামহের (দাদা) বয়সী ছিলেন, তাই তাঁকে আমরা ভাই-বোনরা দাদা বলেই ডাকতাম। মরহুম আবুল হোসেন সাহেব আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু ছিলেন, তাঁরা এক সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের যুদ্ধের সময়ের আর কবি নজরুলের অনেক গল্প-কাহিনীও শুনাতেন। আমরা খুব আগ্রহভরে সেসব শুনতাম।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ময়মনসিংহ জামা'তের আরও যারা সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে ভেটেরিনারী শিক্ষক জনাব বদিউজ্জামান ভুঁইয়া সাহেব (মরহুম মেজর ডা. আসাদুজ্জামান সাহেবের পিতা, বর্তমানে চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্য আরিফুজ্জামান পাপলুর দাদা এবং ড. মোজাহেদ উদ্দিন সাহেবের শ্বশুর), শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা মরহুম জিনাত আলী ভুঁইয়া সাহেব (পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম দিকের আহমদী মরহুম আওসাফ আলী উকিল সাহেবের বড় জামাতা), মরহুম আরফান আলী মুন্সি সাহেব (১৯৭১ সালের ২৪ শে এপ্রিল পাকিস্তানী সেনা বা এর সহযোগীরা তাকে ধরে নিয়ে যায়, তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি), উর্দূভাষী অথচ বাংলাকে ভালবাসতেন জনাব বদিউজ্জামান মুঙ্গেরী সাহেব (১৯৭১ সনের ১৮ই এপ্রিল বিহারী ক্যাম্প আক্রান্ত হলে তিনি তাঁর দুই ছেলেসহ নিহত হন) ও তাঁদের পরিবারবর্গ। তখন জামা'তে এমন একটা সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছিল যে আমরা সবাই পারিবারিকভাবে একে অপরের আত্মার আত্মীয়ের মত হয়ে গিয়েছিলাম।

ময়মনসিংহে ভেটেরিনারী কলেজ (পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মেডিক্যাল কলেজ থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থান এমনকি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও অনেক ছাত্র এখানে পড়তে আসতেন। এদের মধ্যে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক এবং ষাটের দশকের শুরুতে যারা আসেন তাদের মধ্যে ডা. আব্দুল খালেক সাহেব (বরিশাল), ডা. আওলাদ হোসেন সাহেব (মানিকগঞ্জ) এবং ড. মোজাহেদ উদ্দিন সাহেব প্রমুখ ছিলেন। ডা. আওলাদ হোসেন সাহেব বাংলাদেশের প্রথম আহমদী শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গণি সাহেবের ছোট ভাই, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী। ষাটের মাঝামাঝি থেকে সত্তর পর্যন্ত যারা আসেন তাঁদের মধ্যে জনাব শাহ আহমদ নাসের (মরহুম চৌধুরী আব্দুল মতিন সাহেবের পুত্র), ড. দেলোয়ার হোসেন (মরহুম চৌধুরী আব্দুল মতিন সাহেবের জামাতা এবং বর্তমানে কানাডা নিবাসী) এবং জনাব সেলিম আহমদ হাজারী (ঘাটুরা) বর্তমানে নিউজিল্যাণ্ড প্রবাসী প্রমুখ। উপরের সবাই ভেটেরিনারী কলেজ এবং পরবর্তীকালের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেন।

সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানী আহমদী ছাত্রদের মধ্যে ড. তাহের আহমদ খান (ড. মোজাহেদ সাহেবের সহপাঠী) এবং পরবর্তীতে তার ছোট ভাই ড. আতহার আহমদ খানের কথা মনে পড়ে। আতহার আহমদ খান সর্বশেষ ছাত্র যিনি ১৯৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান চলে যান। এঁরা দুই ভাই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার চিনো জামা'তের সদস্য। ২০০৬-৭ এ আমি যখন সেখানে যাই তাদের সাথে আমার দেখা হয় এবং ড. তাহের সাহেব তার বাসায় আমাকে দাওয়াত দেন।

ষাটের দশকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে বেশ ক'জন পশ্চিম পাকিস্তানী আহমদী ছাত্র অধ্যায়ন করতেন। তাঁদের মধ্যে জনাব মনসুর আহমদ এবং জনাব ফাহিমুল হক এ দু'জনের নাম মনে আছে, এছাড়া আরও কয়েকজন ছিলেন যাদের নাম আমার স্মরণে আসছে না।

একথা অনস্বীকার্য, আমরা ময়মনসিংহে আসার পর আমার পিতা জামা'তের কার্যক্রমে গতি সঞ্চারে সচেষ্ট হন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে জামা'তের সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয় এবং বিভিন্ন দিবস পালনের ব্যবস্থা করা হয়। আমার পিতার ডায়েরি থেকে জানা যায়, ১৯৬৩ সালের ৫ এপ্রিল ময়মনসিংহ জামা'ত এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটিই সেখানকার প্রথম নির্বাচন ছিল কিনা তা অবশ্য জানা নেই। সম্ভবত জনাব পণ্ডিত আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব অথবা জনাব আবুল হোসেন সাহেব ময়মনসিংহ জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এরপর জনাব বদিউজ্জামান ভুঁইয়া সাহেব দীর্ঘদিন সে জামা'তের প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন। আমার পিতা ময়মনসিংহে অবস্থান করলেও তিনি দীর্ঘকাল সেলবরষ জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন (কেন্দ্রীয় অনুমতিতে)। পরবর্তীতে আমার পিতাও দীর্ঘ দিন ময়মনসিংহ জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর জনাব জকিউদ্দীন আহমদ সাহেব, অধ্যাপক

আমীর হোসেন সাহেব, অধ্যক্ষ আজহার আলী খান সাহেব, ড. মোজাহেদ উদ্দিন আহমদ সাহেব এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হাই সাহেব ময়মনসিংহ জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

এছাড়া জনাব জিনাত আলী ভুঁইয়া সাহেব, আরফান আলী মুন্সি সাহেব, অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেবসহ আরও অনেকে সেক্রেটারি মাল-এর দায়িত্ব পালন করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, জনাব নূর হোসেন সাহেবও (মরহুম) সম্ভবত কিছুদিন এ দায়িত্বে ছিলেন।

ময়মনসিংহ জামা'তের একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল পবিত্র রমযানে মাসব্যাপী দরসে কুরআন। শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন আসর থেকে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত এক-এক দিন এক-এক বাসায় এ দরস অনুষ্ঠিত হত। সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কোন-কোন বাসায় সারা মাসে একাধিক দিন দরস-এর পালা আসত। দরসের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল প্রায় প্রতি বাসায়ই অ-আহমদীগণ আমন্ত্রিত থাকতেন। তারা আমাদের দরস শুনে মুগ্ধ হতেন। প্রখ্যাত লেখক ও পণ্ডিত অধ্যাপক যতীন সরকার তাঁর লেখা 'আহমদীয়াত আমার ভাবনায় ও অনুভবে' পুস্তকে এর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। প্রধানত আমার আব্বা তাঁর দরসে বেদ-বাইবেল-পুরাণ ইত্যাদির রেফারেন্সসহ দরস দিতেন, যা সবাইকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করত। এছাড়া অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভুঁইয়া সাহেব এবং প্রফেসর আমির হোসেন সাহেবও দরস দিতেন।

ময়মনসিংহ জামা'তে রাবওয়ার অনেক বুযুর্গের আগমন ঘটেছে। তাঁদের পবিত্র সংস্পর্শে জামা'তের সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ ধন্য হয়েছেন। পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে (যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর) প্রথম দিকে যেসব কেন্দ্রীয় বুযুর্গ ময়মনসিংহ সফর করেছেন তাঁদের মধ্যে মওলানা কাজী নাজির আহমদ লায়ালপুরী সাহেব, চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব, মওলানা ফজল আহমদ সাহেব, মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব, মির্যা আব্দুল হক সাহেব প্রমুখ রয়েছেন। পরবর্তীতে মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, রাজা নাসির আহমদ সাহেব, হাফেয মোযাফফর আহমদ সাহেব। মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ প্রমুখও ময়মনসিংহ সফর করেছেন। আমার মনে আছে পাকিস্তান আমলে চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব "বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামা'ত" বিষয়ে স্লাইড প্রদর্শন করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল অধ্যাপক বদিউজ্জামান ভুঁইয়া সাহেবের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে।

মুরব্বী-মোয়াল্লেম হিসেবে প্রথমদিকে যারা ময়মনসিংহে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের মধ্যে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব এবং মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব উল্লেখ্য। সদ্যপ্রয়াত মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব (অস্ট্রেলিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ) জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় অধ্যায়নকালে ছুটিতে একাধিকবার ময়মনসিংহে আসেন এবং বেশ কিছুদিন আমাদের বাসায় অবস্থান করেন।

দু'জন নও-মুসলিম আহমদী চট্টগ্রামের মরহুম বদরুদ্দিন আহমদ (পূর্ব নাম : বিমলেন্দু দাস ওরফে মন্টু বাবু) এবং ঢাকার খালেদ সাইফুল্লাহ (পূর্ব নাম : আশীষ কুমার নন্দী) 'ইসলাম ও তুলনা মূলক ধর্মতত্ত্ব' বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য আসেন। প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের নির্দেশে তাঁদের আমার আব্বার কাছে পাঠানো হয় উক্ত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য। তাঁরা ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিন মাস আমাদের বাসায় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

৮ই জানুয়ারি ১৯৭১ সনে আকুয়াতে আমাদের মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং সেই মাসের ১৯ তারিখেই জুমুআ'র নামাযের মাধ্যমে তা উদ্বোধন করা হয়। পাকা দেয়াল ও উপরে টিনশেডের মসজিদটি গত ৪/৫ বছর আগে সংস্কার ও বড় করা হয়। ১১ই সনে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ সনে মসজিদ প্রাঙ্গণে ময়মনসিংহের প্রথম জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়।

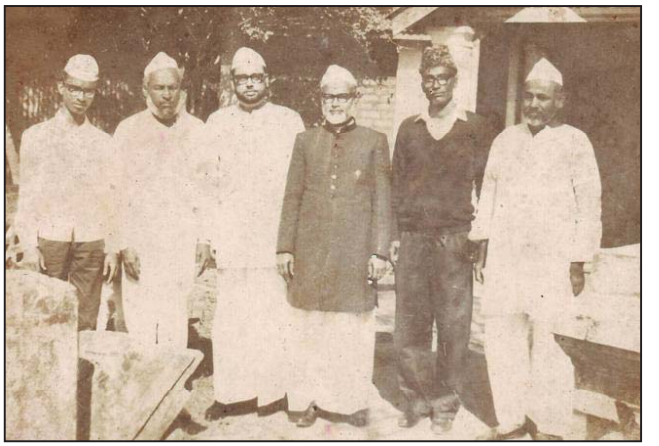

আহমদীয়া কটেজের সামনে; ছবির বাঁ দিক থেকে : শহীদ বদিউজ্জামান মুন্সেরী (শহীদ ১৯৭১), মরহুম জিনাত আলী ভূঁইয়া, মরহুম বদিউজ্জামান ভূঁইয়া, মরহুম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, শহীদ আরফান আলী মুন্সি (শহীদ ১৯৭১) এবং হাবিব-এ-খোদা

দেশের একমাত্র মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ময়মনসিংহে ছিল বিধায় খোদ পাকিস্তান আমল থেকেই বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আহমদী মহিলাগণ বি-এড কোর্সের জন্য এখানে আসতেন। সাধারণত আমার আব্বা তাঁদের স্থানীয় অভিভাবক থাকতেন। অধ্যায়নকালে বিভিন্ন সময়ে মানি-অর্ডারে তাদের টাকা-পয়সা আসত আমাদের ঠিকানায়, যেগুলো আমরা প্রাপককে পৌঁছে দিতাম।

অনেক স্থানীয় বুযুর্গ বিভিন্ন সময়ে আমাদের বাসায় আসতেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের জামা'তের বিশিষ্ট আলেম মরহুম এ.এইচ.এম. আলী আনোয়ার সাহেব (মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের পিতা এবং 'পাক্ষিক আহমদী'-র সম্পাদক) বছরে বেশ কয়েকবার তাঁর গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ থেকে আমাদের এখানে আসতেন। তিনি বেশ কিছুকাল অবস্থান করতেন এবং আমার আব্বার সাথে বিভিন্ন ইলমী বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করতেন। তিনি অত্যন্ত দোয়াগু ছিলেন এবং আমাদের নিয়ে অনেক দোয়া করতেন।

ময়মনসিংহ শহরের নিকটবর্তী ধানীখোলা জামা'ত ও বারেরায় আহমদীয়াতের বিস্তারে ময়মনসিংহ জামা'তের অবদান অনস্বীকার্য। মূলত ময়মনসিংহের তত্ত্বাবধানেই এ দু'টি স্থানে আহমদীয়াতের যাত্রা শুরু হয়। ধানীখোলা জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম নুরুল ইসলাম সাহেব (এডভোকেট মঞ্জুর আনাম সাহেবের পিতা) এবং মরহুম হাফিজ উদ্দিন সাহেব ২৪ শে এপ্রিল, ১৯৬৪ সনে বয়াত গ্রহণ করেন, এঁরা দু'জনই ওখানকার প্রথম বয়াতকারী। তাঁরা দু'জন স্কুল শিক্ষক ছিলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তাঁরা এবং কিছুদিন পর বয়াতকারী জনাব জকিউদ্দিন আহমদ সাহেবের চাকুরি চলে যায়। পরবর্তীতে কোর্টের রায়ে তাঁদের চাকুরি পুনর্বহাল হলেও জকিউদ্দিন সাহেব আর স্কুলের চাকুরিতে ফিরে যান নি, কারণ ততদিনে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্স বিভাগে চাকুরি পেয়ে যান। ১৯৬৪ থেকে '৬৫ সালের মধ্যে ধানীখোলায় আরও যারা বয়াত নেন তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব কায়মুস সুরায়াম

(আমাদের ন্যাশন্যাল সেক্রেটারি ওসায়া সারোয়ার মোরশেদ-এর পিতা) ও তাঁর ভাই আফজালুল হক, ডা. মোবারক আলী (জনাব হাবিবুর রহমান ও মোস্তাফিজুর রহমানের পিতা), হাবিবুর রহমান ও তাঁর অন্য ভাইগণ, হায়দার আলী (ডা. আমিনুল ইসলামের পিতা), জিয়াউল হক, বদিউল আলম খান ও মরহুম মগফুর উল্লেখ্য।

১৯৬৪ সালের ৪ ঠা মে অধ্যক্ষ আজহার আলী খান সাহেব বয়াত গ্রহণ করেন, তাঁর বাড়ি ছিল শহর নিকটবর্তী বারেরা গ্রামে। তিনি তখন শহরের সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ধানীখোলা এবং বারেরায় আরও বয়াত হয় এবং সেই সাথে বিরোধিতাও বাড়তে থাকে। ১৯৬৬ সালে ধানীখোলা জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৫ শে মার্চ, ১৯৬৬ সেখানে প্রথম জুমুআ'র নামায অনুষ্ঠিত হয়। এর আগ পর্যন্ত প্রায় দুই বছর ধরে ধানীখোলার আহমদীগণ ১১ মাইল দূরে ময়মনসিংহ শহরের "আহমদীয়া কটেজে" এসে জামা'তের সাথে জুমুআ' ও ঈদের নামায আদায় ও অন্যান্য জামা'তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। বারেরার অবস্থান ছিল শহরের ৪ মাইলের মধ্যে।

ষাটের দশকের একেবারে শেষ দিকে হালুয়াঘাটে কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি বয়াত গ্রহণ করেন, এঁদের মধ্যে সুরুজ মিয়া এবং শাহ মাজহারুল হান্নান নামে দু'জনের নাম মনে পড়ে– যারা নিয়মিত আমাদের বাসায় আসতেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর হান্না বাতিক এবং অখিল বাতিক নামে আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের দুই ভাই-বোন আমাদের বাসায় এসে বয়াত গ্রহণ করেন। বয়াতের আগে তারা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। দুর্ভাগ্য যে, দেশ স্বাধীনের পর আমরা আর তাদের খোঁজ পাই নি। তাঁদের সন্ধানে বেশ কয়েকবার হালুয়াঘাট এলাকায় জামা'তের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়, আমি নিজেও একবার প্রতিনিধিদলের সাথে সেখানে যাই। শুধু এটুকু জানা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিবারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এছাড়া রাজনীতির সাথে বেশি সংশ্লিষ্টতার কারণে সুরুজ মিয়া ও মাজহারুল হান্নান জামা'ত থেকে দূরে সরে যান, শেষ বয়সে (গত কয়েক বছর আগে) সুরুজ মিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, কিছুকাল আগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

দেশ স্বাধীনের পর ২৭ শে এপ্রিল, ১৯৭২ সনে আমাদের উদ্যোগে সার্বজনীন সীরাতুন্নবী(সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আমার আব্বার উদ্যোগেই এর আয়োজন হয়। উল্লেখ্য, স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসররা পবিত্র ধর্ম ইসলামের নামে যে হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচার চালায় তার ফলে সে সময় ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ও মহানবী(সা.) সম্পর্কে একদল লোকের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মূলত এহেন অবস্থায় ইসলাম ও মহানবী(সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

আমাদের মহারাজা রোডের বাসার কাছে মুকুল ফৌজ (বর্তমানে মুকুল নিকেতন) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই জলসায় আমার আব্বা ছাড়াও হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি এডভোকেট বঙ্কিম চন্দ্র দে, খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিনিধি অস্ট্রেলিয়ান বেপ্টিস্ট মিশনারী রেভা. আয়ান হোলী, ক্যাথলিক প্রতিনিধি ফাদার জোসেফ প্রদীপ দত্ত, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মানিক লাল দেওয়ান মহানবী(সা.)-এর জীবনাদর্শের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন শহরের নাসিরাবাদ কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ আলহাজ্জ রিয়াজ উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানের আগের দিন সারা শহরে মাইকে এর প্রচার করা হয়, আমি নিজে রিক্সায় করে মাইকে প্রচার করি। অনুষ্ঠানটি ব্যাপক সফলতা পায় এবং আলোড়নের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকাতায় সরকারের তথ্য ও গণসংযোগ বিভাগের "বাংলাদেশ পরিষদ" নামের প্রতিষ্ঠানটি বেশ কয়েক বছর এধরনের সীরাতুন্নবী(সা.) জলসার আয়োজন করে। যেখানে আমার আব্বা নিয়মিত বক্তা থাকতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এসময় সরকারের গণ-সংযোগ বিভাগের মহাপরিচালক ছিলেন আমাদের ঢাকা জামা'তের প্রাক্তন আমীর মরহুম মকবুল আহমদ খান সাহেব।

'আহমদ মেডিকো' নামে আমাদের একটা ঔষধের দোকান ছিল (১৯৬৬-১৯৬৯)। সেখানে মাগরিবের সময় জামা'তের সদস্যরা আসতেন, পাশের কক্ষে নামাযের ব্যবস্থা ছিল যেখানে বাজামাত নামায হত। সন্ধ্যার পর অন্যরা এসে বসতেন ফার্মেসিতে, শুরু হত আলোচনা, রাত ৮ টার পর আশে-পাশের ফার্মেসির ডাক্তারগণও তাদের প্র্যাক্টিস শেষ করে এসে যোগ দিতেন, রাত ১০টা পর্যন্ত চলত। পেছনের বাসা থেকে আম্মা চা-নাস্তা পাঠাতেন। ধানীখোলা এবং বারেরায় যখন বয়াত ও বিরোধিতা চলছিল তখন মাঝে-মাঝে এমন অবস্থা হত, সারা রাত তবলীগ চলত আমাদের ২০ স্টেশন রোডের বাসায়, রাতে মেহমানদের খাবারও ব্যবস্থা করা হত, আর আমার আম্মা নিজেই এসব ব্যবস্থা করতেন।

১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে আমরা মহারাজা রোডের বাসায় আসি। এখানেও প্রায় প্রতিদিন মাগরিবের সময় শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আহমদীগণ আসতেন আমাদের বাসায়, একসাথে জামা'তে নামায আদায় হত, দরস হত।
মাগরিবের পর শহরের গণ্যমান্য জ্ঞানী-গুণীজন একে-একে এসে শামিল হতেন এতে, শুরু হত নানা বিষয়ে আলোচনা, চলত রাত ৯টা/১০টা পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক যতীন সরকার তাঁর প্রাগুক্ত পুস্তকে লিখেন, "ময়মনসিংহের মহারাজা রোডে তৌফিক চৌধুরী সাহেবের বাসায় কতবার যে কত আলোচনা বৈঠকে যোগ দিয়েছি তা লেখাজোকা নেই। সেসব বৈঠকে তাঁরই মুখে আহমদীয়াতের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনেছি। সারা রমজান মাস জুড়ে ময়মনসিংহের আহমদীরা 'দরস-এ-কুরআনে'র অনুষ্ঠান করতেন। তাতেও আমি অনেকবার উপস্থিত থেকেছি। এমন কি শহরের উপকণ্ঠে আকুয়ায় তাদের মসজিদেও বেশ কয়েকবার গিয়েছি।" *(আহমদীয়াত : আমার ভাবনায় ও অনুভবে, পৃ. ৪)*।

ঢাকা থেকে জামা'তের কর্মকর্তারা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এলে তাঁদের উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান ও দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হত, এতে আহমদীরা ছাড়াও অ-আহমদী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হত।

এসবের ফলে একটি ছোট্ট জামা'ত হলেও আল্লাহ তা'লার ফযলে ময়মনসিংহ জামা'ত সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। যার প্রভাব আমরা এতকাল পরেও দেখতে পাই। ২০০৫ সালে "খতমে নবুওত আন্দোলন" যখন আমাদের ধানীখোলা মসজিদ আক্রমণ ও দখলের হুমকি প্রদান করে কর্মসূচি দেয় তখন ময়মনসিংহ শহরের ২৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক প্রশাসনের সাথে দেখা করে এটা প্রতিহতের দাবি জানান এবং প্রশাসনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উগ্র মোল্লার দল মসজিদ আক্রমণ তো দূরের কথা তার কাছে ধারেও পৌঁছতে পারে নি। ওদের প্রায় এক মাইল দূরে বৈলর বাজারে থামিয়ে দেয়া হয়।

স্মৃতিতে ময়মনসিংহ জামা'ত লেখাটি মূলত স্মৃতি থেকে লেখা হলেও এর মধ্যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উঠে এসেছে যা ভবিষ্যতে ময়মনসিংহ জামা'তের ইতিহাস রচনায় সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। সময়ের আবর্তনে যদিও আজ অনেক কিছুই স্মরণে নেই, তবু যতটুকু সম্ভব তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। লেখায় উল্লেখকৃত তারিখগুলি আমি আমার আব্বার ডায়েরি থেকে সংগ্রহ করেছি।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না। (সূরা বাকারা : ১৫৫)

মোহাম্মদ ওসমান গণি
Mohammad Usman Ghani
দেশের বাড়ি : মানিকগঞ্জ।
শাহাদাত : ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৩
শাহাদাতের স্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ছবি পাওয়া যায় নি

আব্দুর রহিম
Abdur Rahim
দেশের বাড়ি : তারুয়া
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
শাহাদাত : ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৩
শাহাদাতের স্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ওপরে উল্লেখিত দু'জন শহীদ ১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ টেংকের পাড়ে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসায় উগ্রপন্থি মোল্লাদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং পরদিন ৪ঠা নভেম্বর হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন।

বাংলাদেশের শহীদ আহমদী
Ahmadi Martyrs of Bangladesh

মোস্তফা আলী নান্নু
Mustafa Ali Nannu
দেশের বাড়ি : আহমদনগর, পঞ্চগড়,
শাহাদাতের দিন : ২১শে মে, ১৯৯৫
শাহাদাতের স্থান : রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

এ টি এম হক
A T M Huq
দেশের বাড়ি : মুরাদনগর, নরসিংদী
শাহাদাতের দিন : ২১শে মে, ১৯৯৫
শাহাদাতের স্থান : রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

ওপরে উল্লেখিত উভয়ই জামা'তী দায়িত্ব পালনকালে সড়ক দুর্ঘটনায় শহীদ হন।

ইমাম শাহ্ আলম
Imam Shah Alam

দেশের বাড়ি : রঘুনাথপুর বাগ, ঝিকরগাছা
শাহাদাত : ৩১শে অক্টোবর, ২০০৩
শাহাদাতের স্থান : ঝিকরগাছা, যশোর।

শহীদ শাহ আলম ঝিগরগাছা থানার রঘুনাথপুর বাগ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি এ গ্রামে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্টও ছিলেন। ২০০৩ সালের ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার দিন পবিত্র রমযান মাসে একদল ধর্ম সন্ত্রাসী প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা সন্তানের সামনে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে। খুনীরা চিহ্নিত এবং পরিচিত। তবু এ হত্যাকাণ্ডের আজ পর্যন্ত কোন বিচার হয় নি।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই-
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"।

দিনটি ছিল শুক্রবার। পবিত্র জুমুআ'র দিন। খুলনার নিরালা আবাসিক এলাকাস্থ আহমদীয়া মসজিদ দারুল ফযল। বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে খুতবা চলাকালে পেতে রাখা টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। আহত হন প্রায় ৩৫ জন। ঘটনাস্থলে ২ জন এবং হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর একে একে আরও ৪ জন শাহাদাত বরণ করেন। অর্থাৎ ৮ই অক্টোবরের দিন মোট ৬ জন শাহাদাত বরণ করেন। গুরুতর আহত জি.এম. মমতাজ উদ্দীন সাহেবকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হয়। তিনি মৃত্যুর সাথে দুই সপ্তাহ প্রাণপণ লড়াই করেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও ১৫তম দিনে শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ আলী আকবর সাহেবকে তাঁর দেশের বাড়িতে দাফন করা হয়। বাকী ৬ জন শহীদের কবর সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানাধীন যতিন্দ্রনগর গ্রামে রয়েছে। উক্ত বিস্ফোরণে আহত অনেকের অঙ্গহানী ঘটে। তাঁরাও আল্লাহর জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করে নিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯ খ্রি. খুলনা আহমদীয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের সাত শহীদের ছবি

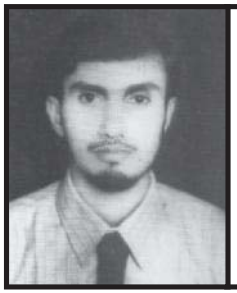

নুরুউদ্দীন আহমদ
Nooruddin Ahmad

দেশের বাড়ি :
ভেটখালী, সাতক্ষীরা
শাহাদাত : ৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯
শাহাদাতের স্থান : খুলনা।

সোবহান আলী মোড়ল
Subhan Ali Morol

দেশের বাড়ি :
যতিন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা
শাহাদাত : ৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯
শাহাদাতের স্থান : খুলনা।

জি এম আলী আকবর
G M Ali Akbar

দেশের বাড়ি :
মঠবাটি, পাইকগাছা, সাতক্ষীরা
শাহাদাত : ৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯
শাহাদাতের স্থান : খুলনা।

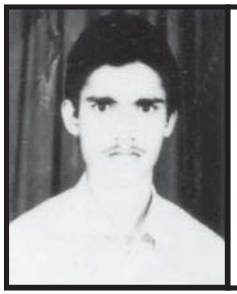

জাহাঙ্গীর হোসেন
Jahangir Hossain

দেশের বাড়ি :
দেয়াড়া, কয়রা, খুলনা
শাহাদাত : ৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯
শাহাদাতের স্থান : খুলনা।

জি এম মুহিব্বুল্লাহ
G M Muhibbullah

দেশের বাড়ি :
যতিন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা
শাহাদাত : ৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯
শাহাদাতের স্থান : খুলনা।

ডা. আব্দুল মাজেদ
Dr. Abdul Majed

দেশের বাড়ি :
মুন্সীগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
শাহাদাত : ৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯
শাহাদাতের স্থান : খুলনা।

জি এম মমতাজ উদ্দীন
G M Mumtazuddin

দেশের বাড়ি : হরিনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
শাহাদাত : ২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৯
শাহাদাতের স্থান : পঙ্গু হাসপাতাল, ঢাকা

শহীদ মমতাজ উদ্দীন খুলনা আহমদীয়া মসজিদের মোয়াজ্জিন ছিলেন। ৮ই অক্টোবর খুলনা আহমদীয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁকে ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাখা হয়। ক্রমশ অবস্থার অবনতি হতে থাকলে চিকিৎসকরা তাঁর ডান পা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ দুই সপ্তাহ মৃত্যুর সাথে লড়াই করে অবশেষে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন।

সুন্দরবনের মাটিতে শায়িত আছেন ছয় শহীদ

দোয়ার কবুলিয়ত

শামীম আরা বেগম

কিছু-কিছু ঘটনা মানুষ সারা জীবন তার স্মৃতিতে ধারণ করে রাখে। ভুলতে পারে না সেসব ঘটনাবহুল স্মৃতিকে। আমার জীবনেও এসেছে এমন কিছু মুহূর্ত যখন আমার মনে হয়েছে আমাদের সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনে যে ঘোষণা দিয়েছেন, 'উদ'উনী আসতাজিব লাকুম'– অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাকার মত ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব *(সূরা আল মো'মেন: ৬১)*-এ কথা নির্ঘাত সত্য। আজ আপনাদের সামনে এক অস্থির, বিপদে আক্রান্ত মানুষের দোয়া খোদা তা'লা কীভাবে কবুল করে থাকেন তা আমি আমার নিজের কিছু ঘটনার আলোকে তুলে ধরা সমীচীন বলে মনে করছি।

আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহে কাদিয়ান জলসার উদ্দেশ্যে আমিসহ আমার পরিবারের মোট তিনজন সদস্য গত ২৪ শে ডিসেম্বর ২০১১ সনে রাত ১০ টার সময় বাসা থেকে বের হই। রাত ২:৩০ মিনিটে আমরা দিল্লী বিমানবন্দরে অবতরণ করি। বিমানবন্দর থেকে টিটাগড় আমার আত্মীয়ের বাসায় যাব। সেখানে যাবার জন্য ট্যাক্সিতে উঠে দেখি এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। আমি তাকে দেখে ভয় পেলাম। আমার স্বামী ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা দু'জন কেন? কিন্তু তারা কোন সদুত্তর দিল না। যাহোক, টিটাগড়ের উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি চলা শুরু করল। যেতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। আমি গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের মোবাইল দিয়ে আমার বোনকে ফোন দিলাম। আমার বোন বলল, তোদের এত রাতে এয়ারপোর্ট থেকে বের হবার দরকার নেই, সকাল হলে গাড়িতে উঠিস, রাস্তা ভাল না। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের গাড়িতে ওঠা শেষ। রাস্তায় প্রচণ্ড কুয়াশা, অন্যদিকে রাস্তাও ছিল অপরিচিত। আমার খুব ভয় লাগছিল। আমার স্বামী বলল, এত রাতে আমাদের ট্যাক্সিতে ওঠা ঠিক হয় নি। এখন এরা যদি আমাদের কোন ক্ষতি করে বসে তাহলে আমাদের করার কিছুই থাকবে না।

নিঝুম রাত, কুয়াশায় অন্ধকার, অপরিচিত জায়গা আর সাথে কনকনে শীত। আমার স্বামীর চেয়ে আমিই বেশি চিন্তিত, কেননা আমার বোনের বাসা আমি কতটুকু চিনি সেটা আমিই ভাল জানি! ২০ বছর আগে এসেছিলাম। ভয়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছি, আর আল্লাহকে আকুলভাবে ডাকছি। আমার স্বামীকে আমি বুঝতে দিচ্ছি না, আমি কী পরিমাণ ভয় পাচ্ছি। একটানা দোয়া করে যাচ্ছিলাম। দোয়া পড়তে-পড়তে দেখি ট্রেনের সিগন্যাল পড়েছে। ট্যাক্সি থেমে আছে, পাশেই চায়ের দোকান ৩/ ৪ জন লোক চা খাচ্ছে, লোকগুলোকে দেখে আমি ট্যাক্সি থেকে দ্রুত নেমে পড়লাম। আমার স্বামী বলল, নামছ কেন? আমি বললাম, এই ট্যাক্সিতে আমি আর যাব না, যা ভাড়া তা দিয়ে দাও, সকাল না হওয়া পর্যন্ত এই লোকগুলোর সাথেই থাকব। এমন এক পরিস্থিতিতে সাহায্যকারী একমাত্র খোদা তা'লাই হতে পারেন। তাই শুধু তাঁকেই ডাকতে থাকলাম। এমন সময় দেখি, সিগন্যালের ঐ প্রান্তে একজন মহিলা একা দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই চিনে ফেললাম, এ তো আমার ফুফাত বোন। আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম, মনে হল আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। আমার যে তখন কী খুশি লাগল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এত রাতে আমার বোন কোথা থেকে এল এগুলো সবই খোদা তা'লার অনুগ্রহ এবং আকুতি ভরা দোয়ার ফসল।

আরেকটি ঘটনা হল, শিয়ালদহ থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে জলসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম কিন্তু কুয়াশার কারণে সঠিক সময়ে আমরা পৌঁছতে পারি নি। জলসার প্রথম দিন দুপুর ১২টার সময় অমৃতসর স্টেশনে নেমেছি। কিন্তু কাদিয়ানে কীভাবে যাব? যারা রিসিভ করবে তারা কেউ ফোনও ধরছে না, আর কোন ট্রেনও আসছে না। কুয়াশার কারণে ট্রেন আসতে বিলম্ব হচ্ছে। স্টেশনের লোকদেরকে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, কাদিয়ানে কীভাবে যাব? স্টেশনের লোকরা বুঝতে পারল, আমরা নতুন। তারা বলল, ট্যাক্সিতে যান ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা লাগবে। দিল্লীতে ট্যাক্সিতে যে ভয় পেয়েছিলাম সেই ভয়টা তখনও ভিতরে কাজ করছিল। তাই ট্যাক্সিতে না বসে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্টেশনেই বসে থাকলাম। টানা দুই রাত ট্রেনে ছিলাম। ক্লান্তির পাশাপাশি অস্থিরতাও কাজ করছিল। আমার মেয়ে কাঁদছিল। তখন দুপুর ২টা বাজে। কাদিয়ান কীভাবে যাব বুঝে উঠতে পারছি না। জলসার প্রথম দিন উপস্থিত থাকতে না পারার দরুন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। কাদিয়ানে যাবার আগে আমার হালকার সেক্রেটারি তরবিয়ত সাহেবা আমাকে বলেছিলেন, আপা জলসায় ভাল করে পর্দা করে যাবেন, মুখ ঢেকে রাখবেন। তার কথা অনুযায়ী আমি পর্দার বিষয়ে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। স্টেশনে অনেক মানুষ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল।

এমন সময় এক অল্প বয়সী মহিলা এসে হিন্দিতে আমাকে বলল, আপনি জলসায় যাবেন? আমি বললাম, আপনি? তিনি বললেন, আমিও জলসায় যাব; জলন্ধর থেকে এসেছি, জিজ্ঞেস করলাম, আপা! আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন, আপনাকে হিজাব পরা দেখে মনে হল আপনি আহমদী- তাই জিজ্ঞেস করেছি। আমি বললাম, আপনার সাথে পুরুষ কে আছে? তিনি বললেন, আমার দেবর। তারপর আমার স্বামীর সাথে তার দেবরের পরিচয় করিয়ে দিলাম। আলাপ করতে করতে ট্রেন এসে গেল। তখন আমরা ৩০/- টাকা করে টিকিট কেটে কাদিয়ানে গেলাম। আমার মনে হয়, আমি হুযূর আনোয়ার(আই.)-এর নির্দেশ মেনে ভাল করে পর্দা করেছিলাম বলেই এমন একাকী ও বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে খোদা তা'লা আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আর সেই সাথে ঐ মেয়েটির সাথেও আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে আমাকে চিন্তামুক্ত করেছিলেন। তাই আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, পবিত্র আমার প্রভু অতীব মহান, পরম সাহায্যকারী, অস্থির হৃদয়ের দোয়া শ্রবণকারী।

'It is the weapon of prayer, which has today been discarded by mankind. The members of our community should sharpen it and make use of it. They should pray constantly and they should never get tired of supplication.'

-Hazrat Alhaaj Hakim Nuruddin[ra]

শতবার্ষিকী উপহার 'বঙ্গের রত্ন'

জি.এম. সিরাজুল ইসলাম

যাইব কোথায় কইব কারে আমার মনের বেদনা-
একশ, বছর ধরে মানুষ দীনদার মু'মিন চিনল না,
কইব কারে কেমন করে বঙ্গ রত্নের ঘটনা
করেছে যারা এই বাংলাতে আহমদীয়াতের সূচনা।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা গাঁয়ের নামটি বটতলী,
আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ নামে ছিলেন এক ওলী।
উনিশ শত চার সালে এই ওলী সবারে বলে-
ঈমান গেছে রসাতলে,
আইছে ভবে মাহদী–ঈসার ওফাত হইছে
কাশ্মীরে তাঁর সমাধি বিরাজিয়া আছে।

মনের কথা কইতে ব্যাকুল কেউ তাঁরে সুধাইল না,
হাসির ছলে তাঁরে বলে ঈসা মারা মওলানা।
কিশোরগঞ্জের রইসউদ্দীন খাঁ শুনে মসীহের দাবি,
মাহদীর হাতে তাঁর বয়াতে খেতাব পাইছে সাহাবী।

"রবির আলো উদয় হলে বটের ডগায় পড়ে,
নিন্দুকেরা না বুঝিয়া দুর্বাঘাস কয় তাহারে"।
আব্দুল ওয়াহেদ এই বঙ্গের এক কিংবদন্তি মওলানা,
নয়টি বছর যাচাই করে ইমাম মাহদীর ঘোষণা।

এমদাদ চৌধুরী, দেলোয়ার আলী, তার সাথে ধনুমিয়া,
খলীফা আউয়ালের হাতে বয়া'ত করে কাদিয়ানে গিয়া।
বড় মওলানার এই ঘটনা বি.বাড়িয়ার অলি-গলিতে,
শত-শত মুরীদ আসে তার হাতে বয়াত নিতে।

বঙ্গে বয়াত পঁচিশ নভেম্বর উনিশ' বার সনে,
এবার বলি তাদের নাম যারা সৈনিক মাহদীর ভুবনে।
পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, জার্মানে যার অবদান,
তিনি বগুড়া নিবাসী মৌলভী মোবারক আলী খান।

দেবগ্রামের মোজাফ্ফর চৌধুরী আর পৈরতলার চান আলী
বাসুদেবের পঞ্চ ভাষার পণ্ডিত শ্রী হায়দার আলী।
খড়মপুরের গোলাম মওলা নবম শ্রেণির ছাত্র সে,
সঙ্গী যত ঈমান আনে তাঁর আধ্যাত্মিক পরশে।
গোলাম সামদানী, মোসলেম উদ্দীন, দৌলত মালেক খড়মপুর,
পুনিওয়াটের আব্দুর রহমান, উজির আলী বিষ্ণুপুর।

চট্টগ্রামের আব্দুল লতিফ তাঁর তনয় ফালু মিঞা,
আব্দুর রহমান মুন্সির বাড়ি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
মীর সেকান্দার, সিদ্দিক, ওসমান, রফিক, হাবিব–সরাইল,
মীর আব্দুর রাজ্জাক, সাত্তার, জলিলের বাড়ি যে মোড়াইল।

নাটোরের বনলতা সে আবুল হাসেম খান চৌধুরী,
কাশেম, আব্দুস সামাদ, তাদের দানের নেই জুড়ি।
কাসাইটের আলামা জিল্লুর ও সুফি মতিউর রহমান,
শুদ্ধি আন্দোলনে এই দুই সৈনিক গেছে কাদিয়ান।

বাশারুকের রহমত আলী-খলিলুর রহমান খড়মপুর,
জনাব আলী, আবদার আলী, কামদার আলী শাহবাজপুর।
প্রেমার চরের তালেব হোসেন নাম তাঁর বাঘা মওলানা,
তাতারকান্দির আলী আনোয়ার, ইয়াসিন সাহেব পাবনা।

শামসুর রহমান, কফিলুদ্দীন, মনোয়ার আলী বি.বাড়িয়া,
আহম্মদ আলী, দেওয়ান উদ্দিন, তাদের বাড়ি তারুয়া।
ঘাটুরার নেজামত উল্লাহ্, আর মৌলভী সলিমুল্লাহ্,
কুমিল্লার হোসামুদ্দিন, চরদুখিয়ার মহিবুল্লাহ্।

কুরবানী দান সদকা যারা করেছে মসীহের জামা'তে,
অষ্ট্রালিকায় তাদের আলে আছে সহী সালামতে।
শাহবাজপুরের ব্যারিস্টার শামসুর রহমান, ভিজির আলী,
লকিয়তুল্লাহ্, আলী আকবর খানের ঘর নোয়াখালী।

খাজা আহম্মদ ফেনীর ছেলে সিদ্দিক আহমদ ফাজিলপুর,
চুনিয়টের হাফেয কাইয়ুম, কুটিরহাটের সৈয়দ নূর।
সিলেট জেলার সৈয়দ মমতাজ–আনিসুর রহমান বাজিতপুর,
পাণ্ডুলিয়ার আব্দুল করিম, নূরমোল্লা মহারাজপুর।

বেতাল বাড়ি আলী আকন্দ কী দেব তার বর্ণনা,
কাশ্মীরের হানিফ কোরাইশী আমরা তোমায় ভুলব না।
এজাজ, সাঈদ এই সহোদর ওয়াহেদ সাহেবের দুই ছেলে,
ঠাকুর নুরুল ইসলাম নব-মুসলিম আহমদীর দায় যায়
জেলে।

নাটাইয়ের শাফায়াত উল্লাহ্, ওয়াসীমুদ্দিন জামালপুর,
রংপুরের বদরউদ্দীন আর, হামিদ হাসান দিনাজপুর।
বাঁকুড়ার মৌলভী মোহাম্মদ গ্রামখানি তাঁর কড়সুণ্ডি,
দুর্গারামপুরের আফজাল এয়াকুব, এ.টি.এম. হক নরসিংদী।

সুনামগঞ্জের শেলবরষে তৌফিক চৌধুরীর বাড়ি,
বিশ্বধর্ম তত্ত্বজ্ঞানে এই যাজকের নাই জুড়ি।
কটিয়াদীর এজাজ কবিরাজ, আব্দুর রহমান সোহাগী,
নারায়ণগঞ্জের খালেক মুন্সি, ফজলুল করিম বৈরাগী।

একশ' বছর পার করিলাম দীনের কিছুই করি নাই,
বাংলার সকল বাঙালিরে মাহদীর পয়গাম দিতে চাই।
পানিউমদার ফারুক মৌলভী–আজিজুর রহমান হবিগঞ্জ,
ডোহাণ্ডার হাকিম উদ্দিন-রাশিদুজ্জামান বকশীগঞ্জ।

আমীর হোসেন উথলী–চুয়াডাঙ্গার মোসলেম বারী,
নূর হোসেন, মোশাররফ হোসেন রিকাবী বাজার বাড়ি।
আনিসুর রহমান, আবু তাহের, ফরহাদ, ঈসা ও মুছা,
হিযরত করে আহমদনগর–আজীমুদ্দিন বীরপাইকশা।

দিনে-মাসে বছর গেছে খাড়া রৌদ্র মাথার ওপর,
কী খাবে আর কে খাওয়াবে কেউ রাখে নি সে খবর।
বরিশালের বদিউজ্জামান–আব্দুল বারী কুকুয়া,
আলী আহম্মদ কৃষ্ণনগর–এয়াকুব আলী কুষ্টিয়া।

শালগাঁওয়ের আজীজ মাস্টার–আহমদনগর নান্নু মিয়া,
জিন্দা শহীদ ওমর ফারুক ছিল বড়বাইশদিয়া।
ভাতগাঁওয়ের ফজলুর রহমান–বীরগঞ্জের খতীবউদ্দীন,
গালিমগাজীর গোলাম রহমান–নিউসোনাতলার রাজীব উদ্দীন।

মৌলভী পাড়ায় টিনের তলায় বয়াতের সেই দশ ধ্বনি,
(আজ) পাঁচশ' জায়গায় শুনি বাংলায় আল্লাহ্ রসূলের বাণী।
বক্শীগঞ্জের রাশিদুজ্জামান-আব্দুল জব্বার হোসনাবাদ,
ভেটখালিতে ছকিমুদ্দীন-শওকত আলী নাসেরাবাদ।
শত নামের ইতি দিলাম–শামসুর চেয়ারম্যান সুন্দরবন,
এবার বলি যারা দীনের সেবায় দিয়েছে জীবন।

দশ শহীদের তাজা রক্তে ধন্য মোদের এই ভূমি,
তারুয়ার আব্দুর রহিম, সাভারের ওসমান গণি।
ডা. মাজেদ, মহিবুল্লাহ্, জাহাঙ্গীর, নুরুদ্দিনে,
সুবহান মোড়ল, মমতাজ আলী ছয় শহীদ সুন্দরবনে।
আলী আকবর পাইকগাছায়, রঘুনাথপুরবাগ শাহ আলম,
এই বীরের কুরবানীতে মোর অশ্রুভরে দু'নয়ন।

বঙ্গভূমির এই জমিনে কত রত্ন কেবা জানে
যাদের নাম নিতে পারি নাই, তারা আসমানে অমর
আমায় ক্ষমা করবেন তাদের আছেন যত গুণধর।

মোদের সোনার বঙ্গেতে রয় হাজার রত্নের অবদান,
(আজ) খেলাফতের ছায়াতে দশ লক্ষ বাঙালি মুসলমান।
সকল বঙ্গ বীরকে জানাই হাজার-হাজার সালাম,
মোদেরকে চিনাইল যারা বিশ্ব নবীজির গোলাম।

শাহাদাতের দোহাই দিয়ে দোয়া করি ভাই
সবার আগে মোদের বঙ্গে বিজয় যেন দেখতে পাই।
পাপী-তাপী গোনাহ্গারে দোয়া করি ওগো ভাই,
সবার আগে সোনার বঙ্গে বিজয় যেন দেখতে পাই।

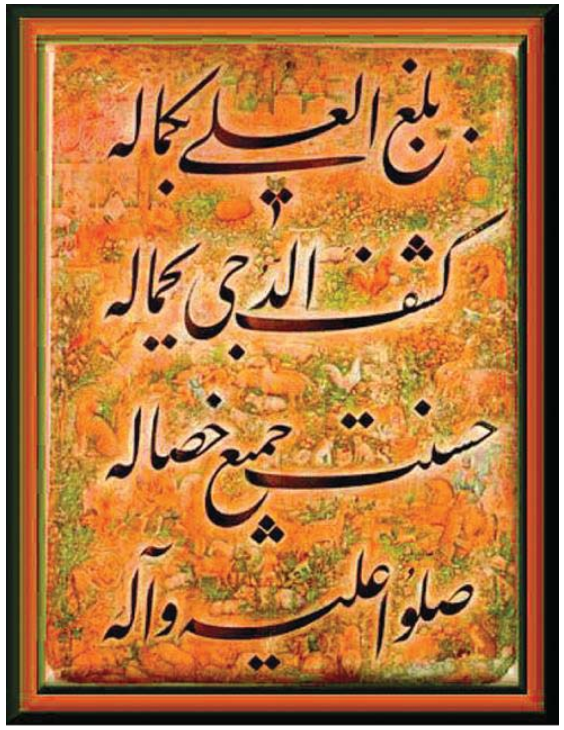

The Centenary Souvenir

Bangladesh is a beautiful country filled with tropical rainbows. It is full of colours all around and its society is also just as colourful. Bangladesh is a pluralistic accommodating society containing many races and faiths. As such, the society has a built-in quality of inter-faith and intra-faith harmonious coexistence.

Except for a few artificial crisis-periods created by the fanatic peddlers of religion and a number of sporadic attacks, the Bangladeshi Ahmadi Muslims in general have enjoyed a very comfortable and peaceful time. On the eve of our centenary celebrations we have tried to thank our Gracious Allah, the Almighty, and the people of Bangladesh. We once again express our sincere gratitude to our fellow countrymen. Under the divine Ahmadiyya Khilafat, the Community has established its roots in over 500 branches and sub-branches in Bangladesh. Though small in number, it carries an unparalleled respect and repute. Ahmadis are widely held as a symbol of high morale and loyalty. These are the mere mercy and blessings of our Gracious Lord to Whom we remain forever grateful from the core of our hearts. Alhamdolillah summa Alhamdolillah.

This souvenir provides just a few glimpses from the innumerable divine bounties we have received throughout the last century. The Centenary Address of Hazrat Khalifatul Masih, the V (aba), and also his message sent specially for this souvenir has been placed at the beginning. Extracts from the writings of the Promised Messiah(as) have been reproduced in different places. Very brief highlights of the century-long Bangladeshi Ahmadiyya Community have been wrapped up in these few pages. Faith inspiring experiences and incidents concerning acceptance of prayers are a part of this package. One article deals with the inclusive and tolerant humanitarian values reflected in our Bangla literature. A recent article on 'Islam and the World Peace' has been written based on Huzur's recent deliberations. Brief notes on a few notable Bengali Ahmadis have been given for the moral development of the next generation. A pictorial presentation of Ahmadiyya Mosques and Missions has also been included.

Despite our sincere efforts, the errors and the loopholes in this publication will certainly depict our human limitations. We beg to be forgiven for all the shortcomings a reader may come across. With a humble request for prayers. Thank you Lord! Long live Ahmadiyyat! Long live Bangladesh!!

---The editorial team
31.12.2014

বাংলার কৃতী সন্তান

রত্নগর্ভা বাংলার অনেক গুণীজন বহির্বিশ্বে ইসলামের সেবা করার অনন্য সুযোগ পেয়েছেন। এখানে তাদের কয়েকজনের উল্লেখ করা হল।

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

তিনি ১৯০৯ সালে কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল(রা.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি ১৯২০ - ১৯২২ লণ্ডনে এবং ১৯২২ - ১২৪ সালে জার্মানিতে প্রথম মিশনারী হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৪০ - ১৯৪৯ সাল বঙ্গীয় ও পূর্ব পাকিস্তান জামা'তের আমীর ছিলেন। ১ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুফি মতিউর রহমান সাহেব

১৯১৬ সালে বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ সুদীর্ঘ বিশ বছর আমেরিকায় জামা'তের মিশনারি হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ৫৬ বছর বয়সে ৩০ অক্টোবর ১৯৫৫ সালে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন।

আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি সাহেব

তিনি ১৯২৮ বা ১৯২৯ সালে বয়াত করেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত তিনি

মাসিক/পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক ছিলেন। কাদিয়ান ও রাবওয়ার তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমেরিকার মিশনারি ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭২ সালের ১৬ মে অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন।

মওলানা আনিসুর রহমান সাহেব

১৯৭০ সাল থেকে পাকিস্তানের কয়েকটি স্থানে এবং ১৯৭৭ সাল থেকে কয়েক বছর যুক্তরাজ্যে এবং পরে ১৯৮৭ সাল থেকে খুলনায় জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। ১৯৮৯ সালের ২০ মার্চ তিনি ইন্তেকাল করেন।

মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব

তিনি অস্ট্রেলিয়ার মিশনারি ইনচার্জ ও ন্যাশনাল আমীর ছিলেন। খিলাফতের সান্নিধ্যে কেন্দ্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দীর্ঘদিন নিয়োজিত থাকার পর ১৯৯০ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। ২৩ এপ্রিল ২০১৪ খ্রি. তার মৃত্যুতে হুযূর(আই.) ২৫ এপ্রিল ২০১৪ খ্রি. খুতবায় তাঁর প্রশংসা ও স্মৃতিচারণ করেছেন।

এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব

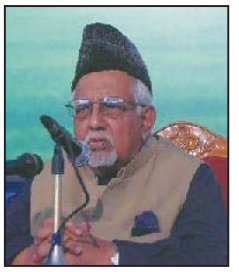

বাংলাদেশের বাইরে থেকেও জন্মভূমির প্রতি তাঁর টান এতটুকুও ম্লান হয়নি। তিনি আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের সুযোগ্য পুত্র। খিলাফতের পক্ষ থেকে দোয়া ও সমর্থন তাঁকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর লেখা ও উপস্থাপনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাদৃত।

মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব

বর্তমানে লণ্ডনে কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত এবং আযান দেয়ার মাধ্যমে তিনি সারা বিশ্বে সুপরিচিত। খিলাফতের সান্নিধ্য লাভ করে তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক বড় সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন।

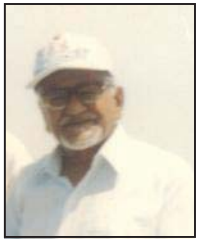

প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব

কাদিয়ানে লেখাপড়া করেন। 'নুসরত জাহান' স্কীমের অধীনে জীবন উৎসর্গ করে আফ্রিকার ঘানায় তিনি আহমদীয়া স্কুলে কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন।

মৌলভী আহমদ তারেক মোবাশ্বের সাহেব

বর্তমানে লন্ডনে কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কে কর্মরত। আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেবের পুত্র তিনি। কেন্দ্রে মূল্যবান নীরব সেবা দানে তিনি সুযোগ পাচ্ছেন।

শাহেদ আহমদ সাহেব

জামা'তের নিষ্ঠাবান সেবক শাহেদ আহমদ সাহেব। তিনি ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত সৌদী আরবের ন্যাশনাল আমীর হিসেবে সেবা করে বহির্বিশ্বে খাঁটি ইসলাম প্রচারে অবদান রেখেছেন।

ডা. মুহাম্মদ সেলিম খান

আফ্রিকার কঙ্গোতে জামা'তের আর্ত-মানবতার সেবায় তিনি কয়েক বছর কাজ করেছেন।

জাহাঙ্গীর মোর্শেদ আলম সাহেব

তিনি বর্তমানে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অস্ট্রিয়া হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

শতবর্ষে আমাদের প্রকাশনার মাত্র একটি ঝলক

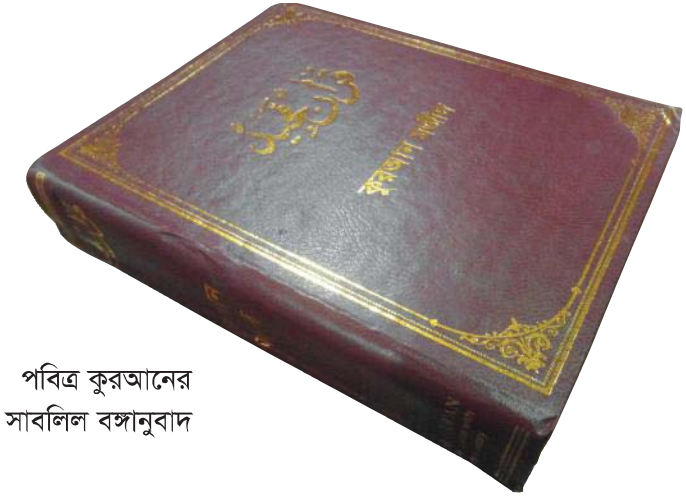

পবিত্র কুরআনের
সাবলিল বঙ্গানুবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে পাক্ষিক আহমদী, জ্ঞান ও গবেষণামূলক পুস্তকাদি, ইবাদত এবং জামা'তের সদস্যদের আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অনেক ছোট বড় পুস্তক প্রকাশিত হয়।

এসবের মাঝে সবচেয়ে বড় অর্জন হল হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুস্তকাবলির বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ।

যার এক ঝলক পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হল।

বাঙালি মন-মানসে ধর্ম ও মানবতা

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আমরা বাঙালি। বাংলাদেশ আমাদের দেশ। আমরা এদেশেরই জলবায়ু ও মাটির গঠনে পুষ্ট। আমাদের রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। আমাদের চিন্তার গভীরে প্রোথিত আছে জাতি-বর্ণ-গোত্রের ঊর্ধ্বে গিয়ে নতুনকে গ্রহণ করার সহজাত প্রবৃত্তি। শত-সহস্র বছর ধরে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির আগমন, শাসন, শোষণ আমাদের সাথে পরিচয় করিয়েছে নানা সভ্যতার। আমরা যতটুকু গ্রহণ করেছি তার চেয়ে কম কিছু দিইও নি। এই মিলবার-মিলাবার প্রাণশক্তিই আমাদের করেছে অনন্য।

নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে আমরা অস্ট্রিক জাতি। তবে সুদীর্ঘকাল ধরে নানা বর্ণের মানুষের সংমিশ্রণে আমাদের বর্তমান পরিচয় সংকর জাতি। পণ্ডিতদের মতে, আমাদের গায়ে সামান্য আর্য রক্ত–মোটামুটি নিগ্রো রক্ত, তাছাড়া দ্রাবিড় ও মোঙ্গল রক্তের সংমিশ্রণ আমাদেরকে দিয়েছে বহুমাত্রিক বিচার-বিশ্লেষণের সক্ষমতা। কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কুকি, তিব্বতী–এরাই বাঙালির নিকট জাতি বা পূর্ব-পুরুষ। এই জাতিসত্তার বয়স দুই হাজার বছরেরও বেশি। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, এ সুদীর্ঘ সময়ে এক উন্নত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে বাঙালিরা। শৌর্য ও দারিদ্র, গৌরব ও লজ্জা, শক্তি ও দুর্বলতা, সম্পদ ও জঞ্জাল, ভালবাসা ও ঘৃণা–এসব পরস্পরবিরোধী দোষ-গুণ আমাদের চরিত্রে থাকলেও প্রাচীনকাল থেকেই শান্তিপ্রিয়তা, সহনশীলতা ও অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান–এই গুণত্রয়ীকে ধারণ করে হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ এই রাঢ়-বঙ্গ-বরেন্দ্র ভূমিতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে চলেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদাত্ত আহ্বান যেন সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেরই নবরূপ:

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে এই ভারতের
মহামানবের সাগর তীরে।"

'মন' হচ্ছে হৃদয়বৃত্তিক আর 'মানস' বুদ্ধিবৃত্তিক। আরেকটু সহজ করে বলতে গেলে, যেকোন বিষয়ে মনের ভাবনা বা আবেগকে বিশেষায়িত চিন্তা চেতনার নিরিখে স্থিত-ধী বিচার বিশ্লেষণে গঠিত বিশ্বাসকে মানস বলা যায়। আর ধর্ম বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি–'যা ধারণ করা হয়।' প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। স্রষ্টার সাথে মিলনের পথের যে বৈশিষ্ট্য বা মতবাদগুলো–এগুলোই এক একটি ধর্ম বলে আমরা ধরে নিতে পারি। অর্থাৎ ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' বলতে যা বুঝায় তা-ই এই সন্দর্ভের 'ধর্ম' শব্দের অর্থ।

'মানবতা' শব্দটির ব্যাপক অর্থের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়ে ধরে নিতে পারি মানুষের জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও বোধ-বিবেচনাকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করাই 'মানবতা'। বাঙালি চেতনার মর্মমূলে রয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে সকল মানুষের ধর্ম পালনের অধিকার সুনিশ্চিত করা, পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে সবার অধিকার নিশ্চিত করা, মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালবাসা। এই সবই হল বাঙালির চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। বাঙালির মুখে উচ্চারিত হয় মানুষের মর্যাদা ও মনুষ্যত্বের মহিমা। বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবনবোধের ঐক্যের মূল সূত্রটি হল, ভাষার ঐক্য। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়েও এই ঐক্যে কখনও ফাটল ধরে নি। এই ঐক্য অন্য সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুন্দর রূপটিই হাজার বছর আগে বাঙালি বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে:

'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

লালন ফকিরের গানে উঠে এসেছে মানবের মর্যাদার কথা:

'জাত গেল জাত গেল বলে
একি আজব কারখানা।
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-চামার-মুচি
এক জলে হয় সবাই শুচি,
এসব দেখে হয় না রুচি
সবই দেখি তা না না না।'

'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ'–এই সর্বজনবিদিত হাদীসটির কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। দেশকে ভালবাসতে হলে, দেশের মানুষকে ভালবাসতে হলে, এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনপদের সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতির মন-মানসের অতলান্ত গভীরে প্রবেশ করার কোন বিকল্প নেই। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) বলেছেন, কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকলে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ ভালবাসা সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস কী হবে ভালবাসা কতটুকু হবে–এ সবকিছু নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের জানার গভীরতা ও ব্যাপ্তির উপর। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসার মান ও মাত্রা যতটুকু হবে, আমাদের ঈমানের অঙ্গটিও ততটুকু মজবুত, সুন্দর ও সাবলীল হবে।

বাংলা কাব্যের যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ত্রিকাল দর্শন আমাদেরকে এক ঝলকে দেখিয়ে দিবে আমাদের সমৃদ্ধ অতীত-বর্তমানকে। প্রেম, মানবতাবাদ, উদারচিত্ততা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাঙালি মানসলোকের চিরকালীন উপজীব্য। বৈষ্ণব কবিতা থেকে বাউল গানে, বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ থেকে সুফিতত্ত্বে, মঙ্গলকাব্য থেকে পুঁথি সাহিত্যে কিংবা লোকসাহিত্য থেকে আধুনিক সাহিত্যে সামগ্রিক প্রেম, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনারই জয়জয়কার। ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ অবধি সময়কে বাংলা কাব্যের প্রাচীন যুগ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। ভারতীয় ভাষাবিদদের মতে এই সময়টি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ। হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী তিব্বতের রাজ দরবার থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন উপাদান চর্যাপদ সংগ্রহ করেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে এগুলো ৬৫০ সালে রচিত বলে অনুমিত হয়।

চর্যাপদগুলো মূলত বৌদ্ধ ধর্মের সাধন সংগীত। নিচে দু'টি পঙক্তি উদ্ধৃত করা হল :

'কা আ তরুবর পাঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চী-এ পৈখা কাল।'

অর্থাৎ কায়া হল পাঁচটি ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (মৃত্যু) প্রবেশ করল।

'আলী-এ কালি-এ বাট রুনঢেলা
তা দেখি কান-হ বিমনা ভইলা।'

অর্থাৎ জাগতিক অনেক কিছু পরকালের পথে বাধা স্বরূপ। তা দেখে কবি কান-হ উতলা হয়ে গেছে।

প্রথম উদ্ধৃতিটি হল দেহতত্ত্ব বিষয়ক; পরের উদ্ধৃতিটিতে জাগতিক সামগ্রী যে পরকালের পথে বাধাস্বরূপ তা অতি সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে: **'ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া**

আওলাদুকুম ফিতনাহ। ওয়াল্লাহু ইনদাহু আজরুন আযীম।'
অর্থাৎ 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষামাত্র আর তিনিই আল্লাহ্–যার কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।' *(সূরা আত তাগাবুন: ১৬)*।
হাসন রাজার গানে আমরা শুনতে পাই এরই প্রতিধ্বনি

'স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ী পুত্র হইল খিল,
কেমনে করিবায় হাসন বন্ধুর সনে মিল।"

১২০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে বাংলা কবিতার মধ্যযুগ বলা হয়। প্রথম দুইশ' বছর 'আদি-মধ্যযুগ' ও পরের চারশ' বছর অন্ত-মধ্যযুগ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।
আদি মধ্যযুগের একটি পঙক্তি:

'কে না বাঁশি বায়ে বরাই
কালিনি নৈকূলে।'

অর্থাৎ: (রাধা তার সখি বরাইকে জিজ্ঞাসা করছে) বরাই! কালিন্দী নদীর তীরে কে বাঁশি বাজাচ্ছে?
রাধাকৃষ্ণের মিলনাকাঙ্ক্ষাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের প্রতীক হিসেবে দেখা যায়। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলিত হবার ঐকান্তিক আগ্রহই এই কবিতার উপজীব্য। তাছাড়া প্রকৃতির আবাহন ও এতে বাঙালির মন-মানসের প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে অন্ত-মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লিখনীতে–'বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়/ প্রচণ্ড তপন তাপ তনু নাহি সয়,/ চন্দনাদি তৈল দিব হইয়া সহচরী/ শ্যামলা গামছা দেব সুবাতাস করি।'
আদি-মধ্যযুগ ও অন্ত-মধ্যযুগের মিলনকালকে যুগসন্ধিক্ষণ বলা হয়। সে সময়কার কাব্যে সমসাময়িক বাংলার আত্মজ অবস্থার কথা বিমূর্ত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সে সময়কার উল্লেখযোগ্য কবি। তাছাড়া আধুনিককালের কবিদের লেখায়ও পাওয়া যায় বাঙালির পরিচয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা দেখতে পাই সুর-অসুরের চিরকালীন দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ।
এদেশে প্রচলিত ধর্মগুলোর আনুষ্ঠানিকতায় বিভিন্ন লোকায়ত উপাদানের মিশ্রণের বিষয়টি লেখক ও গবেষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাঁর 'বাংলাদেশের উৎসব' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে কারো-কারো দ্বিমত থাকতে পারে। তবে তাঁর গবেষণা কর্মটিকে একবারে উপেক্ষা করা বোধ করি কারও পক্ষেই সম্ভব হবে না। তিনি লিখেছেন:
"বর্তমান গ্রন্থে যে সব উৎসব আলোচিত হয়েছে মূলত তা যুক্ত ধর্মের সঙ্গে। কিন্তু একেবারে মূলে পৌঁছলে দেখা যাবে, ধর্মীয় কারণেই শুধু এগুলি বিকশিত হয় নি। একসময় এগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা...।
বাঙালি ধার্মিক ছিল বটে, তবে খুব কম সময়েই ধর্মের কারণে তারা উন্মত্ততা দেখিয়েছে। তাদের ধর্মে এবং উৎসবে এত লোকায়ত উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যে, যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা জেগেছে, একে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। আলোচিত উৎসবগুলির এই হচ্ছে ইতিবাচক দিক।"
বিভিন্নতার মাঝে ঐক্যের অনুসন্ধান আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। তাই কবির মুখে শুনি: 'নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/ জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত।' অল্প কিছুদিন আগেও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে যখন সারা বিশ্ব মুখর ছিল–তার বহুকাল পূর্বেই বাঙালির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল:

"কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা।"

১৯৭১ সাল। আমাদের মুক্তির সংগ্রামের সবচেয়ে কাছের ইতিহাস। এ ছিল প্রকৃত অর্থে বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। রংধনুর দেশ এই বাংলাদেশ। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্যই সেদিন শহীদ হয়েছিল ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ, সম্ভ্রম হারিয়েছিল দুই লক্ষ মা বোন, শরণার্থী হয়েছিল এক কোটিরও বেশি লোক। শুধুমাত্র সম্মান নিয়ে বাঁচার জন্য, নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য এবং দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সেদিন উচ্চকিত হয়েছিল:

- 'তোমার আমার ঠিকানা
  পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'
- 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'
- 'জয় বাংলা বাংলার জয়'
- 'বাংলার হিন্দু, বাংলার মুসলিম, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান আমরা সবাই বাঙালি।'

কিন্তু হঠাৎ ১৯৮৮ সনে আমরা দেখতে পেলাম 'রাষ্ট্রধর্ম' নামের এক অদ্ভুত আবিষ্কার। এদেশের সচেতন বুদ্ধিজীবি মহল, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ ও এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ সেদিন আওয়াজ তুলেছিল:

'যার ধর্ম তার নিজের কাছে
এতে রাষ্ট্রের কী বলার আছে।'

পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদে যেখানে সমস্ত ধর্মের অনুসারীদেরকে মদীনা রাষ্ট্রের এক উম্মাহ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' নামক এই উদ্ভট আবিষ্কার কতটুকু ধর্মসংগত–তা নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.) বাংলাদেশের আহমদীদের উদ্দেশ্যে সরাসরি সম্প্রচারিত এক ভাষণে বলেন, ...আপনারা যদি পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগই না করতে পারেন তবে পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার মাঝে বিশেষত্বের কী আছে?
কম-বেশি সব যুগেই ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধে গিয়ে জনমত উপেক্ষা করে যুগে-যুগেই ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। তাই শান্তির ধর্ম ইসলাম আমাদের সামনে পরিত্রাণ, পারস্পরিক সহাবস্থান ও মানুষের প্রতি ভালবাসার যে অনিন্দ্যসুন্দর ও বিমল শিক্ষা উপস্থাপন করেছে তা এই সন্দর্ভে আলোচনার দাবি রাখে। কুরআন-এর শিক্ষা আমাদের সামনে এমন একটি দিগন্তের উন্মোচন করে–যার সাথে আমরা অতি সহজে বাঙালির মন-মানসের সাযুজ্য খুঁজে পাই। তুলনামূলক বিশ্লেষণে আমরা যখন কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর শিক্ষাকে পরখ করি তখন আমাদের ঐতিহ্যের সাথে তা শতভাগ মিলে যেতে দেখি।
পারলৌকিক মুক্তির বিষয়টি কখনও কোন ধর্মের একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না। কুরআন-এর শিক্ষা হল:
'ইন্নাল্লাযীনা আমানূ ওয়াল্লাযীনা হাদূ, ওয়াস সাবিউনা ওয়ান্‌নাসারা মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়া আমিলা সালিহান; ফালা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহযানূন।' *(সূরা আল মায়েদা: ৭০)*।
অর্থ: নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র উপর) এবং যারা ইহুদী হয়েছে তারা এবং সাবীগণ এবং খ্রিস্টানগণ–যে কেউ আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
'ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরুবিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতা ই যিল কুরবা। ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহ্‌শা-ই ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগ-ই। ইয়া-ইযুকুম লা-আল্লাকুম তাযাক্কারুন।'
(সূরা আন-নাহ্‌ল: ৯১)।
অর্থাৎ আল্লাহ নিশ্চয়ই সুবিচার ও উপকার সাধন করার ও আত্মীয়-স্বজনকে (দান করার মত অন্য লোকদেরও) দান করার আদেশ দিচ্ছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দকাজ এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ(সা.) বলেন,

◆'কে আল্লাহর সর্বাধিক অনুগ্রহভাজন? যার নিকট আল্লাহর সৃষ্টি জীবগণ সর্বাধিক উপকার পায়।'

◆'মানুষের মধ্যে তিনিই উত্তম, যার দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হয়।'

◆ 'আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি যে দয়ালু– আল্লাহ তার প্রতি দয়ালু; তাই ভাল বা মন্দ, সকল মানুষের প্রতি সদয় হবে। মন্দ লোকের প্রতি সদয় হওয়ার অর্থ তাকে মন্দ হতে বিরত করা, এতে বেহেশতের বাসিন্দারা তোমার প্রতি সদয় হন।'

◆ 'খাঁটি মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত হতে মানবজাতি নিরাপদ, আর মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কর্ম হতে দূরে সরে যায়।'

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা ইসলাম ধর্মের মানবিকতার এমন এক উদাহরণ দেখতে পাই– যা আর কোন ধর্ম উপস্থাপন করতে পারে নি। 'হুকুকুল্লাহ্' (আল্লাহর হক) ও 'হুকুকুল ইবাদ' (সৃষ্টির হক) আদায় করা ইসলাম ধর্মের সকল শিক্ষার মূল বা সার-সংক্ষেপ। শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বলেন:

'সমগ্র মানবজাতির জন্য সহানুভূতি প্রদর্শন আমাদের নীতি। যদি কোন প্রতিবেশী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগে, আর সে তা নির্বাপিত করতে সচেষ্ট না হয়, তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার কোন শিষ্য যদি দেখে, কোন খ্রিস্টানকে কেউ হত্যা করতে চায়, আর সে যদি তা প্রতিরোধ না করে, তাহলে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।'

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্প সম্পর্কে কবি নজরুল বলেছেন:

'হিন্দুত্ব এবং মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায়। কিন্তু তাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাঁধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পাণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। অবতার পয়গম্বর কেউ বলেন নি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি–আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমি মানুষের জন্য এসেছি, আলোর মত সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর; মুহম্মদের ভক্তরা বললে, মুহাম্মদ মুসলমানদের, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রীষ্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহাম্মদ-খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তি নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনও ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে।' *(রুদ্র মঙ্গল, রচনাবলি ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৭০৭)*।

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) হিন্দু- মুসলানদের ঐক্যের মাঝেই যে জাতীয় উন্নতি নিহিত তা তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুই দিন আগে রচিত পয়গামে সুলাহ্ পুস্তিকায় বলেন:

'হিন্দু এবং মুসলমানের ভাগ্য এখন একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। একের উপর বিপদ আসলে অন্যেও এর অংশীদার হয়ে যাবে। আর যদি এক জাতি অন্য জাতিকে শুধুমাত্র নিজের অহংকার ও আত্মম্ভরিতার দরুন লাঞ্ছিত করতে চায় তাহলে সেই জাতিও লাঞ্ছনার কালিমা হতে রেহাই পাবে না। আর যদি কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি হতে বঞ্চিত করে–তাহলে এর ক্ষতি তাকেও ভোগ করতে হবে। তোমাদের দুই জাতির মধ্যে যে কেউ অন্য জাতির ধ্বংসের চিন্তা করে –সে ঐ ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি কোন গাছের শাখায় বসে এর গোড়া কাটে।

একই কথা কবি নজরুল বলেছেন এইভাবে:

'মোরা একই বৃন্তে
দুইটি কুসুম/ হিন্দু-মুসলমান
হিন্দু তার নয়ন মণি/
মুসলিম তার প্রাণ।'

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ(রাহে.) আমাদের সবার জন্য একটি স্লোগান দিয়েছেন:

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

অর্থাৎ **ভালবাসা সবার তরে,**
ঘৃণা নয় কারো 'পরে।

আহমদী কবি মরহুম সলিমুল্লাহ্ সাহেব লিখেন: "এই পৃথিবীর যেকোন দেশেতে মোদের আঞ্জুমান/
যেখানেই যাবে দেখিতে পাইবে মানবের সম্মান।"

যুগ-ইমাম যখন আবির্ভূত হন তখন আধ্যাত্মিক কিরণমালার বিচ্ছুরণ এর আশেপাশে থাকা লোকদের উপরও ক্রিয়াশীল হয়।

তাই শেষ যুগে আবির্ভূত হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সমসাময়িককালের মুক্তবুদ্ধির চর্চায় লিপ্ত বিশিষ্টজনদের কথামালায়ও ঐশী আগ্রহের বিষয়াবলি বিধৃত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বর্তমানে সারা বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার যে বাণী প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত তারই আরেকটি উদাহরণ হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর রচনা থেকে তুলে ধরছি:

'হে শ্রোতাবৃন্দ! আমাদের মধ্যে শত-শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা সকলে হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই– বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে একজোটভুক্ত। এভাবে আমরা সবাই মানুষ হিসাবে এক জাতি। অর্থাৎ আমরা সবাই মানুষ বলে অভিহিত। তদ্রূপ একই দেশের অধিবাসী হিসাবে আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী। অতএব, আমাদের কর্তব্য, বিমলচিত্ত ও শুভেচ্ছাসহ পরস্পর বন্ধু হওয়া, এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিপদাপদে একে অন্যের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করা যেন আমরা একে অন্যের দেহের অংশ হয়ে যাই। হে আমার দেশবাসী! সেই ধর্ম ধর্মই নয়, যে ধর্মের মধ্যে সার্বজনীন সহানুভূতির শিক্ষা নেই এবং সেই মানুষ মানুষ নয়– যার মধ্যে সহানুভূতি নেই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে তারতম্য করেন নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সমস্ত মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতা আর্যাবর্ত্তের আদিম জাতিগুলিকে দেয়া হয়েছিল–ঐ সমস্ত শক্তিই আরব, পারস্য, সিরিয়া, চীন ও জাপানের অধিবাসীদের এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসমূহকেও দেয়া হয়েছে। সবার জন্যই আল্লাহর ভূমি শয্যাস্বরূপ এবং

'সমগ্র মানবজাতির জন্য সহানুভূতি প্রদর্শন আমাদের নীতি। যদি কোন প্রতিবেশী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগে, আর সে তা নির্বাপিত করতে সচেষ্ট না হয়, তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার কোন শিষ্য যদি দেখে, কোন খ্রিস্টানকে কেউ হত্যা করতে চায়, আর সে যদি তা প্রতিরোধ না করে, তাহলে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।'

চন্দ্র-সূর্য ও অন্যান্য বহু গ্রহ-নক্ষত্র উজ্জ্বল প্রদীপরূপে কাজ করছে এবং বিবিধ সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সৃষ্ট পদার্থ, যথা: শাক-সবজি, ফলমূল ও ঔষধ ইত্যাদি হতে সকল জাতিই সমভাবে উপকৃত হচ্ছে। সুতরাং আমরাও যেন মানবজাতির প্রতি সমভাবে সৌজন্য ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করি এবং অনুদার ও সংকীর্ণচিত্ত না হই। বস্তুত ঐশী প্রকৃতি আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে।' *(পয়গামে সুলাহ্)*।

আমাদেরকে প্রদত্ত শক্তিসমূহের যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরাও হতে পারি বিশ্বের বিস্ময়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যথাসময়ে যথাযথ কাজটি করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। পথ যতই বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল হোক না কেন, একমাত্র লক্ষ্য অর্জনে একাগ্রতা ও পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন আমাদেরকে এনে দিবে সাফল্যের রাজমুকুট।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ারে কবি নজরুল লিখেন:

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার
দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।"

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)। আধুনিক বাংলা কাব্যের জগতে মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই বিশিষ্টতার দাবিদার। 'মহাশ্মশান' শীর্ষক মহাকাব্যের জন্য তিনি মহাকবি কায়কোবাদ নামে আখ্যায়িত হন। এই কাব্যে মারাঠা তরুণী হিরণ বালার কণ্ঠে শোনা যায়:

"কি পার্থক্য প্রেমের নিকটে
হিন্দু-মুসলমানে নাথ। নিজে
প্রেমময় জগদীশ, প্রেম শ্রেষ্ঠ সর্বধর্ম হতে।
হিন্দু-মুসলমান করে সৃজিছে কি বিধি
জীবশ্রেষ্ঠ মানবেরে, তোমারে আমারে।
আমরা মানব মূর্খ পড়ি ভ্রান্তি ঘোরে
সৃজিয়াছি জাতিভেদ ধ্বংসের কারণ...।"

আরেক জায়গায় তিনি লিখেন:

"এস ভাই হিন্দু এস মুসলমান
আমরা দু'ভাই ভারত সন্তান
এস আজি সবে হয়ে এক প্রাণ
সেবি গো মায়ের চরণ দু'টি।"
(অমিয়ধারা কাব্য, কায়কোবাদ)

কবি নওশের আলী খান তাঁর শৈশব কুসুম কাব্যে লিখেন:

হিন্দু আর মুসলমান/যেন সবে এক প্রাণ
মিশিয়াছে ভ্রাতৃভাবে হয়ে বিমোহিত।"

কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) তার 'জাতীয় ফোয়ারা' কাব্যগ্রন্থে লিখেন:

"এক দেশে বাস হিন্দু-মুসলমান
শিরে বহে এক রাজার বিধান,
হিন্দুরা উন্নত, তোরা অবনত
কেন হলি তাহা ভাব কি কখন?"

জীবনান্তে শেষ শয্যায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের ঠিকানা হবে একই স্থানে–এই সত্য অত্যন্ত সংস্কারমুক্ত মুক্তবুদ্ধির আলোকে কবি আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী প্রকাশ করেছেন এভাবে:

নাই ত বিভিন্ন ভেদ, কাফের মমিন
এইখানে কৃষ্ণ জিষ্ণু, এইখানে রাম,
এইখানে ছোলেমান এইখানে দারা
এইখানে ইসা মুসা শুয়েছেন তারা।"

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়:

'লা ইকরাহা ফিদ্দীন।'

অর্থাৎ: ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই।

সকল ধর্মের সকল নবী/অবতারদের সম্মান প্রদর্শন করা কুরআনের শিক্ষা। মহান আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহি। অর্থাৎ আল্লাহ রসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। প্রত্যেক ধর্মের নবী রসূলকে সম্মান করার মাঝেই শান্তির বীজ নিহিত। ঈমানে মুজমালে প্রত্যেক মুসলমানকে এই বলে সাক্ষ্য দিতে হয়:

'আমানতুবিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খায়রিহি ওয়াশাররিহি মিনাল্লাহি তা'লা ওয়াল বা'সি বাদাল মাউত।

এখানে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ, ফিরিশতা, প্রত্যেক ঐশী কিতাবসমূহ, প্রত্যেক নবী-রসূল-অবতার, পরকাল, ভাগ্য ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ওপর প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের নবী-রসূল-অবতারগণ পবিত্র এবং সত্য।

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) বলেন:

'হযরত মূসা(আ.) ও হযরত ঈসা(আ.) আর অন্য নবী রসূল সবাই যে পবিত্র মহাসম্মানিত ও খোদার মনোনীত মহাপুরুষ ছিলেন– একথার ঘোষণা করা আর এই স্বীকারোক্তি জগৎময় প্রচার করা আমি আমার জন্য একটি সৌভাগ্য বলে মনে করি। একইভাবে খোদা তা'লা যেসব সম্মানিত মনীষীদের মাধ্যমে বা পবিত্র পথ নির্দেশনা আর্যাবর্ত্তে অবতীর্ণ করেন আর পরবর্তীতে আগমনকারী আর্যদের যেসব পবিত্র বুযুর্গ ছিলেন যেমন রাজা রামচন্দ্র, ও শ্রীকৃষ্ণ–এরা সবাই পবিত্র মানুষ ছিলেন। যাদের প্রতি খোদার অনুগ্রহ সদা বিরাজমান... লক্ষ্য করে দেখ! এই শিক্ষা কত চমৎকার–যা শান্তি ও সৌহার্দ্যের ভিত্তি রচনা করে এবং সব জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করতে চায়। অর্থাৎ অন্যান্য জাতির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ কর।'

কবি নজরুল ইসলাম তার সাম্যবাদী কবিতায় গেয়েছেন সেই সাম্যের গান; গেয়েছেন মিলনের গান।

'যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।
কে তুমি? পার্সী? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বল আরো!
বন্ধু, যা-খুশি হও,
পেটেপিঠে, কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরান-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও, যত সখ
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানের কেন এ দর-কষাকষি?
পথে ফুটে তাজা ফুল!
...বন্ধু বলিনি ঝুট
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন
বুদ্ধ গয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সম-গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই

এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নাই।'

এই মিলন ঘটাতে গিয়ে কবিকে হতে হয়েছে যারপরনাই লাঞ্ছিত। অপ্রিয় হয়েছেন স্বার্থবাদী কুপমণ্ডুকদের। অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বাংলা কবিতার এই যুগন্ধর পুরুষ বলেন:

"কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দু'টোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।"

(অভিভাষণ নজরুল রচনাবলি, ৪র্থ খণ্ড বা/এ, পৃ. ৯১)।

বাঙালিদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এই বাণীটি আমাদেরকে আশান্বিত করে। ইতোপূর্বে বহুবার আমরা এর সত্যায়ন ও বাস্তবায়ন বহুরূপে দেখেছি। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আরও মহিমান্বিত আকারে ব্যাপকভাবে ভবিষ্যতেও স্বীয় পূর্ণতা দেখাতে থাকবে ইনশা'ল্লাহ্। ভবিষ্যদ্বাণীটি হল: "ইতোপূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যেসব আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে।"

অবশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীত বিতানে উল্লেখিত ২০ নম্বর গানটিকে হৃদয়ের আকুল আবেদন ও আবেগ ভরা প্রার্থনা হিসাবে পরম করুণাময় অপার অনুগ্রহশীল স্রষ্টার দরবারে উপস্থিত করছি। প্রসংগত উল্লেখ্য, সমস্ত ঐশ্বর্যের আধারকে সংস্কৃত ভাষায় 'ভগ' বলা হয়। অর্থাৎ 'ভগ' শব্দটি আরবী ভাষার 'আসমাউল হুসনা'র প্রতিশব্দ। 'ভগ' হল যার মধ্যে সমস্ত সুন্দরতম নামসমূহ এর পরিপূর্ণ গুণসহ বিদ্যমান। যার বিত্ত আছে তিনি যেমন বিত্তবান যার গুণ আছে তিনি যেমন গুণবান একইভাবে যিনি 'ভগ'-এর অধিকারী তিনিই ভগবান বা আল্লাহ্। সে অপার অনুগ্রহশীল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে আমাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা ও দোয়া :

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক হে ভগবান॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক হে ভগবান॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান॥"
(আমীন)

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ

১. মোহতরমা রাশিদা বেগম (প্রে.)	১৯৪৮ খ্রি.
২. মোহতরমা মিসেস তকিউদ্দিন (প্রে.)	-
৩. মোহতরমা আপা নাসিরা (প্রে.)	-
৪. মোহতরমা হুরুন নেসা (প্রে.)	-
৫. মোহতরমা মোসলেমা সালমা (প্রে.)	১৯৭১ খ্রি.
৬. মোহতরমা মাসুদা সামাদ (প্রে.)	১৯৭২-১৯৯৪ খ্রি.
৭. মোহতরমা মাসুদা সামাদ (সদর)	১৯৯৪-১৯৯৭ খ্রি.
৮. মোহতরমা মাকসুদা রহমান (সদর)	১৯৯৭-২০০৪ খ্রি.
৯. মোহতরমা হোসনে আরা তাসাদ্দক (সদর)	২০০৪-২০০৫ খ্রি.
১০. মোহতরমা ইশরাত জাহান (সদর)	২০০৫-২০১২ খ্রি.
১১. মোহতরমা রওশন জাহান (সদর)	২০১২- খ্রি.

বর্তমান আমেলার সদস্যাগণ

রওশন জাহান (সদর)
আমাতুল কাইয়ুম (নায়েব সদর ১)
মরিয়ম সুলতানা (নায়েব সদর ২)
নুরুন্নাহার মাকসুদ (নায়েব সদর ৩)
রেহানা খায়ের (জে. সেক্রেটারি)
সৈয়দা সাদিয়া শরীফ (সহ-জে. সেক্রেটারি)
ফারজানা রফিক রিফাত (সহ-জে. সেক্রেটারি)
আমাতুল হাই রুবাবা (সে. তাজনীদ)
আতিয়াতুল অহিদ (সে. তালীম)
তানজিনা আক্তার বেলি (সে. তরবিয়ত)
সেহলা সুরাইয়া (সে. তবলীগ)
স্নিগ্ধা জাহান (সে. নও মোবাইন)
আবিদা সুলতানা (সে. নাসেরাত)
আঁখি নুর চন্দন (সে. খেদমতে খালক)
ফাতেমা নুসরাত (সে. সেহতে জিসমানী)
নার্গিস ইসলাম (সে. সানাত দাস্তকারী)
আলিয়া সিদ্দীকা (সে. জিয়াফত)
মাহমুদা আক্তার (সে. ইশায়াত)
কামরুন্নেসা (সে. মাল)
সুমাইয়া শিমু (সে. তা. জা. ও. জা)
মোবারাকা জাহান (ওডিটর)
সেলিনা তবশীর (প্রেসিডেন্ট ঢাকা)
মাকসুদা রহমান (সম্মানিতা সদস্যা)
সাদেকা হক (সম্মানিতা সদস্যা)
সাবিহা আমজাদ (সম্মানিতা সদস্যা)
খোরশেদ জাহান (মুয়াভিন সদর ১)
নিগার সুলতানা (মুয়াভিন সদর ২)
ফারজানা শহীদ (মুয়াভিন সদর ৩)
শারমিন সুলতানা (মুয়াভিন সদর ৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর পুণ্যভূমি কাদিয়ানে

মারুফ আহমদ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা(সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী(আ.)-এর পুণ্যভূমি দারুল আমান তথা কাদিয়ান দেখার, কাদিয়ানের আহমদীদের সাথে সাক্ষাতসহ সেখানকার সার্বিক বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানার আগ্রহ সর্বদা আমার হৃদয়ে সুপ্ত ছিল। কাদিয়ান যাবার সর্বাত্মক চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঝামেলা ও অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মহান আল্লাহ এই অতিশয় নগণ্য বান্দাকে যেভাবে কাদিয়ান সফর করার সৌভাগ্য দান করেছেন সেটা কখনও কল্পনাও করি নি, আশাও করি নি। তাই আল্লাহর দরবারে হাজারো শুকরিয়া।

কিছুদিন পূর্বে খাকসার চিকিৎসা উপলক্ষে সহধর্মিনী তাহেরা নাসীম (জনাব আতাউর রহমান সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা এবং আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের দৌহিত্রী)-সহ দিল্লীতে যাই এবং সেখান থেকে কাদিয়ান সফর করার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করি। কাকতালীয়ভাবে কাদিয়ানে আমাদের সাথে মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব পরিবারসহ সফরে ছিলেন। আমাদের কাদিয়ানে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ও আশিসমণ্ডিত স্থানসমূহে দোয়া করা, সেখান থেকে একটি আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করা এবং তারপর দিল্লীতে এসে নিজের চিকিৎসা করানো।

আমার মনে হয়, বাংলাদেশের অনেক আহমদী ভাই-বোন কাদিয়ান সম্পর্কে জানার আগ্রহ পোষণ করে থাকেন। তাই এ সংক্রান্ত কিছু কথা আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্যই আজকের এই লেখার অবতারণা। অধমের মতে, ঈমানের দৃঢ়তা ও প্রভূত উন্নতির জন্য কাদিয়ান যাওয়া আবশ্যক। আর এটিও স্বচক্ষে দর্শন করা আবশ্যক, কেমন একটি গণ্ডগ্রাম থেকে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ(আ.)-এর ধ্বনি সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে! সেখানে দেখা যাবে। আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) এবং তাঁর জামা'তকে সর্বদা সাহায্য করে চলেছেন।

কাদিয়ান গমন:

৩০শে আগস্ট ভোরে দিল্লী থেকে রওনা দেই। দুপুরে অমৃতসর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছি। স্টেশন থেকে রিক্সাযোগে বাসস্ট্যাণ্ড এবং সেখান থেকে বাসযোগে বাটালায় পৌঁছি। বাটালা নেমে বাসযোগে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুণ্যভূমি কাদিয়ান পৌঁছি। কাদিয়ান বাসস্ট্যাণ্ড থেকে রিক্সাযোগে মসজিদে মোবারক হয়ে লঙ্গরখানায় যাই। তখন আনুমানিক বিকাল ৪.০০ টা। লঙ্গরখানায় বেশ কয়েকজনের সাথে প্রথমেই পরিচয় হল। এর মধ্য থেকে লঙ্গরখানায় দায়িত্বরত দুইজন বাঙালি ভ্রাতাও ছিলেন। প্রথমজন হলেন, জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এবং অপরজন হলেন জনাব মাহফুজুর রহমান সাহেব। আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আমাদের জন্য গেস্ট হাউজের রুম ও লঙ্গরখানার কার্ড-এর ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের জন্য যে রুমের ব্যবস্থা করা হয় এর পাশের রুমেই মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব সপরিবারে উঠেছিলেন। লঙ্গরখানায় রিপোর্ট করার সাথে-সাথেই দুপুরের খাবার এসে গেল– যা আমরা কল্পনাও করি নি। গরম-গরম খাবার খেতে ভালই লেগেছে কিন্তু আমরা অল্পই খেতে পেরেছি। কারণ ইতোপূর্বে আমরা বাটালা স্টেশনে নেমে হালকা খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম।

কাদিয়ানের ভৌগলিক অবস্থান ও অবকাঠামো:

কাদিয়ান হল ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম– যেখানে ১৮৩৫ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন আখেরী যুগের সংস্কারক সৈয়্যদেনা হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী(আ.)। পাঞ্জাব প্রদেশটি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর আবির্ভাবের সময় এই প্রদেশটি অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার কাদিয়ান ছিল একটি গণ্ডগ্রাম যাকে বাইরের লোকজন চিনত না বা জানত না। যেখানে ছিল না কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা, ছিল না বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। চোখে পড়ার মত বাড়ি-ঘরও খুব একটা ছিল না। কিন্তু বর্তমানের কাদিয়ান গ্রাম ও শহরের সংমিশ্রণে গঠিত একটি জনপদ। কাদিয়ানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট, ট্রেন লাইন, হাট-বাজার, বিপণী বিতান, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, অট্টালিকা সবই রয়েছে। কাদিয়ান এলাকা দিয়ে কার, বাস, ট্রেন ইত্যাদি সবই চলাচল করে। বর্তমানে এই জনপদে আধুনিকতার অপূর্ব ছোঁয়া লেগেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবস্থান ও কার্যক্রমই এর বড় কারণ।

কাদিয়ানের অধিবাসী:

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশটি শিখ অধ্যুষিত। পাশাপাশি হিন্দুও রয়েছে অনেক। সেখানে মুসলমান বলতে প্রধানত আহমদীদেরই বুঝায়। অন্য কোন মুসলমান বলতে গেলে সেখানে নেই। কাদিয়ানের জনসংখ্যা বিশ সহস্রাধিক। এর এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে আহমদী মুসলমান (প্রায় পাঁচ হাজার), অর্ধেকের মত রয়েছে শিখ এবং বাকি এক চতুর্থাংশ হিন্দু। কোন জনগোষ্ঠীর প্রভাব কেবল জনসংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। ঐ এলাকায় এখনও আহমদীদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ১৯৪৭ সালে হিজরতের পূর্বে এখানে হাজার-হাজার আহমদী বসবাস করতেন। কাদিয়ানের প্রায় পুরো এলাকাই ছিল আহমদীদের। যদি হিজরত না হত হয়তবা কাদিয়ান এবং তার চারপাশে শুধু আহমদীদেরই বসতি থাকত। কিন্তু আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-কে হিজরতের সংবাদ আগে থেকেই দিয়েছিলেন। হিজরতকালে কাদিয়ানে রয়ে যাওয়া ৩১৩ জন দরবেশের স্থলে ধীরে-ধীরে আহমদীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

কাদিয়ানের শিখ ও হিন্দুদের সাথে আহমদীদের যথেষ্ট আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আহমদীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দাওয়াত করেন। তারাও তাদের অনুষ্ঠানে আহমদীয়া জামা'তের কর্মকর্তাদের দাওয়াত করেন। আমি নিজে অনেক শিখকে জামা'তের কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে দেখেছি। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বেশির ভাগ শিখ সদস্য রয়েছেন যারা প্রতিনিয়ত জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পাহারা দিয়ে থাকেন।

বাঙালি দরবেশ মোহতরম তৈয়ব আলী সাহেবের সাথে সাক্ষাত:

কাদিয়ানে বেঁচে থাকা একমাত্র বাঙালি দরবেশ জনাব তৈয়ব আলী সাহেবের খোঁজ নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি মসজিদে মোবারকের পাশেই একটি দোকান চালিয়ে

জীবন নির্বাহ করেন। ৮০ (আশি) উর্ধ্ব বয়স নিয়ে এখনও চলাফেরা করতে পারেন। বয়স তাঁকে অনেকটাই দুর্বল করে ফেলেছে। স্মরণশক্তিও তাঁর আগের মত নেই। তবুও তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করেছি। কাদিয়ানের অতীত ও বর্তমান নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। তাঁর যতটুকু মনে আছে এর মধ্য থেকে অনেক কিছুই তিনি সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

১৯৪৭ সালে কাদিয়ানের অবস্থা ও হিজরত:

১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের সময় ভারত উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। যে এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত সেখানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও হত্যা এবং যে এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত সেখানে হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। যদিও শিখরা হিন্দুদের সাথে যোগ দিয়েছিল তবুও এই দাঙ্গা মূলত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নামেই পরিচিত। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের একটি কূট অভিপ্রায় ছিল– কাদিয়ানের আহমদী মুসলমানসহ সকল মুসলমানদের হত্যা করা এবং তাদের স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করে সেখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা। সেসময় কাদিয়ান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ ভারতের অসংখ্য স্থানে নিরীহ-নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করা হয়। এমতাবস্থায় তৎকালীন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ(রা.) কাদিয়ান ও পার্শ্ববর্তী জামা'তসমূহের আহমদীদের পাকিস্তান ও সুবিধামত স্থানে হিজরত করার পরামর্শ দেন। তৎকালীন কাদিয়ানের আহমদীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'কারা-কারা কাদিয়ানের হেফাযতের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত?'। তখন হাজার-হাজার আহমদী তাদের জীবন দিয়ে হলেও কাদিয়ানের হেফাযত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কিন্তু হুযূর(রা.) এদের মধ্য থেকে ৩১৩ জন আহমদী ভ্রাতাকে কাদিয়ানের হেফাযতের জন্য রেখে, কাদিয়ান ও পার্শ্ববর্তী জামা'তসমূহের প্রায় ৭০ (সত্তর) হাজার আহমদী সদস্য-সদস্যাকে প্রথমত পাকিস্তানের লাহোর ও পরবর্তীতে চিনিওট, আহমদনগর ও পরিশেষে রাবওয়ায় হিজরতের ব্যবস্থা করেন। প্রাথমিক অবস্থায় রাবওয়া তখন ছিল একটি মরুভূমি, অন্যান্য এলাকা থেকে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন। সেখানে পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.) ও তখনকার বুযুর্গ আহমদীদের ঐকান্তিক দোয়া ও চেষ্টার ফলে এখনকার রাবওয়া পাকিস্তানের অন্যতম একটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়েছে।

দরবেশদের অতুলনীয় কুরবানী:

সেই ৩১৩ জন আহমদী ভ্রাতা (দরবেশ) তাঁদের জীবনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে, পরিবার-পরিজনের কথা না ভেবে কাদিয়ানের হেফাযত করেছেন। তাঁদের সেই সময়কার ত্যাগের ফসল আজকের কাদিয়ান। আল্লাহ তা'লা সকল দরবেশ এবং তাঁদের বংশধরদের উত্তম পুরস্কারসহ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি দান করুন এবং দরবেশদের মধ্য থেকে যারা ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন তাঁদেরকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন। (আমীন)

দারুল মসীহ:

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর নিজস্ব বাড়িকে 'দারুল মসীহ' বলা হয়। উক্ত বাড়িটি প্রায় একশ' পঞ্চাশ বছরের পুরাতন হলেও এখনও প্রায় অক্ষতই রয়ে গেছে। এই বাড়িটি আজও জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য বহন করছে। এই বাড়িটি দেখলে তখনকার পাঞ্জাবের জমিদার বাড়ি কেমন ছিল তা অনুমান করা যায়।

বায়তুদ্ দোয়া:

বায়তুদ্ দোয়া হল দোয়ার ঘর যা দারুল মসীহর অভ্যন্তরের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) ছোট্ট একটি কামরায় আল্লাহর দরবারে সর্বদা দোয়ায় মগ্ন থাকতেন। তিনি(আ.) এর নাম রাখেন 'বায়তুদ্ দোয়া'। এখানে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) ইসলামের উন্নতি, বিভিন্ন ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব-বিজয়, নিজের ও বংশধরসহ সকল আহমদী/অ-আহমদীর জন্য দোয়া করে গেছেন। এখানে আল্লাহ তা'লার সাথে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর আধ্যাত্মিক ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। আল্লাহ তা'লা তাঁর(আ.) দোয়া ও উচ্চ মনোবাসনাসমূহ কবুল করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। বর্তমানে কাদিয়ানের আহমদীগণ সবসময় বায়তুদ্ দোয়ায় দোয়া করতে যান এবং আল্লাহ তা'লার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ফরিয়াদ করেন। বিভিন্ন সময়ে ভারতের অন্যান্য জামা'তের ও বিভিন্ন দেশের আহমদীগণও বায়তুদ্ দোয়ায় দোয়া করতে আসেন। আমরাও প্রতিদিন কয়েকবার করে বায়তুদ্ দোয়ায় দোয়া করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আল্লাহ তা'লা যেন সে দোয়াগুলো কবুল করে নেন।

মসজিদ:

মসজিদে মোবারক, মসজিদে আকসা, মসজিদে নূরসহ কাদিয়ানের অভ্যন্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ছোট-বড় ১৫টি মসজিদ রয়েছে। প্রত্যেকটি মসজিদেই দৈনিক পাঁচ বেলা বাজামাত নামায আদায় করা হয়। উল্লেখ্য, কাদিয়ান এলাকা বেশ বড়, একটি মসজিদ থেকে অন্য মসজিদের দূরত্বও অনেক; শতভাগ আহমদী সদস্য-সদস্যা যাতে সময় নষ্ট না করে দ্রুত সময়ের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামাত আদায় করতে পারেন এজন্যই এত বেশি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। শুক্রবার কাদিয়ানের মুসল্লিরা মসজিদে আকসা ও মসজিদে মোবারক উভয় স্থানে জুমুআ'র নামায আদায় করে থাকেন।

বেহেশতি মাকবারা:

ওসিয়তকারীদের মৃত্যুর পর সমাহিত করার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) আল্লাহর নির্দেশে একটি কবরস্থান নির্মাণ করেছিলেন। একে 'বেহেশতি মাকবারা' বলা হয়। এখানে একটি নির্দিষ্ট স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.), হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল(রা.)-সহ খান্দানে মসীহ্ মাওউদের অনেক সদস্য-সদস্যা সমাহিত আছেন। এছাড়া কবরের অন্যান্য অংশে সাহাবী, দরবেশ,

বিভিন্ন বুযুর্গদের কবর বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য লোক বেহেশতি মাকবারা যিয়ারত করে থাকেন।

দপ্তরের কাজ:

জামা'তের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে কাদিয়ানের বেশ কয়েকটি স্থানে জামা'তী কার্যালয় বা দপ্তর রয়েছে। বেশ বড় ও চমৎকার একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে– যেখানে বেশির ভাগ দপ্তর অবস্থিত। এই অধম নাযেরে আ'লার দপ্তর, নাযের বায়তুল মাল-আমদ্, নাযের নশর ও ইশায়াতসহ আরও কয়েকটি দপ্তরে গিয়েছি। তাদের সকলের কাছে দোয়া চেয়েছি।

মেহমানখানা:

বৈদেশিক মেহমানদের জন্য সারায়ে তাহের ও সারায়ে ওয়াসিমসহ আরও অনেক মেহমানখানা তৈরী করা হয়েছে। অনেক দেশ তাদের নিজস্ব খরচে মেহমানখানা তৈরী করেছে যাতে তারা জলসা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় থাকতে পারেন এবং থাকার ক্ষেত্রে যাতে তাদের কোন

সমস্যা না হয়।

জামেয়া আহমদীয়াঃ

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) তাঁর জীবদ্দশায় ১৯০৬ সালে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেখতে পেলেন, জামা'তের অনেক আলেম ও বুযুর্গ আহমদী সদস্য দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে জামা'তের জ্ঞানী-গুণী ও বুযুর্গ আহমদী সদস্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। তখনই তিনি(আ.) জামা'তের আলেম ও বুযুর্গ আহমদী সদস্য তৈরী এবং জামা'তের খেদমতসহ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে উপযুক্ত সেবক তৈরী করতে জামেয়া আহমদীয়ার ভিত্তি রাখেন। তখন থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি হাজার-হাজার ছাত্র তৈরী করে জামা'তের খেদমতে নিয়োজিত করেছে এবং অদ্যাবধি সে ধারা অব্যাহত আছে। তারা আহমদীয়া জামা'তের প্রচারক হিসেবে পরিচিত। তাদেরকে সদর মুরব্বী বা মোবাল্লেগও বলা হয়। তারা তাদের জীবনকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন মূলত ইসলাম এবং আহমদীয়াতের সেবার জন্য।

সেইসাথে তারা সমগ্র বিশ্বে ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থেকে ইসলামের বিশ্ব বিজয়কে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। কাদিয়ান-রাবওয়া ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কাদিয়ানের বর্তমান জামেয়া আহমদীয়ার জন্য একটি বিশাল আকারের সুন্দর ও মনোরম বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে। বাইরে থেকে এই বিল্ডিং দেখলে হতবাক হতে হয়। আমরা এই বিল্ডিংয়ের বাইরে এবং ভিতরেও গিয়েছি। বর্তমান ছাত্রদের কয়েকজনের সাথে কথা বলে বুঝলাম তাদের ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ এবং ইসলামের সেবার জন্য আগ্রহও রয়েছে যথেষ্ট। তারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের আহমদীদের খোঁজ-খবরও নিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় আহমদীয়া লাইব্রেরিঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একটি সুন্দর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিও রয়েছে যেটি আহমদীয়া মরকযীয়া লাইব্রেরি নামে পরিচিত। এখানে পড়াশুনার পাশাপাশি মাল্টি-মিডিয়া সমৃদ্ধ সুসজ্জিত একটি সেমিনার কক্ষ রয়েছে। খাকসার সময় স্বল্পতার কারণে এ সম্পর্কে পুরো তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি।

স্কুল ও কলেজঃ

তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল, ওয়াকফে নও স্কুল এবং নুসরাত জাহাঁ গার্লস কলেজ আহমদীয়া জামা'তের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে সকল ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীই লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

কাদিয়ানের আহমদীদের আধ্যাত্মিকতাঃ

কাদিয়ানের আহমদীদের সাথে কিছুদিন থাকলে বুঝা যাবে, তাঁদের আধ্যাত্মিকতার মান কতটুকু। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর শিক্ষাকে একশ' বছর পরও তারা সুন্দরভাবে ধারণ করে আছেন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ(সা.) এবং হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-কে কতটুকু ভালবাসেন তা সামনে থেকে না দেখলে পুরোপুরি বুঝা যাবে না। ইসলাম ও আহমদীয়াতের শিক্ষায় তারা পুরোপুরি শিক্ষিত এবং চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যেও তারা অনেক উন্নত। স্বল্প সময়ে তাঁদের আন্তরিকতা, ইবাদত, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, দোয়া, মানসিকতা, মনোবল, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ধর্মের সেবা, মানব প্রেম, ইসলাম প্রচার ও মেহমান নেওয়াজী দেখে আমি খুবই অভিভূত হয়েছি।

কাদিয়ানের আহমদী মহিলাদের পর্দাঃ

আমি পাঁচদিন কাদিয়ানে অবস্থানকালীন কোন আহমদী মহিলাকে পর্দাহীন অবস্থায় দেখি নি। পর্দা করেই তারা ঘরের বাইরে বের হন। এমনকি স্কুল/কলেজের আহমদী ছাত্রীরাও পর্দার বিষয়ে সচেতন। আহমদী মেয়েদের হেজাব বা পর্দা তাদেরকে কোন জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনে বাধাগ্রস্থ করে না। পর্দা ইসলাম তথা আহমদীয়াতের একটি বড় শিক্ষা। তাই এর প্রতি সজাগ ও সচেতন থাকা প্রত্যেক আহমদী মহিলার অবশ্য কর্তব্য।

জলসা ও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানাদিঃ

কাদিয়ানে সালানা জলসাসহ ইজতেমা, তালীম-তরবিয়তী ক্লাস, সিরাতুন্নবী(সা.) জলসা, বিভিন্ন ধরনের মিটিং ও জামা'তী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাদিয়ানের জলসায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার-হাজার আহমদী সদস্য-সদস্যা যোগদান করে থাকেন। উক্ত জলসার সময় কাদিয়ানের প্রায় সকল আহমদী সদস্য-সদস্যা সপ্তাহব্যাপী বা এরও অধিক সময় দিবারাত্র জলসার কাজে এবং মেহমানদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। মেহমানদের থাকার জন্য মেহমানখানাসমূহ (সংরক্ষিত), বিভিন্ন বাসা-বাড়ি, স্কুল, কলেজ, মসজিদ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এছাড়াও বেশ কিছু খোলা জায়গায় তাঁবু খাটানো হয়। পুরুষদের জন্য একটি এবং মহিলাদের জন্য আলাদা একটি সুসজ্জিত জলসাগাহ তৈরী করা হয়।

কাদিয়ানের সম্প্রসারণঃ

বর্তমানে কাদিয়ান এলাকার অর্ধেকের বেশি জায়গা ও স্থাপনা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিজস্ব সম্পত্তি। কাদিয়ানে আহমদীদের সংখ্যা দিন-দিন বেড়ে চলেছে। শিখদের মধ্যে অনেকেই তাদের বাড়ি-ঘর বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। অন্যদিকে আহমদীরাও কাদিয়ান এবং এর অদূরে জায়গা ক্রয় করে বাড়ি করছেন। জলসা করার জন্য জামা'তের পক্ষ থেকে একটি বড় জায়গা (প্রায় ৪০ বিঘা) ক্রয় করা হয়েছে। জায়গাটি ভবিষ্যতে আরও বড় আকৃতির করা হবে এবং পার্শ্ববর্তী জায়গাও ক্রয় করা সম্ভব হবে, ইনশা'ল্লাহ্। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, 'কাদিয়ান বিপাসা নদী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে'। এই বিপাসা নদী কাদিয়ান থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত। বাস্তবিক অর্থেই কাদিয়ান ধীরে-ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সবশেষে আহমদী ভাই-বোনদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে আপনারা (সম্ভব হলে বন্ধুবর্গসহ) সময়-সুযোগ করে হযরত হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুণ্যভূমি কাদিয়ান ঘুরে আসুন, পবিত্র স্থানগুলো দর্শন করে সেগুলোতে দোয়া করে আল্লাহ তা'লার অপার মহিমা স্বচক্ষে অবলোকন করুন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি দান করুন, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় ও সুদৃঢ় করুন এবং আমাদের সকল উন্নত ও নেক-বাসনা পূর্ণ করুন (আমীন)।

রাজশাহী শহরে
প্রথম আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণের নেপথ্যে
ঐশী সাহায্যের অভিজ্ঞতা

এম. আরিফ-উজ্-জামান

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা(সা.) বলেছেন, **"মাম্ বানা লিল্লাহি মাসজিদান সাগীরান আও কাবীরান বানাল্লাহু লাহু বায়তান ফিল জান্নাতে"** *(তিরমিযি, কিতাবুস সালাত)*। অর্থাৎ,'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এ জগতে ছোট বা বড় একটি মসজিদ নির্মাণ করে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন।' আর তাই মসজিদ নির্মাণের কাজে প্রত্যেক মুসলমানই নিজেকে অন্তর্ভুক্ত রাখতে চান যাতে করে তারাও কোন না কোনভাবে সেই মহা সৌভাগ্যবানদের একজনে পরিণত হন। আল্লাহ তা'লার অসীম অনুগ্রহে এই অধমের ব্যক্তিগত জীবনের সাথেও জড়িয়ে রয়েছে এমনি একটি মসজিদ নির্মাণের ইতিহাস। আখেরী যুগে আর্বিভূত হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর বার্তা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে খ্যাত রাজশাহীতেও এসে পৌঁছেছে। দলে দলে এ জামা'তে শামিল হয়েছেন পবিত্র আত্মা ব্যক্তিরা। আর তাই আজকের এই লেখার উপজীব্য বিষয়ই হচ্ছে রাজশাহীতে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণের নেপথ্যে ঐশী সাহায্যের অভিজ্ঞতা।

আশির দশকে আমার বাবা মেজর (অব.) ডা. আসাদ-উজ-জামান চট্টগ্রাম হতে রাজশাহী সেনানিবাসে বদলি হয়ে যান। হঠাৎ করে চট্টগ্রাম জামা'তের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্কে ছেদ পড়ে। বিদায়কালে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে চট্টগ্রাম জামা'তের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোলাম আহমদ খান সাহেব (ফালু মিঞা) আমাদেরকে অকৃত্রিম ভালবাসায় সিক্ত করে বিদায় জানান এবং আমাদের ভবিষ্যত জীবনের সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করে দেন।

রাজশাহীতে তখনও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় নি তা আমার আগেই জানা ছিল। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা জায়গায় যাচ্ছি। যে শহর সম্পর্কে নেই আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা, নেই কোন ধারণা। যাহোক, রাজশাহীতে আসার পর কয়েক দিনের মধ্যেই রাজশাহী সরকারী কলেজে ভর্তি হলাম। তখন আমাদের জন্য বাসা বরাদ্দ না থাকার কারণে কিছু দিন আমরা সেনানিবাসের অফিসার্স মেসে থেকেছি। এ সময় আমি সারা দিন সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। জন্মগত আহমদী হওয়ার কারণে শৈশব থেকেই আমরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আহমদীদের বাসাতে বাজামাত নামায আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমার এখনও মনে আছে শৈশবে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কাশ্মীর– যেখানে আমার জন্ম, সেখানে বিভিন্ন আহমদীদের বাসায় অল্প সংখ্যক আহমদী নিয়ে জুমুআ'র নামায পড়তাম। পরবর্তীতে ময়মনসিংহের বাউণ্ডারী মোড়ের সাব-রেজিস্ট্রার আবুল হোসেন সাহেবের বাসভবন 'আহমদীয়া কটেজ'-এর বারান্দায় এবং তারও পরে আমার দাদা বদিউজ্জামান ভূঁইয়া সাহেবের নিজস্ব বাড়ির আকুয়ার ড্রইং রুমে আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের ইমামতিতে অনেকবার নামায পড়েছি।

যাহোক, রাজশাহীতে এসে আমরা এমনই একটি সুব্যবস্থার অপেক্ষায় ছিলাম। চট্টগ্রাম থেকে যাওয়ার সময় সৈয়দ আমীন আহমদ কর্তৃক প্রদত্ত একটি মৌখিক ঠিকানা অনুসারে রাজশাহীর একজন প্রবীণ আহমদীর বাসা খুঁজে পেলাম। ভদ্রলোক ছিলেন আলহাজ্জ সাঈদ আহমদ সাহেব যিনি (অবসর প্রাপ্ত) ডি.আই.জি. প্রিজন ছিলেন। শহরের নিউ ডিগ্রি গভর্নমেন্ট কলেজের পাশেই তাঁর নিজ বাড়ি ছিল। আমাদের পরিচয় দিতেই হাসিমুখে তিনি জুমুআ'র নামায আদায় করতে সম্মত হলেন। পরের শুক্রবার আমার বাবাসহ সেখানে যাই। যথারীতি তিনি এবং তাঁর পরিবারের ২/১ জন ছেলেমেয়েসহ জুমুআ'র নামায আদায় করি ।

এছাড়া আরও দুই-তিন জন আহমদী ভ্রাতা ছিলেন। তাদের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা লোকমান সাহেব, বর্তমানে মিরপুর জামা'তের সদস্য আখতার-উজ্-জামান সাহেব এবং পাবলিক লাইব্রেরিতে চাকুরিরত মোতাহার হোসেন সাহেব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মনে পড়ে, কিছুদিন এভাবে চলার পর কুরবানীর ঈদে আমরা জনাব সাঈদ সাহেবের বাসায় এক সাথে একটা গরু কুরবানী করি।

যাহোক, এরই মধ্যে আমরা সেনানিবাসের বাসা বরাদ্দ পাই। সেনানিবাসের একেবারে শেষ সীমানায় ছিল আমাদের বাসা। পিছন দিকের পথ দিয়ে আসা-যাওয়া খুবই সুবিধাজনক ছিল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সেখানেই জুমুআ'র নামায আদায় শুরু হয়। উল্লেখ্য, রাজশাহীর অদূরে আরও ২/৩ টি ছোট-ছোট জামা'ত ছিল। একটি গ্রামের নাম ছিল আড়ানী যেখানে ২/৪ টি আহমদী পরিবার ছিল। এদের মধ্যে ছিলেন হাবিবুর রহমান (হাবিল) মাস্টার সাহেব, সিরাজ সাহেব। বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রিন্সিপাল ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব এ এলাকারই সন্তান এবং এখানেই তিনি বয়াত গ্রহণ করেন।

তাছাড়া কাফুরিয়া, নাটোরের তেবাড়ীয়া, মহারাজপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি জামা'তের আহমদী ভ্রাতাদের নিয়মিত আসা-যাওয়াতে আমাদের বাড়িতে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকলের মাঝে একটি নতুন উদ্দীপনা জেগে উঠে। নিয়মিত আমাদের বাসায় আসা-যাওয়ার ফলে বৃহত্তর রাজশাহীতে একটি শক্তিশালী আহমদী পরিবেশ গড়ে উঠে। এ সময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পুরুলিয়াতে প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে, তারা পাকা ধান কেটে নিয়ে যায়, জীবন্ত গরুর পা কেটে দেয়া সহ আরও নানাবিধ অত্যাচার-নিপীড়ন করতে থাকে। দেশে তখন সামরিক শাসন থাকায় আমার বাবা এ সময় আহমদীয়া জামা'তের জন্য অনন্য খেদমত করার সুযোগ লাভ করেন। সমাজে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকাতে

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেক আহমদীয়া মসজিদ। প্রত্যেকটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িয়ে আছে বিরল ত্যাগ ও ঐতিহ্যের স্মৃতিগাঁথা। এ রকম একটি অনন্য স্মৃতি ফুটে উঠেছে জনাব এম. আরিফ-উজ্-জামান সাহেবের লেখায়।

তিনি এ বিরোধিতা দমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরবর্তী সময় বাংলাদেশের তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব এবং মোয়াল্লেম মৌলভী মনোয়ার আলী সাহেব রাজশাহী সফরে এসে আমাদের বাসায় অবস্থান করেন। আমীর সাহেব আমার পিতাকে রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্বভার প্রদান করেন। আমার পিতাও আল্লাহ তা'লার নাম নিয়ে ধর্মের সেবায় নেমে পড়েন।

এরই মধ্যে রাজশাহীতে বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের সদর দপ্তর স্থাপিত হলে বি.এ.এম.এ. সাত্তার সাহেব বদলী হয়ে আসেন। তিনি প্রথমে আমাদের বাসাতেই উঠেন। পরবর্তীতে রেলওয়ের গেস্ট হাউজে অবস্থান করেন। তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বহু আহমদী যুবক চাকুরি লাভ করে। সকলের অনবদ্য পরিশ্রম ও অহোরাত্র তবলীগের মাধ্যমে ধীরে-ধীরে রাজশাহী জামা'তের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮২ সালে অধ্যাপক ড. তারিক সাইফুল ইসলাম সপরিবারে কানাডা থেকে এসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে পুনরায় যোগদান করেন। তিনি রাজশাহী জামা'ত-এর সদস্য হওয়ায় আমাদের কাজের গতি আরও বেড়ে যায়। জুমুআ'র নামাযের পর আমাদের বাসায় নিয়মিত মিটিং হত। একদিন এমনি একটি মিটিংয়ে রাজশাহীতে আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে একটি জায়গা ক্রয় করার বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হল। যেমন কথা তেমন কাজ। সিদ্ধান্ত হল, প্রত্যেক শুক্রবার আমরা কিছু-কিছু চাঁদা স্থানীয়ভাবে এ খাতে সংগ্রহ করব এবং এ থেকে আপ্যায়ন বাবদ কিছু ব্যয় করা হবে। কিছুদিন পর আমরা রাজশাহী সেনানিবাসের অগ্রণী ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলি। বিন্দু-বিন্দু করে মসজিদের জায়গা ক্রয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। আর পাশাপাশি খোদা তা'লার সকাশে চলতে থাকে অবিরাম দোয়ার ফল্গুধারা। যার ফলশ্রুতিতে আসতে থাকে ঐশী সাহায্যের ঝরনাধারা। এখানে তেমনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

ঢাকা থেকে তৎকালীন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব সস্ত্রীক তাঁর জামাতা বি.এ.এম.এ. সাত্তার সাহেবের বাসায় বেড়াতে আসেন। তাঁরা জুমুআ'র নামায পড়তে আমাদের বাসায় আসেন। নামাযের পর তাঁরা দুপুরের খাবার খান। এরপর যখন তাঁরা বিদায় নিচ্ছিলেন এমন সময় আমি কী মনে করে মোহতরমা মাসুদা সামাদ বেগম সাহেবাকে বলে বসলাম, 'আন্টি আপনারা লাজনাদের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে মসজিদের জন্য অনেক অনুদান দিয়ে থাকেন। আমাদের রাজশাহী মসজিদের জন্য কিছু যদি দিতেন।' তিনি ছিলেন লাজনার সদর, আর আমি ছিলাম একজন কলেজ ছাত্র।

কিন্তু এত কিছু না ভেবেই আবদার করে ফেললাম। আজ প্রায় ৩০ বৎসর পরও ভাবতে অবাক লাগে, হয়ত বা কোন ঐশী তকদীরেই কথাটি বলে ফেলেছিলাম। কিন্তু অবাক করার বিষয় হল, মোহতরমা মাসুদা সামাদ সাহেবা আমার কথা শুনামাত্রই কাল বিলম্ব না করে বিসমিল্লাহ্ বলে তাঁর গলায় হাত দিলেন এবং তাঁর পরনের একটি স্বর্ণের চেইন খুলে আমার হাতে দিলেন। আকস্মিক এ ঘটনায় আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি, ধন্যবাদ দেয়ার ভাষাও আমার জানা ছিল না। যতটুকু মনে পড়ে সেই চেইন প্রায় ৭,০০০/- টাকায় বিক্রি করে আমাদের রাজশাহীর জমির প্রায় অর্ধেক মূল্য সংগ্রহ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাঁকে এর উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

এবার জমি খোঁজার পালা। সাইকেল নিয়ে আমি সারাদিন এদিক-সেদিক জমি খুঁজে বেড়াই। একদিন হঠাৎ বর্তমান শাহ মখদুম থানার পিছনে একজন ভদ্রলোককে একটি জমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ঐ পাঁচ কাঠা জমি বিক্রয় করবেন বলে জানালেন। তাকে সাথে করে আমার বাবার কাছে নিয়ে আসলাম। পরে ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকায় জমিটি আমরা ক্রয় করি। স্থানীয় ভ্রাতা জনাব লোকমান আলী সাহেব রাজশাহী কোর্টে মুহুরীর কাজ করতেন। তিনি এ ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। আর এভাবেই মসজিদের জন্য রাজশাহীর মাটিতে জমি কেনা হয়ে যায়। একইসাথে রাজশাহী জামা'তের সদস্যদের মনে মসজিদ বানানোর যে স্বপ্ন দীর্ঘ দিন ধরে লালিত হচ্ছিল তা বাস্তবে রূপায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্ন হয়।

১৯৮৩ সালের শেষে কিংবা ১৯৮৪ সালের শুরুতে পাকিস্তানের রাবওয়া হতে হুযূর রাবে(রাহে.)-এর প্রতিনিধি এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব, জনাব সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব এবং তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব রাজশাহী সফরে আসেন। রাজশাহী বিমান বন্দরে আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই । সে সফরে বর্তমান ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশ্শের-উর রহমান সাহেবও ছিলেন– যিনি তখন বাংলাদেশ বিমানে চাকুরিরত ছিলেন। অন্য একটি বিমানে জনাব বি.এ.এম.এ. সাত্তার সাহেবের ছোট ভাই কাইজার আলম সাহেবও এসেছিলেন। বিমান বন্দর থেকে শহরে আসার পথে ঐ ক্রয়কৃত জমিতে রাজশাহী জামা'তের প্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয়। জমি ক্রয় বা ভিত্তি স্থাপনের তারিখটি সম্ভবত ১৩ই মার্চ ছিল– যে তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল(রা.) মৃত্যুবরণ করেন। সে কারণে স্থানটির নাম রাখা হয়েছিল 'নূর নগর'।

পরের দিন রাজশাহী সরকারী কলেজের অডিটরিয়ামে একটি সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়– যেখানে এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব বক্তব্য রাখেন। মির্যা আব্দুল হক সাহেব এবং বি.এ.এম.এ. সাত্তার সাহেবের বক্তৃতার অংশসহ এ সুধী সমাবেশের রিপোর্ট রাজশাহী বেতার থেকে সম্প্রচারিত হয়।

বলে রাখা ভাল, আমাদের ক্রয়কৃত মসজিদের জমিতে যাবার জন্য তখন কোন প্রশস্ত রাস্তা ছিল না। স্থানীয় ভ্রাতা জনাব মোস্তাজ আলী সাহেব ঐ এলাকায় কিছু জমি ক্রয় করেছিলেন। সেই জমিতে রাস্তা থাকায় মোস্তাজ আলী সাহেব মসজিদের নির্ধারিত জায়গার সাথে তা অদল-বদল করে নেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই নেকী কবুল করুন। এক্ষেত্রে তৎকালীন রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট মরহুম জনাব আব্দুল জলিল সাহেব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে ঐ জমির রাস্তার অপর পাশে আরও দশ কাঠা জমি ক্রয় করা হয়। মরহুম মোহাম্মদ

রাজশাহী শহরে অবস্থিত প্রথম আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুল আউয়াল'

ইয়ামীন সাহেব এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন। প্রথমোক্ত পাঁচ কাঠা জমিতে ১৯৯২ সালে মসজিদ কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ শুরু হলে ২৭শে নভেম্বর বিরুদ্ধবাদীরা তা ভেঙে দেয়। ২০১০ সালে এর বিপরীত দশ কাঠার জমিটিতে রাজশাহী শহরের প্রথম আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুল আউয়াল' এবং অফিস, গেস্টহাউজ ও অন্তর্বর্তিকালীন মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস নির্মিত হয়। এই মসজিদ নির্মাণটি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে ও হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.)-এর অনুদানে সুসম্পন্ন হয়েছে। হুযূর(আই.) এই মসজিদের নাম রেখেছেন 'মসজিদে বায়তুল আউয়াল'। এটি সূচনামাত্র। এটিই শেষ মসজিদ নয়। পাঁচ কাঠা জমিটিতে মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস নির্মাণ বিবেচনাধীন রয়েছে।

রাজশাহী জামা'তের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ১৯৮৯ সালের ২৩শে মার্চ স্থানীয় 'শহীদ নাজমুল হক বালিকা বিদ্যালয়'-এ দিনব্যাপী নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে যে তিফল কুরআন তেলাওয়াত করেছিল, সে-ই আজ ড. আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক বর্তমানে যিনি রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক।

পরিশেষে আমি যে কথাটি বলতে চাই, তা অত্যুক্তি হবে কি না জানি না, তবে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ত নয়। আমার পিতা ডা. মেজর (অব.) আসাদ-উজ-জামান যখন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরে স্বদেশে ফিরে আসবেন কি না সেই সিদ্ধান্তের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রাহে.)-এর নিকট জানতে চাইলেন, তখন তিনি(রাহে.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে যা বলেছিলেন তা হল, 'আপনি বাংলাদেশেই ফিরে যান। আপনার মত আহমদীর সেখানে খুবই প্রয়োজন।'

আমার বাবা মরহুম ডা. মেজর (অব.) আসাদ-উজ-জামান সাহেব রাজশাহীতে মসজিদের জায়গা ক্রয় এবং চট্টগ্রামে নবনির্মিত মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে আর্থিক কুরবানী করেছেন এবং এগুলো নির্মাণের পিছনে যে অসাধারণ সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস(রাহে.)-এর উক্ত নির্দেশনা সঠিক ও বরকতমণ্ডিত সাব্যস্ত হয়েছে। ধর্মের সেবাকে একটি ঐশী অনুগ্রহ মনে করতে হবে যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.) বলেছেন, **খেদমতে দীন কো ইক ফযলে এলাহী জা-নো**। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে ধর্মের উত্তম সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন (আমীন)।

দোয়া সম্পর্কে অমৃত বাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বলেন, ...'সেই দোয়া যা গভীর ব্যুৎপত্তি লাভের পর আর ঐশী অনুগ্রহে উৎসারিত হয় তার প্রকৃতি ও ধরনই সম্পূর্ণ ভিন্ন! সে এক বিনাশকারী শক্তি, সে মন গলিয়ে দেয়া এক আগুন! সে ঐশী কৃপাবারি টেনে নামানোর জন্য এক চুম্বকীয় আকর্ষণ! সে এক জীবননাশী মৃত্যু কিন্তু পরিশেষে সঞ্জীবনী সুধায় পরিণত হয়! সে দুর্বার গতিতে ধেয়ে আসা এক প্লাবন কিন্তু শেষে জীবন-তরীর রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক জটিল সমস্যা এর মাধ্যমে সমাধা হয়ে যায় আর প্রত্যেক প্রকার বিষ এর দ্বারা অবশেষে প্রতিষেধকে পরিণত হয়।

বড়ই সৌভাগ্যবান সেসব বন্দি যারা দোয়া করে কখনও ক্লান্ত হয় না, কেননা একদিন তারা নির্ঘাত মুক্তি পাবে। সৌভাগ্যবান সেসব অন্ধ যারা দোয়ার ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখায় না, কারণ একদিন তারা অবশ্যই দৃষ্টি লাভ করবে। বড়ই সৌভাগ্যবান তারা, যারা কবরস্ত হয়েও দোয়ার মাধ্যমে ঐশী-সাহায্য যাচনা করে কেননা একদিন নিশ্চয়ই তাদেরকে কবর থেকে বের করে আনা হবে। দোয়ার বিষয়ে অলস না হয়ে তোমাদের আত্মা যখন দোয়া করার জন্য বিগলিত হয়, তোমাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয় এবং তোমাদের অন্তরে এক ধরনের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে, তোমাদেরকে একাকীত্বের স্বাদ গ্রহণের জন্য অন্ধকার কুঠুরিতে আর নির্জন বন-জঙ্গলে নিয়ে যায় আর তোমাদেরকে ব্যাকুল ও পাগল করে তোলে আর আত্মভোলা বানিয়ে দেয়– সেক্ষেত্রে তোমরাও সৌভাগ্যবান, কেননা অবশেষে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।'

(লেকচার শিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, বিংশ খণ্ড, পৃ. ২২২, ২২৩)

শেষ যুগে জিহাদ

হয়রত মসীহ মাওউদ(আ.) বলেছেন,

'বর্ণিত আছে, প্রতিশ্রুত মসীহ যখন আবির্ভূত হবেন তখন তরবারির যুদ্ধ এবং ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটবে। কেননা মসীহ কোন তরবারিও ওঠাবে না আর পার্থিব কোন অস্ত্রও হাতে নেবে না বরং তাঁর দোয়াই তাঁর অস্ত্র হবে। আর তাঁর দৃঢ়চিত্ততা হবে তাঁর তরবারি। তিনি সন্ধির ভিত রচনা করবেন এবং ছাগল ও বাঘকে একই ঘাটে একত্র করবেন। তাঁর যুগ হবে সন্ধির যুগ এবং নম্রতা ও মানবিক সহমর্মিতার যুগ।

আক্ষেপ! মানুষ কেন গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে না, তেরশ' বছর হয়ে গেল প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে মহানবী(সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে 'ইয়াযাউল হারবা' বাণী নিঃসৃত হয়েছে।

হে ইসলামের আলেম ও মৌলভীগণ! আমার কথা শোন! আমি সত্য সত্যই বলছি, এখন (অস্ত্রের) জিহাদের সময় নয়। খোদার পবিত্র নবীর অবাধ্য হয়ো না। যে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের কথা ছিল তিনি এসে গেছেন। আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে এমন ধর্মীয় যুদ্ধ থেকে বিরত হও যে যুদ্ধ তরবারি ও হানাহানির মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এখনও খুনোখুনি থেকে বিরত না হওয়া এবং এমন যুদ্ধের পক্ষে উষ্কানীমূলক বক্তৃতা দেয়া থেকে বিরত না হওয়া ইসলামী রীতি নয়। যে আমাকে গ্রহণ করেছে সে কেবল এসব বক্তৃতা দেয়া থেকে বিরতই হবে না বরং এটিকে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং ঐশী আযাবের কারণ বলে জ্ঞান করবে।'

(গভর্নমেন্ট আংরেযী আওর জিহাদ: পৃ. ৫)

‘আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখেছি আর জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করেছি।’

একটি সতর্কবাণী !

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী(আ.) ১৯০৭ সালে তাঁর পুস্তক 'হকীকাতুল ওহী'র ২৬৮ ও ২৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলির প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটত। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে যা এক দীর্ঘকাল যাবত অন্তরালে ছিল। আল্লাহ তা'লা বলে রেখেছেন: (১৭:১৬) وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (আমরা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ না পাঠিয়ে কখনও আযাব দেই না–অনুবাদক)। তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূবেই সাবধান হয় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলির কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করছ? কখনও না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে, আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ– একথা মনে করো না! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়েও বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, আর জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন, আর তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লূতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয়, মৃত।"

আর্ত মানবতার সেবায় আহমদীয়া জামা'ত

Ahmadiyya Jama'at in service of Humanity

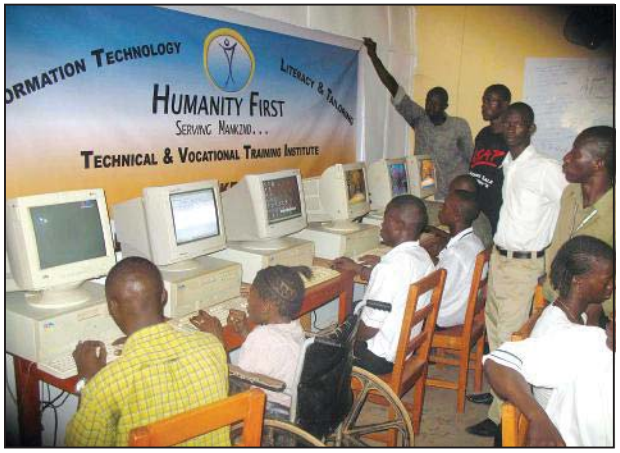

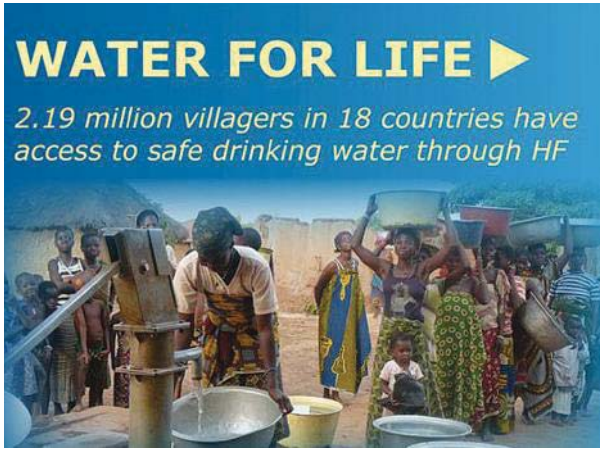

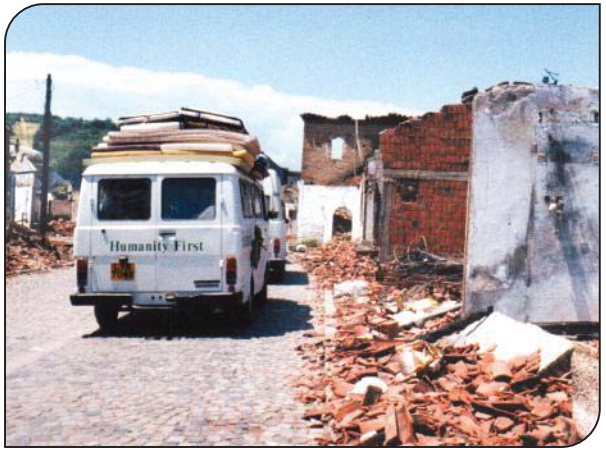

Humanity Fir
Restoring communities, Building a

VOLUNTEER

Humanity First Computer Institute
Centre de Formation en Informatique
Microsoft Word,Excel,Powerpoint,Internet,Windows XP
www.humanityfirst.bf/ mobile: 78 81 00 46

HUMANITY FIRST
MEDICAL CAMP

Information Technology
Literacy & Tailoring
Humanity First
Serving Mankind...
Technical & Vocational Training Institute

শত বছরের বিরোধিতা এবং পত্র-পত্রিকায় আহমদীয়াত

মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র কুরআন পাঠে জানা যায়, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত নবী রসূল এসেছেন তাঁদের সকলের বিরোধিতা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হায় আক্ষেপ মানবজাতির জন্য! তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আসে তারা তাকে নিয়ে হাসি বিদ্রূপ করে" *(সূরা ইয়াসিন : ৩১)*। যেভাবে নবী-রসূলদের এবং তাঁদের জামা'তের সাথে বিরোধীরা আচরণ করেছে ঠিক তেমনই আচরণ এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী(আ.) এবং তাঁর জামা'তের সাথে করা হচ্ছে। দেখা যায়, হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-কে হত্যার চেষ্টা, মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে এবং তাঁর জামা'তকে ধ্বংস করার সকল চেষ্টা করেছে কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর জামা'তকে সর্বদা বিজয়ী করেছেন, অপর দিকে যারা তাঁকে ও তাঁর জামা'তকে নির্মূল করতে চেয়েছিল আল্লাহ তা'লা সেই সব বিরোধীদেরকেই অপমানিত ও ধ্বংস করেছেন ।

এক কথায় বলা যায়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা এ জামা'তের সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হয় কিন্তু শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এ জামা'তের উন্নতির ক্ষেত্রে অনু পরিমাণ ক্ষতিও করতে পারে নি বরং এসব বিরোধিতার ফলে জামা'ত আরও দ্রুততার সাথে সামনের দিকে অগ্রসরমান হয়েছে। প্রায় সমগ্র বিশ্বে এ জামা'তের কিছু না কিছু বিরোধিতার ঝড় বইছে তার পরও দিনের পর দিন এ জামা'ত উন্নতি করেই যাচ্ছে। যেভাবে আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-কে জানিয়েছিলেন, 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব' ঠিক তাই হয়েছে, শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এ জামা'ত বর্তমান পৃথিবীর ২০৬টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বাংলাদেশ জামা'তও শত্রুর প্রবল বিরোধিতার ঝড় অতিক্রম করে দ্বিতীয় শতাব্দীতে পা দিয়েছে, আবারও আলহামদুলিল্লাহ। এদেশে আহমদীয়াতের সূচনা থেকেই বিরোধিতা শুরু হয়। তবে বিগত দিনগুলোতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের লোকদের ওপর এদেশের তথাকথিত কয়েকটি ইসলামী জঙ্গি সংগঠন যেভাবে জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়েছে তা বর্ণনাতীত। ঐ দিনগুলোতে এসব আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনকালে এই জঙ্গিদের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলার দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সে সময় তারা বিভিন্ন স্থানে আহমদী সদস্যদের ওপর হামলা, শারীরিক নির্যাতন, বয়কট করে রাখা, জোর করে মসজিদ দখল করে নিয়ে যাওয়া, মসজিদে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া, জোরপূর্বক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিজস্ব সাইন বোর্ড নামিয়ে মৌলবাদীদের তৈরী সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেয়া ইত্যাদি কার্যকলাপ সে সময়ে উগ্র মৌলবাদীরা হরহামেশাই করেছে। তৎকালীন সময়ে সরকারী পুলিশের সামনে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর বহু অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু প্রশাসন যেন তখন ছিল নীরব। উগ্র মৌলবাদীদের চাপের মুখে তৎকালীন সময়ে আহমদীয়া জামা'তের বেশ কয়েকটি বই-পুস্তকের ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারী করেছিল সরকার কিন্তু পরে তা উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের ওপর আক্রমণ মূলত উগ্র জঙ্গি সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেই করা হয় আর এরা একেক সময় ভিন্ন ভিন্ন নামে মাঠে নামে। যেমন ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট ও আমরা ঢাকাবাসী। আর এই জঙ্গিদের অত্যাচারের ইতিহাস জানে না বাংলার মানুষ এমন ব্যক্তি পাওয়া মুশকিল বরং সারা পৃথিবী জানে এই জঙ্গিদের তাণ্ডবলীলা কী ভয়াবহ হতে পারে। এরা কুরআনও পুড়াতে পারে আবার মসজিদে আগুনও লাগাতে পারে।

আমরা দেখতে পাই, এদেশে জামা'তের ওপর সর্বপ্রথম ধর্মান্ধরা যে বড় ধরণের আক্রমণ করেছিল তা ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তারিখ ৩শে নভেম্বর, ১৯৬৩ সাল। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসা চলাকালীন সময়ে উগ্র মৌলবাদীদের আক্রমণের ফলে শত শত নিরীহ আহমদী আহত হোন এবং দুই জন শাহাদাত বরণ করেন। এরা দু'জনই বাংলাদেশের প্রথম শহীদ।

এর পর থেকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের আহমদীয়া জামা'ত আক্রমণের শিকারে পরিণত হতে থাকে।

১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদ বকশী বাজারে আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা এসে হামলা চালায়, এতে ৪০-৪৫ জন আহমদী আহত হন।

তারপর ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে আবারও বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদ বকশী বাজারে বাৎসরিক সম্মেলনে আলিয়া মাদ্রাসার ৪/৫ শত ছাত্ররা এসে হামলা চালায় এতে বেশ কয়েক জন আহমদী আহত হন।

আবারও ধর্মান্ধদের আঘাতের সম্মুখিন হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া। দিনটি ছিল ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮৭ সাল। পূর্ব পরিকল্পিত এ আক্রমণের ফলে আহমদীয়াদের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত শহরের আহমদীয়া পাড়ায় দ্বিতল মসজিদটি জঙ্গি মৌলবাদীরা জোরপূর্বক দখল করে নেয়। আজও আহমদীরা তাদের এ মসজিদটি ফেরত পায় নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছেও আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মসজিদটি ফেরত পাওয়ার আবেদন করেছিল কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ব্যাপারে কোন প্রদক্ষেপই নেয় নাই। একই জেলায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটি মসজিদ বিরুদ্ধবাদীরা জোর করে আজও দখল করে রেখেছে, আর এসব মসজিদ দখল করার সময় স্থানীয় আহমদীদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়, ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়া হয়, আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়, লুটতরাজ করা হয়।

১৯৮৭ সনের রমযান মাসে পুরুলিয়া জামা'তে আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েকজন আহমদীকে গুরুতর আহত করা হয়।

১৯৮৮ সনে মহারাজপুরের আহমদী বাড়ি-ঘরে আক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ করা হয় এবং বেশ কয়েকজন আহমদী সদস্যকে আহত করা হয়।

২৩শে মার্চ, ১৯৮৯ সাল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে এই ধর্মান্ধরা হামলা চালায়।

বিগত কয়েক বছরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর আক্রমণের ধারা আরও বৃদ্ধি পায়। এই মৌলবাদী জঙ্গীদের জুলুম অত্যাচারের ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরছি, যাতে স্পষ্ট হয় আজ মৌলবাদীদের অবস্থান কোথায় আর আহমদীয়া জামা'তের অবস্থান কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৯২ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদে অতর্কিত আক্রমণ চালায় উগ্র-ধর্মান্ধরা। এতে আহমদীয়া জামা'তের

ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয় এবং বেশ কয়েকজন আহমদী সদস্য আহত হন। সবচেয়ে বড় বিষয় হল এই ধর্মান্ধদের হাত থেকে সেদিন আল্লাহ পাকের পবিত্র কুরআন পর্যন্ত রেহাই পায় নি।

১৯৯২ সালের নভেম্বরে রাজশাহী শহরের প্রথম আহমদীয়া মসজিদ তাদের নিজস্ব জমিতে নির্মাণ কাজ শুরু করলে উগ্র ধর্মান্ধদের আক্রমণের ফলে সে কাজ পরিত্যক্ত হয়।

৬ই জুলাই ১৯৯৬ সাল। শেরপুর জেলার রাংটিয়া গ্রামে উগ্র ধর্মান্ধরা হামলা চালিয়ে আহমদীয়া মসজিদ ভাংচুর করে ও সদস্যদের আহত করে।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। ইসলামগঞ্জ জামা'তের সদস্যদের ওপর এই মৌলবাদীরা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালায়। দীর্ঘ কয়েক মাস তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। বেশ কয়েকজনকে আক্রান্ত করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা সত্ত্বেও চিকিৎসার জন্য বাহিরে যেতে দেয় নি।

৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯ সাল। দিনটি ছিল পবিত্র জুমুআ'র দিন। জুমুআ'র নামায চলা অবস্থায় মৌলবাদীরা এক শক্তিশালী টাইমবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে খুলনার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৭ জন সদস্য শহীদ হন। মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবসহ গুরুতর আহত হন প্রায় ৪০-৫০ জন আহমদী। বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কোন সরকারই এই হামলার সঠিক তদন্ত ও জঙ্গিদের বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করায় নি।

১৯৯৯ সালে নাটোরের তেবাড়ীয়া আহমদীয়া মসজিদ পর পর দু'বার এই ধর্মান্ধদের আক্রমণের শিকার হয়। এ সময় অনেক আহমদী আহত হন।

২০০০ সালে পূর্ব পরিকল্পিত একটি উগ্রবাদী চক্রান্তকারী দল ক্রোড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের ঘর-বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ করে এবং ক্রোড়া আহমদীয়া মসজিদ দখল করে নেয়। এ সময় তারা স্থানীয় আহমদীদের বাড়ি-ঘরে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে এবং এতে অনেক আহমদী আহত হন। পরবর্তিতে আল্লাহপাকের বিশেষ কৃপায় মসজিদটি আহমদীদের হস্তগত হয়।

২৪শে আগষ্ট ২০০৩ সাল। কুষ্টিয়ার উত্তর ভাবানীপুর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের লোকদের ওপর মৌলবাদীরা চালায় সিমাহীন জুলুম-নির্যাতন। এসময় মৌলবাদী জঙ্গিরা আহমদীদের ১৭টি পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখে বেশ কয়েক দিন। আহমদীদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পর্যন্ত যেতে দেয়া হয় নি, বাজার-সদাই করাও বন্ধ করে দিয়েছিল।

EU Amnesty concerned over security of Ahmadiyas

DIPLOMATIC CORRESPONDENT —
The ambassadors of the European Union countries in Bangladesh have reiterated their demand to ensure security of the members of the minority communities in Bangladesh under provisions laid out in the Constitution of the Republic.
The envoys of the six EU countries - Sweden, Germany, France, Italy, the

Photo on Page 16

Netherlands and Denmark - visited the Ahmadiya mosque in Tejgaon industrial area in the city yesterday and expressed their solidarity with the members of the community who are concerned about their safety and security following threats by fanatic groups. Talking to the leaders of the community, on behalf of the of EU countries, Ambassador of the Netherlands Sjef Ijzermans enquired about the security and concern of the members of the Ahmadiya community.
See Page 4 Col 3

The Independent
SATURDAY, NOVEMBER 6, 2004

The ambassadors of the European Union coming out of the Ahmadiya mosque in the city yesterday after meeting its leaders. (Story on Page 1) — Independent photo

৩১শে অক্টোবর ২০০৩ সাল। যশোরের রঘুনাথপুর বাগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম জনাব শাহ আলম সাহেবকে পবিত্র রোযার দিনে রোযা থাকা অবস্থায় পিটিয়ে শহীদ করা হয় এবং আহত করা হয় ২০/২৫ জনকে। এ হত্যার খবর পরের দিন দেশের প্রায় সব জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও আজ পর্যন্ত কোন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয় নি। জানা যায় আজও তারা এলাকাতেই বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে আর বলে বেড়ায় আমাদের কিছু করার মত শক্তি এ দেশের কোন সরকারের নেই।

২১শে নভেম্বর ২০০৩ সাল। খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট সংগঠনের নেতৃত্বে তেজগাঁও রহিম মেটাল মসজিদ থেকে হাজার হাজার মৌলবাদী আহমদীয়া জামা'তের নাখালপাড়া মসজিদ দখল করতে যায়। এ সময় তারা রাজপথ অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে গাড়ি পুড়িয়ে দেশবাসীকে দেখায় আমরা কত ভয়াবহ। এ দিনে তারা যে আক্রমণ চালায় এতে ১০জন পুলিশসহ প্রায় ২৫০ জন আহত হয়।

৮ই জানুয়ারি ২০০৪ সাল। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কিছু প্রকাশনা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর ২০শে ডিসেম্বর ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে ১৩ই মে ২০০৫ সালে এতদসংক্রান্ত রিটটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী স্থগিতাদেশ প্রদান করে। যার ফলে আহমদীয়া জামা'তের প্রকাশনার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকে না।

১৯ শে মার্চ ২০০৪ সাল, দিনটি ছিল শুক্রবার। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মৌলবাদীরা বরগুনার কুকুয়া কৃষ্ণনগর ও খাকদান আহমদীয়া জামা'তের তিনটি মসজিদ জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করে এবং স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের ওপর চালায় জুলুম-নির্যাতন।

১২ই মে ২০০৪ সাল। এই মৌলবাদী জঙ্গিরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পটুয়াখালী মসজিদ ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। তারা এই সময় আহমদীদের শারীরিকভাবেও নির্যাতন করে।

১৩ই মে ২০০৪ সাল। রংপুরের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের ওপর হামলা চালিয়ে ৮টি পরিবারের ঘর-বাড়ি ভাঙচুর ও ব্যাপক লুটতরাজ করে। সেখানকার আহমদী সদস্যদের করে রাখা হয় অবরুদ্ধ।

২৮শে মে ২০০৪ সাল। মৌলবাদী জঙ্গিরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চট্টগ্রাম মসজিদে আহমদীদের নিজস্ব সাইন বোর্ড সরিয়ে মৌলবাদীরা তাদের নিজস্ব সাইন বোর্ড টাঙিয়ে দেয়। আর এই কাজে পুরো সহযোগিতা করে তৎকালীন সরকারের পুলিশ বাহিনী, যা পরের দিন দেশের সকল পত্র-পত্রিকার শিরোনামে স্থান পায়।

২৯শে অক্টোবর ২০০৪ সাল। এ মৌলবাদীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর গ্রামে অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদে জুমুআ'র নামায পড়ার সময় আক্রমণ চালায়। সে সময় তারা মসজিদ ও বাড়িঘরে ব্যাপক নাশকতামূলক হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটতরাজ করে। এ হামলার সময় আহমদীয়া জামা'তের ১০/১১ জন সদস্য মারাত্মকভাবে আহত হয়। এছাড়া একই জেলার আখাউড়ার ক্রোড়া গ্রামের আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের ওপর চালানো হয় নির্মম অত্যাচার, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সুবেদার আবু তাহের সাহেবকে এসময় মারাত্মকভাবে আহত করা হয়।

১৭ই এপ্রিল ২০০৫ সাল। দেশবাসী দেখেছে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে জঙ্গি মৌলবাদীদের মধ্যযুগীয় নারকীয় তাণ্ডবলীলা। 'খতমে নবুওয়াত' মৌলবাদী সংগঠনের প্রায় ৩০ হাজার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে তথাকথিত জিহাদের উদ্দেশ্যে শ্যামনগরের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদ ঘেরাও করে আর চালায় নির্যাতন। সে সময় আহমদীয়া মুসলিম

ভোরের কাগজ
ঢাকা রোববার ১১ জানুয়ারি ২০০৪

কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করে সংসদে বিল আসছে!

বিএনপি-জামাত সমর্থন দেবে, প্রধানমন্ত্রীও অবগত

রাশিদুল হাসান : আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় তথা কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য ইসলামি সংগঠনের চলমান আন্দোলনের বিষয়টি শুধু জাতীয় সংসদে বিল পাসের দাবির মধ্যে নেই, ইসলামী ঐক্যজোট সংসদের আগামী অধিবেশনেই এ সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছে। ইসলামী ঐক্যজোটের সাংসদ মুফতি শহিদুল ইসলাম এ বিল উত্থাপন করবেন। ইসলামী ঐক্যজোট বিলটি পাসের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন ৪ দলীয় ঐক্যজোটের শরিক দল বিএনপির সমর্থন পাবে বলেও আশা করছে। শায়খুল হাদিস মওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটের

• এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

জামা'তের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং দেশের প্রায় সকল পত্রিকার সাংবাদিকরাও ছিলেন।

সে দিন মৌলবাদী উগ্রপন্থিরা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ, শিশুদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার করে, ঘর-বাড়ির সব মালপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়। তৎকালীন সরকারের দায়ীত্বরত পুলিশ নিজ হাতে জঙ্গিদের তৈরী করা সাইন বোর্ড আহমদীয়া মসজিদে টাঙিয়ে দেয়। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে মৌলবাদীদের মধ্যযুগীয় নারকীয় তাণ্ডবলীলার দৃশ্য সেদিনের সকল বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখানো হলেও দুঃখের বিষয় তখন সরকারি টিভি চ্যানেল বিটিভি'র সংবাদে বলা হয় 'সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ওপর কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার করা হয় নি।' অথচ পরের দিন দেশের সকল পত্র-পত্রিকায় নির্যাতনের ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

১১ই মার্চ ২০০৫ সাল। বগুড়ার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদে হামলা ও দখলের চেষ্টা চালায় এরপর তারা তাদের দেয়া সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে যায়। এছাড়াও বগুড়াতে আরও বেশ কয়েকবার হামলার চেষ্টা করেছে।

২৪শে জুন ২০০৫ সাল। মৌলবাদীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কয়েকটি আহমদীয়া মসজিদের আশে-পাশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। যদিও সে সময় কোন আহমদী আল্লাহ তা'লার বিশেষ কৃপায় আহত হন নি।

১৫ই আগষ্ট ২০০৫ সাল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ভাদুঘর গ্রামে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদে টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে একজন নিষ্ঠাবান প্রবীণ আহমদী মহিলার হাত উড়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে আহত হন।

২৩শে জুন ২০০৬ সাল। ঢাকার আশকোনায় আহমদীয়া জামা'তের নির্মাণাধীন মসজিদে মৌলবাদীরা আক্রমণ চালিয়ে ভেঙ্গে ফেলে।

বেশ কিছুদিন তাদের আক্রমণ বন্ধের পর বাংলাদেশে আবারও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের লোকদের ওপর জুলুম অত্যাচার চালানো শুরু করে।

৭ই আগষ্ট ২০১০ সাল। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার চানতারায় নির্মাণাধীন আহমদীয়া মসজিদে শত শত সশস্ত্র মৌলবাদীরা আক্রমণ চালিয়ে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে, সেই সাথে মসজিদ ও আশে-পাশের আহমদী বাড়ি-ঘরের সব মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। সে সময় বেশ কয়েক জন আহমদী গুরুতর আহত হন।

২০১০ সালে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দুই দিন পূর্বে রমযান মাসে নোয়াখালী জেলার সোনামুড়ি থানার অম্বরনগর গ্রামে এই ধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গিরা চালায় নারকীয় তাণ্ডবলীলা। সেখানে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদসহ সদস্যদের বাড়িঘরে তারা ব্যাপক ভাংচুর করে এবং মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এছাড়া স্থানীয় আহমদী সদস্যদের ওপর চালায় নির্যাতন। কয়েক জন সদস্য গুরুতর আহত হন। বিশেষ করে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. মোর্শেদ আলম সাহেবকে পিটিয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় রেখে যায় এই মৌলবাদীরা।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে গাজীপুরের রোভার স্কাউট মাঠে আমহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক জলসা মৌলবাদীরা বন্ধ করে দেয়।

৭ই নভেম্বর, ২০১২ সাল। রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানাধীন কিসমত মেনানগর গ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যবৃন্দের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং সেখানে পুনর্নির্মাণাধীন একটি আহমদীয়া মসজিদ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয় এবং সর্বস্ব লুট করা হয়।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শত বার্ষিকী জলসা যা গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল, সকল প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত। জলসার দু'দিন পূর্বে মৌলবাদীরা জলসাগাহ প্যাণ্ডেলসহ সব মালামাল গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং লুটতরাজ করে নিয়ে যায়। সে সময় বেশ ক'জন আহমদী আহত হন।

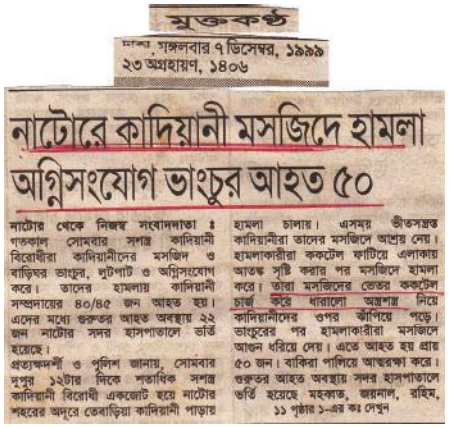
মুক্তকণ্ঠ
ঢাকা, মঙ্গলবার ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬

নাটোরে কাদিয়ানী মসজিদে হামলা

অগ্নিসংযোগ ভাংচুর আহত ৫০

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গতকাল সোমবার সশস্ত্র কাদিয়ানী বিরোধীরা কাদিয়ানীদের মসজিদ ও বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। তাদের হামলায় কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ৪০/৪৫ জন আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় ২২ জন নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, সোমবার দুপুর ১২টার দিকে সাতাধিক সশস্ত্র কাদিয়ানী বিরোধী একজোট হয়ে নাটোর শহরের অদূরে তেবাড়িয়া কাদিয়ানী পাড়ায় হামলা চালায়। এসময় ভীতসন্ত্রস্ত কাদিয়ানীরা তাদের মসজিদে আশ্রয় নেয়। হামলাকারীরা ককটেল ফাটিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করার পর মসজিদে হামলা করে। তারা মসজিদের ভেতর ককটেল চার্জ করে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাদিয়ানীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাংচুরের পর হামলাকারীরা মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে আহত হয় প্রায় ৫০ জন। বাকিরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। গুরুতর আহত অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মহব্বত, জয়নাল, রহিম,

১১ পৃষ্ঠার ১-এর কঃ দেখুন

এছাড়া ২০১৪ সালে বটিয়াপাড়াসহ আরও কিছু স্থানে কমবেশি মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন আহমদী সদস্যরা।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর আক্রমণের ঘটনা সব যদি তুলে ধরি তাহলে লেখা অনেক বড় হয়ে যায়। তাই আর দীর্ঘ করতে চাই না। উল্লেখিত আক্রমণের ঘটনা থেকে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারি, অন্যান্য দেশের আহমীদের ন্যায় এদেশের আহমদীরাও শত বছর ধরে কত ব্যাপকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তারপরও তারা আহমদীয়াত ছেড়ে দেন নি বরং ঈমানের দিক দিয়ে আরও দৃঢ় হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের লোকদের ওপর যারা অত্যাচার করেছে তাদের বিচার জাগতিক কোন সরকার না করলেও আল্লাহ অবশ্যই করবেন আর ইতোমধ্যে আল্লাহ তাদের প্রাপ্য শাস্তি অনেককে প্রদান করেছেনও। সরকারের কাছে আমাদের এটাই দাবি থাকবে জোরপূর্বক দখল করে নেয়া আহমদীয়া জামা'তের মসজিদগুলো আহমদীদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় যখনই এদেশে আহমদীয়া জামা'তের ওপর আক্রমণ হয়েছে তখনই দেশের সুশিল সমাজ, সচেতন নাগরিক, দেশের বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকবৃন্দ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এদেশের প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া বরাবরই আহমদীয়া জামা'তের পাশে থেকেছে, তারা সত্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরেছে, তাই তাদের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া যারা আহমদীয়াতের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন তাদের আল্লাহ জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং যারা আহমদীয়াতের জন্য কষ্ট করেছেন এবং আজো করছেন সবাইকে আল্লাহ তা'লা উত্তম পুরষ্কার দান করুন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রত্যেক সদস্যকে তাঁর নিজ আশ্রয়ের চাদরে আবৃত করে রাখুন এবং আমরা সবাই যেন যুগ খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী দাসে পরিণত হই, আমীন।

একটি দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা

কে এম নজিবুল্লাহ হোসেন

এই অধম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘড়িলালের একজন সদস্য। আমি জনাব মোহাম্মদ মাকসুদুল আলম গাজীর সাথে ঘটে যাওয়া বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে দোয়া কবুলিয়তের একটি সত্য ঘটনা এই লেখার মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই।

জনাব মাকসুদুল আলম সাহেব ২০০০ সালে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তের ঐশী ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। আহমদী হবার পর ২০০১ সালে তার ওপর নেমে আসে চরম অত্যাচার ও নির্যাতন। একদিন তার বাবা ও ভাইয়েরা মিলে তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং চরমভাবে অপমান, অপদস্থ করতে থাকে। তাকে আহমদীয়াত ত্যাগ করার জন্য বারবার বলপ্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু তিনি কোনক্রমেই আহমদীয়াত পরিত্যাগ করতে রাজি হলেন না।

যখন তিনি আহমদীয়াত ছাড়তে রাজি হলেন না তখন তারা তাকে লোহার শিকল দিয়ে রান্না ঘরের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। এমন কি তার পিতা তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখাল। কিন্তু তিনি কোন কথাতেই ভয় পেলেন না। তাদের সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন তারা সুন্দরবনের বিখ্যাত গরান কাঠ দিয়ে তাকে বেদম প্রহার করতে লাগল আর বলতে লাগল, বল, মির্যা গোলাম আহমদ মিথ্যা, আমি কাদিয়ানী ছেড়ে দিব। কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই বললেন না মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী বরং বললেন, আমার জীবন গেলেও আমি আহমদীয়াত ত্যাগ করব না।

এরপর তারা নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। তারা তাকে নির্যাতন করতে থাকে আর তিনি মুখ দিয়ে বলতে লাগলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। নির্যাতনকারীরা তাকে বলল, আমরা তোকে মারছি আর তুই আলহামদুলিল্লাহ্ বলছিস? তখন তিনি বলেন, আমি যখন আহমদীয়া জামা'তে বয়াত করেছি তখন অঙ্গীকার করেছি, জামা'তের জন্য, ইসলামের জন্য আমি আমার প্রাণ, মান-সম্মান সব কিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত আছি। যেহেতু এখন আমি সেটা পূরণের সুযোগ পাচ্ছি তাই আমি আলহামদুলিল্লাহ্ বলছি।'

এসব কথা শুনে তারা তাকে আরও বেশি মারতে থাকে। এভাবে অত্যাচার করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। অবশেষে তারা তাকে রান্না ঘরে বেঁধে রেখে চলে যায়। যাবার সময় তাকে এই বলে শাসিয়ে যায়, তোকে আগামীকাল সকালে আবারও মারব, ততক্ষণ পর্যন্ত মারব যতক্ষণ পর্যন্ত তুই কাদিয়ানীয়াত না ছাড়বি। তাকে রাতের খাবার না দিয়ে তার বাবা-ভাইয়েরা চলে গেল। প্রচণ্ড মশার কামড়ে তিনি ছটফট করতে থাকলেন আর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে রক্ষা কর, আমার প্রতি দয়া কর।

হঠাৎ তার মনে হল, আমার কোমরের মাঝে তো একটি চাবি আছে। তিনি সেই চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনক্রমেই তালা খোলা সম্ভব হল না। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে অনেক কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করতে থাকলেন। এভাবে রাতের শেষভাগে, ফজরের আযান দেবার ঠিক আগমুহূর্তে তিনি বলে বসলেন, হে খোদা! যদি মির্যা গোলাম আহমদ(আ.) সত্য সত্যই তোমার প্রেরিত মাহদী হয়ে থাকে তবে তুমি আমাকে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি দাও। আমাকে এ চাবি দিয়ে এই তালা খোলার ব্যবস্থা করে দাও। এই বলে তিনি সেই একই চাবিটি যেটি দিয়ে সারা রাত ধরে কোন কাজ হচ্ছিল না তা তালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মোড়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেই তালা খুলে গেল। ঘটনাটি বাহ্যত ছোট হলেও সে মুহূর্তে এটি তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্বলন্ত নিদর্শন ছিল।

এই বিস্ময় ও আশ্চর্য নিদর্শন দেখে তার এই কথা উপলব্ধি করতে আর দ্বিধা থাকল না, আহমদীয়া জামা'ত একটি সত্য জামা'ত। মির্যা গোলাম আহমদ(আ.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী। তারপর তিনি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে সে রাতেই তৎকালীন ঘড়িলাল মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব হযরত আলী খানের বাসায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি হযরত আলী সাহেবকে তার সাথে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। বর্তমানে জনাব মাকসুদুল আলম গাজী ঘড়িলাল মজলিস এবং জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান খাদেম ও নিবেদিত প্রাণকর্মী। জনাব মাকসুদুল আলম গাজীর সাথে ঘটে যাওয়া এই বিরোধিতার ঘটনাটি থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খোদা তা'লার স্বহস্তে রোপিত একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা। যুগের মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)-এর সত্যতার এটি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

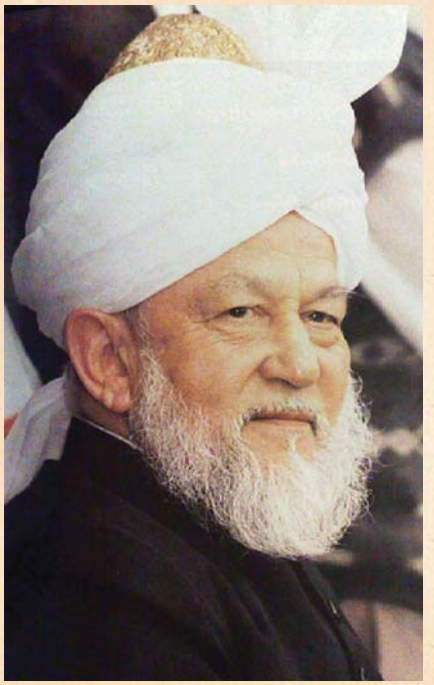

"Swords can win territories but not hearts, forces can bend heads but not minds."

Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rah)

"তরবারি দেশ জয় করতে পারে কিন্তু মন জয় করতে পারে না। বাহুবল মাথা নত করাতে পারে কিন্তু মনকে বশ করতে পারে না।"

–হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)

আহমদীয়া জামা'ত মহারাজপুরের পরিচিতি

এনামুল হক রনি

নাটোর জেলা সদর থেকে প্রায় ২০ কি. মি. পূর্বে গুরুদাসপুর থানায় মহারাজপুর জামা'ত অবস্থিত। ১৯৭৩ বা ১৯৭৪ সালে মহারাজপুর জামা'তের সর্বপ্রথম আহমদী হিসেবে বয়াত গ্রহণ করেন জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সরকার। মোয়াল্লেম নুরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব তার বয়াত পড়ান। নুরুল ইসলাম সাহেব তার এক নিকটাত্মীয়ের কাছে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন পড়ে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পান। এই সত্যের সন্ধানে তেবাড়ীয়া জামা'তের ডাক্তার আফির সাহেব তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। তার বয়াত গ্রহণের পর তার বন্ধু পুরুলিয়া গ্রামের জনাব আবুল কালাম আজাদ মাস্টার বয়াত গ্রহণ করেন। নুরুল ইসলাম সাহেব ১৯৭৪ সালে নিজ বাড়ি মহারাজপুরে সর্বপ্রথম আযান দেয়ার মাধ্যমে নামায পড়া শুরু করেন। প্রথম জুমুআ'র আযান দেন ডা. আফির উদ্দিন (তেবাড়ীয়া) এবং নামায পড়ান মোয়াল্লেম নুরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব। নুরুল ইসলাম সাহেবের তবলীগে মহারাজপুর-এর প্রখ্যাত আলেম হালসা উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড-মওলানা জনাব জারজিস হোসাঈন বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তার বয়াত পরিচালনা করেন আবু তাহের মোয়াল্লেম সাহেব। এসব বয়াত গ্রহণ করার পরপরই চারদিকে বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। যার ফলে তবলীগ করা বন্ধ হয়ে যায়। তবে গোপনে কিছু যুবক বয়াত করেন, তারা হলেন আলাউদ্দিন মোল্লা, লোকমান মুসল্লী, আব্দুল ওয়াহাব, এনামুল হক সরকার, নজরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, আজিজুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, শুক্কুর আলী, জালাল উদ্দিন, ইমদাদুল হক, মোজাম্মেল হক সরকার প্রমুখ। এরপর আবার ১৯৮২ বা ১৯৮৩ সালে চরম বিরোধিতা শুরু হয়। তখন পুরুলিয়া জামা'তে গিয়ে মহারাজপুর জামা'তের কার্যক্রম চালাতে হত।

সত্যের বিরোধিতা চিরকালই হতে থাকবে। এটি একটি অমোঘ বিধান। এর ধারাবাহিকতায় পুরুলিয়াতেও ১৯৮৭ সনে রমযান মাসে চরম বিরোধিতা হয়। এমনকি একদিন তারা অতর্কিত আক্রমণ করে বসে যার ফলে জামা'তের মোয়াল্লেম হোসাইন আহমদ ছাড়াও নজরুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, আলাউদ্দিন মোল্লাসহ বেশ কয়েকজন মারাত্মক আহত হন। তাদের অনেককে হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি করা হয়। এর পরপরই গ্রামের তিনজন সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব আব্দুল নূর মোল্লা, আব্দুল কাদের মোল্লা এবং আলহাজ্জ কলিম উদ্দিন মাল বয়াত গ্রহণ করেন। আহমদীয়া জামা'তের মানবপ্রেম, মমত্ববোধ এবং আহত রোগীদের প্রতি সেবার মান দেখে তারা ভীষণ অভিভূত হন। তাদের বয়াতের ফলশ্রুতিতে উক্ত এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে মহারাজপুর গ্রামেও বিরোধিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অ-আহমদীরা আহমদীদেরকে দেখলেই পথে-ঘাটে নানা রকম গালিগালাজ, কটূক্তি, অপমান, অপদস্থ করে। অনেক সময় গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে থাকে। এমনকি একপর্যায়ে বাড়ি-ঘরের ওপর হামলাও করে বসে। খেতের ফসল, গাছের ফলমূল, বাড়িঘরের আসবাবপত্র চুরি ও লুটতরাজ করতে থাকে। কিন্তু এরপরও গোপনে জামা'তের কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আহমদীয়াত প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এই গ্রামগুলো হল : পুরুলিয়া, মেরিগাছা, নাজিরপুরহাট, ধানুড়া, হালসা, গুরুদাসপুর, লক্ষ্মীপুর, গোপীনাথপুর, ভজেরমোড়, রাজাকার মোড়, খলাবাড়িয়া, ব্রিপাথুরিয়া, বনপাড়া, দোগাছি ইত্যাদি।

১৯৯০ সালে তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোস্তফা আলী সাহেব মহারাজপুরকে জামা'ত হিসেবে সদয় অনুমোদন দান করেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে জনাব আব্দুল নূর মোল্লাকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি নিজ বাড়িতে একটি ঘরকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য এবং জামা'তের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ছেড়ে দেন। আমৃত্যু অর্থাৎ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসাবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুর পর তারই দানকৃত জায়গায় একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের জমি দান করার ক্ষেত্রে তার স্ত্রীরা যথাক্রমে মোহতরমা খোদেজা বেগম সাহেবা এবং মোহতরমা সামিয়া বেগম সাহেবা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

তার ইন্তেকালের পর মহারাজপুর জামা'তে পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ ব্যক্তিগণ প্রেসিডেন্ট হিসাবে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এরা হলেন সর্বজনাব তৌহিদুল ইসলাম (১৯৯৯-২০০১), সেলিম আহমদ কাজল (২০০১-২০০৩), গোলাম মোস্তফা বাবুল (২০০৩-২০০৫), তৌহিদুল ইসলাম (২০০৫-২০০৬) এবং সর্বশেষ গোলাম মোস্তফা বাবলু (২০০৬-বর্তমান)।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মহারাজপুর-এর প্রতিষ্ঠাতা যয়ীম ছিলেন জনাব আব্দুল নূর মোল্লা সাহেব। তার মৃত্যুর পর জনাব খবির উদ্দিন প্রামাণিক, জনাব নজরুল ইসলাম এবং বর্তমানে জনাব এনামুল হক সরকার দায়িত্ব পালন করছেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মহারাজপুর-এর প্রতিষ্ঠাতা কায়েদ ছিলেন জনাব নজরুল ইসলাম। এরপর জনাব আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হুমায়ূন কবির, আব্দুল গফুর, সেলিম আহমদ কাজল, গোলাম মোস্তফা বাবলু, রশিদুল ইসলাম, রাকিবুল ইসলাম সাহেব, হাফেজ মনসুর আহমদ সাহেব মহারাজপুর মজলিসের কায়েদ ছিলেন। বর্তমানে রকিবুল ইসলাম লিপু মহারাজপুর মজলিসের কায়েদের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ মহারাজপুর-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোহতরমা আমেনা বেগম সাহেবা। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সাহানা বেগম সাহেবা, রীতা বেগম সাহেবা, মোছা. সাহারা খাতুন সাহেবা এবং বর্তমানে মিসেস শাহনাজ সাহেবা প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

মহারাজপুর জামা'তের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিরোধিতার কারণে বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭৪/ '৭৫ সনে মোল্লা হুজুরদের প্ররোচনায় গ্রামের সাধারণ মানুষ আহমদীদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। আবার ১৯৮৮ সনে বাড়ি-ঘরে মিছিল করে এসে অতর্কিত ঘরের সকল জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এসময় হামলাকারীরা হাজী কলিম উদ্দিনের বাড়ি ভেঙে ফেলে। ফলে তাকে মহারাজপুর থেকে নাটোর শহরে হিজরত করতে হয়। একই বছর আলাউদ্দিন মোল্লার বাড়িতে হামলা করে ধান-চালসহ সব জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে যায়। হামলাকারীরা তার বৃদ্ধ মা শোভাজান বেগম সাহেবার কান ছিঁড়ে, তাকে রক্তাক্ত করে তার গয়না

ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এমন বিপদকালে ভ্রাতৃত্বের সুমহান আদর্শকে ধারণ করে নিপীড়িত, অত্যাচারিত আহমদীদের পাশে যেসব মহৎ ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়েছেন তারা হলেন, মোহতরম মোস্তফা আলী সাহেব, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, মোয়াল্লেম আবু তাহের সাহেব, মওলানা ফারুক আহমদ শাহেদ সাহেব, হোসাইন মোহাম্মদ সাহেব, আবুল কাসেম আনসারী সাহেব, হাফেজ সেকান্দার আলী সাহেব, মেজর আসাদুজ্জামান সাহেব, বি.এ.এম.এ. সাত্তার সাহেব, ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব, এ.কে.এম রেজাউল করিম সাহেব, মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মিসেস মাসুদা সামাদ সাহেবা, প্রফেসর ড. তারিক সাইফুল ইসলাম সাহেব, মৌলভী নুরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব, ডা. আফির উদ্দিন সাহেব, দানিয়াল আহমদ সাহেব এবং জেড.এম. রাজ্জাক সাহেবসহ আরও অনেকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না'। তাই মহারাজপুরের আহমদীরা এসব আহমদী ভ্রাতাভগ্নীদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমীন।

মহারাজপুর জামা'তে হুযূর আনোয়ার(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন মোহতরম রাজা নাসির আহমদ সাহেব, হাফেজ মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব এবং মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবও হুযূর আনোয়ার(আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে মহারাজপুর সফর করেছেন।

যারা মহারাজপুর জামা'তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ও অনন্য অবদান রেখেছেন এরা হলেন, সর্বজনাব মো. নুরুল ইসলাম, আব্দুল নূর মোল্লা, হাজী কলিম উদ্দিন মাল, মওলানা জারজিস হোসাঈন, নওশাদ মণ্ডল, খবির উদ্দিন প্রামাণিক, শোভাজান বেগম, জরিমন বেওয়া, খোদেজা বেগম, লোকমান মুসলিম, ছামিয়া বেগম, আমেনা বেগম এছাড়া আরো অনেকে। খাকসার এ জামা'তের একজন সদস্য হিসেবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস(আই.)-এর সাথে ২০০৫ সনে কাদিয়ানে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করি। আলহামদুলিল্লাহ্।

মহারাজপুর জামা'ত ধর্ম সেবার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'লার ফযলে পিছিয়ে নেই। কেননা এই জামা'তেরও রয়েছে কয়েকজন ওয়াকেফে জিন্দেগী যারা তাদের সব কিছু ধর্ম সেবার খাতিরে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাই তাদের আলোচনা করাটাও সমীচীন বলে মনে করছি।

১) মৌলভী মোজাফ্ফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। পিতা: শেখ লুৎফুর রহমান। তিনি ১৯৮৭ সনে বয়াত গ্রহণ করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন।

মহারাজপুর মসজিদ ও আহমদী সদস্যগণ

পরবর্তীতে ১৯৮৯ সনে ঢাকা বকশীবাজার দারুত তবলীগে অবস্থান করতঃ মোয়াল্লেম ট্রেনিং কোর্সে যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

২) এই অধম এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। পিতা: জনাব আব্দুল নূর মোল্লা। ১৯৮৭ সনে বয়াত গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সনে মোয়াল্লেম ট্রেনিং ক্লাসে যোগদান করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছে। খোদা তা'লা অধমকে বিশেষ রহমতে ভূষিত করেছেন। ১৯৯৯ সনের ৮ অক্টোবর শুক্রবার খুলনা জামা'তে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়ে চার মাস পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।

৩) মৌলভী মো. আব্দুস সালাম-১, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। পিতা: মোহাম্মদ হুজুর আলী মোল্লা। ১৯৯৫ সনের ১২ আগস্ট বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। বয়াতের পর তার চরম বিরোধিতা হয়। যেহেতু তিনি মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন তাই তাকে সরাসরি ১৯৯৬ সনে মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে বর্তমানে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে সেবা করে যাচ্ছেন।

৪) মৌলভী মো. আব্দুস সালাম-২, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। পিতা: আলহাজ্জ ইব্রাহীম সরকার, ১৯৯৬ সনের ২৬ জুলাই বয়াত গ্রহণ করেন। আহমদীয়াতের কারণে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সনে মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনিও বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে নিষ্ঠার সাথে সার্বক্ষণিক সেবা করে যাচ্ছেন।

৫) মৌলভী সেলিম আহমদ কাজল, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। পিতা: শেখ লুৎফর রহমান। ১৯৯৫ সনে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ২০০৭ সনে মোয়াল্লেম হিসেবে জামা'তের খেদমতে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে নিষ্ঠার সাথে সেবা করে যাচ্ছেন।

৬) মৌলভী মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। পিতা: মোজাম্মেল হক সরকার। তিনি একজন জন্মগত আহমদী। ছোটবেলা থেকে আহমদীয়া জামা'তের তালীম-তরবিয়তের পরশে ছিলেন। ২০০৭-২০১০ সনে অনুষ্ঠিত তিন বছরব্যাপী মোয়াল্লেম ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করে বর্তমানে জামা'তের কাজে নিয়োজিত আছেন।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এসব ওয়াকেফে জিন্দেগীগণের সন্তান-সন্ততিও ওয়াকেফীনে নও হিসেবে জামা'তের কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন।

তাই খোদা তা'লার সমীপে আমাদের বিনীত আকুতি, তিনি যেন পূর্ববর্তী বুযুর্গদের ত্যাগকে ধারণ করে রাখার সামর্থ্য দেন। আমরাও এই শতবর্ষের শুভলগ্নে দিপ্ত কণ্ঠে, দৃঢ়তার সাথে এই অঙ্গীকার করছি, আমরা আমাদের সবর্স্ব দিয়ে ইনশা'ল্লাহ্ বাংলার মাটিতে আহমদীয়াতের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকব। নব শতাব্দীর শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে এই হল আমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি।

সুরভিত এক ফুল ইসহাক লস্কর স্মরণে

বিলকিস বেগম

পৃথিবীতে কত রকমের ফুল আছে তা কে জানে! সকল ফুলের রূপ, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্য কি এক? পৃথিবীতে এমনও অনেক মানুষ আছেন যারা ফুলের গন্ধ, বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য নিয়ে ভাবেন। তেমনি এক সুরভিত, প্রস্ফুটিত ফুল ছিলেন আমার নানা মোহতরম ইসহাক লস্কর সাহেব। যিনি তার নিজ কর্ম ও গুণ দ্বারা অনেকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন।

জনাব আব্দুল আলী মাস্টার সাহেব বর্ণনা করেন, "আমি তখনও নামাযী ছিলাম না। তোমার নানা গৌতমপাড়া মসজিদে ফজরের নামায পড়াতে যেতেন। বয়সে আমি তরুণ ছিলাম। একদিন খালি গায়ে ভোরের মৃদুমন্দ বাতাস লাগাচ্ছিলাম। আমাকে এভাবে হাঁটতে দেখে তোমার নানা হঠাৎ আমার বাহু চেপে ধরেন। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'হে আব্দুল আলী! কাল থেকে আমি যেন তোমাকে নামাযে দেখি।' বয়সে তরুণ হলেই বা কী! আমি সেদিন ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। পরদিন থেকে আমি নিয়মিত নামাযে যাওয়া-আসা শুরু করি। আর সেদিন থেকেই আমি নামাযী হয়ে গেলাম।"

জনাব আকবর আহমদ নাটাই সাহেব বর্ণনা করেন, "আমি তখন ছোট, খালার বাড়িতে থাকি। নিয়মিত মসজিদে নামায পড়তে যেতাম। তোমার নানা কাচারী থেকে এসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদুল মাহদীতে যোহরের নামায আদায় করতেন। একদিন বৃষ্টির দিনে আমি মসজিদে নামায পড়তে যাই। আমার পায়ের পেছনে কাদা লেগেছিল; তবে তা আমার জানা ছিল না। ইসহাক লস্কর সাহেব মসজিদে নামায পড়তে আসলেন। আমার পায়ে কাদা দেখে বাহির থেকে পাতা ছিঁড়ে এনে আমার গোড়ালি পরিষ্কার করে সোজা নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আজও আমার পায়ের সেই অংশে তার হাতের স্পর্শ অনুভব করি।"

আব্দুল জাহের হাজারী সাহেবের স্ত্রী কমলা দাদী বর্ণনা করেন: "আমাদের বাড়ির সামনের গ্রামের মধ্য রাস্তায় কোন এক বাচ্চা মলত্যাগ করে। এ নিয়ে দু'পাশের লোকদের মধ্যে তুমুল লড়াই। এ পাশের লোকেরা বলে ঐ পাশের বাচ্চা মলত্যাগ করেছে আর ঐ পাশের লোকেরা বলে এ পাশের বাচ্চা একাজ করেছে। এমন সময় তোর নানা এসে হাজির। দুই ব্যাগ ভর্তি বাজার। কাচারী সেরে বাজার নিয়ে এই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে ঝগড়ার কারণ আঁচ করতে পেরে, পথে বাজারের ব্যাগ রেখে সোজা আমার বাড়ি চলে এলেন। বললেন, 'একটা কোদাল দাও'। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোদাল দিয়ে কী করবেন? কথা না বাড়িয়ে সোজা কোদাল দিয়ে রাস্তার মলটি পরিষ্কার করে দিয়ে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।"

নানা দশম শ্রেণিতে পড়াকালে তার পিতার সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে বয়াত করেছিলেন। বয়াত গ্রহণের পরপরই তবলীগি কাজে বেশ উৎসাহী ছিলেন। সাহস করেই তার এক শিক্ষিত বুদ্ধিমান বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইকে তবলীগ করতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর কথা শোনার পর সেই বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই আব্দুল লতিফ খাঁ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং হাত দিয়ে বিশ্রী ইঙ্গিত করে আমার নানাকে ইমাম মাহদী সম্পর্কে অনেক কটূকথা বলেন। নানা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে যেভাবে হাত বক্র করে তিনি ইমাম মাহদীকে গালি দিয়েছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লতিফ খাঁর হাত সেরূপই রয়ে গেল। তার বক্র হাত আর তিনি সোজা করতে পারেন নি। আমি এসব কথা স্বয়ং নানাজানের কাছ থেকেই শুনেছি।

তাঁর জীবন-যাপন অনাড়ম্বর এবং খুবই সহজ-সরল ছিল। যৌবনকাল থেকে তিনি খুব নামাযী ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, সময়মত নামায পড়া, তাহাজ্জুদ আদায় ও দান-খয়রাত ছিল তার চরিত্রের অন্যতম অনুপম বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন দোয়া পড়ার তাহরীক আসত তখন তিনি উঠানে পায়চারী করে সেগুলো খুব জোরে-জোরে পাঠ করতেন যাতে করে অন্যরাও তা শুনতে পারে। দিনে-রাতে যখনই সুযোগ পেতেন তখনই কুরআন তেলাওয়াত ও নামায পড়তেন অথবা হাত তুলে লম্বা দোয়া করতেন। তার স্ত্রী অর্থাৎ আমার নানী দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থতার কারণে বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে স্ত্রীর সেবা করতেন। স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতেন।

একবার ছোট নানা বর্ণনা করেন: "আমি একদিন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠি। বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশা ছিল। শীতের ভারী পোশাক পরে আমি ওজুর উদ্দেশ্যে তোমার নানার উঠানের ওপর দিয়ে চাপকলের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ উঠানের মাঝে কোন একটা স্তূপ লক্ষ্য করলাম। স্তূপটির ওপর কুয়াশা পড়ে সাদা হয়ে আছে। ভাবলাম, উঠানের মাঝখানে এরূপ কিছু তো থাকার কথা নয়। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অবশেষে স্তূপটি মাথা তুলল। দেখলাম তিনি যে আমার ভাই ইসহাক লস্কর ছাড়া আর কেউ নন; কখন থেকে যে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন কে জানে!"

অনেক সময় ঘরে মেহমান থাকলে অথবা নানীর ঘুমের অসুবিধার কথা ভেবে নানা বাইরেই তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। এতে নানার কোন প্রকারের অসুবিধা হত না।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে বার্ধক্যজনিত কারণ ছাড়া জীবনে নানাকে অসুখে ভুগে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখি নি। জীবনে যা-ই হোক টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে দেখি নি। তাজা নিমের ডাল দিয়ে নিয়মিত দীর্ঘসময় ধরে দাঁত মাজতেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগেও তিনি দাঁত দিয়ে শক্ত খাবার খেতে পারতেন। বৃদ্ধ বয়সেও চোখে ভাল দেখতেন। জীবনে চশমা পরেন নি। কানে ভাল শুনতেন। প্রায়ই ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে প্রায় ৬ কি.মি. হেঁটে আসা-যাওয়া করতেন। খুব ভোরে কাঁচা ছোলা খাবার অভ্যাস ছিল। রমযান মাসে শুধুমাত্র লবণ পানি দিয়ে সিদ্ধ ছোলা বুট খেয়ে সানন্দে রোযা রাখতেন। বেশিরভাগ সময় এক তরকারী দিয়ে ভাত খেতেন। তিনি একজন ওসীয়তকারী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদা দিতেন। মানুষের প্রতি ভালবাসা ছিল অগাধ। তিনি মূলত স্বল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে প্রচুর কথা বলতেন।

একদিন আমার বাবা বর্ণনা করেন "যদি শ্বশুরবাড়ি যেতাম তবে বাহু ধরে টেনে নিয়ে শুধু ধর্মীয় কথা শোনাতেন, বিরক্ত হতাম। আজ ধর্মীয় কথা শোনার বড় ইচ্ছে হয়, কিন্তু শোনানোর মানুষটাই নেই।"

পরনিন্দা বা গীবত কাকে বলে নানার মাঝে আমি তা দেখি নি। এমনকি কোন বিষয়ে বৃথা আলোচনা বা সমালোচনাও করতেন না। গ্রামে এক বৃদ্ধা ছিলেন, যিনি এসে আমার নানার ঘরে সকালে আহার করতেন। বৃদ্ধার মনে অনেক দুঃখ ছিল। বৃদ্ধার ছেলের বউ বৃদ্ধাকে নানাভাবে কষ্ট দিত। ছেলের সংসারে বৃদ্ধাকে নিয়মিত গরুর জন্য ঘাস তুলতে হত। বৃদ্ধা তার দুঃখের কথা নিয়মিত বর্ণনা করতেন। আমার নানা-নানী উভয়ই বৃদ্ধার দুঃখে

দুঃখিত হতেন। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলতেন না। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে মৌনভাবে দুঃখ প্রকাশ করতেন।

আমার নানীও অত্যন্ত ধার্মিক ও খোদাভীরু মহিলা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে উত্তমরূপে গোসল সেরেছিলেন। দাঁত কয়েকবার মেজে পরিষ্কার করে আয়না দিয়ে দেখে নিয়েছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার কিছুদিন পর হুযূরের একটি ছবি আমি নানার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, ইনি আমাদের বর্তমান খলীফা। নানা এক পলক ছবিটি দেখেই অত্যন্ত আনন্দের সাথে ছবিটি বুকে চেপে ধরলেন।

১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হলে সেই আমেলার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরে ১৯৪০ সালে তিনি কায়েদের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। জামা'তের সেবায় তিনি কাদিয়ান ও রাবওয়া সফর করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তিনি নিয়মিত তবলীগ করতেন। ধর্মীয় কাজে প্রচুর সময় ব্যয় করতেন। সর্বদা মাথা নীচু করে হাঁটতেন। পথচারীরা তার নূরানী চেহারার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। তাঁর গায়ের রং ছিল হালকা গোলাপী। রোদে গেলে সম্পূর্ণ লালবর্ণ ধারণ করতেন।

১৯৮৭ সালে ঘাটুরায় প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। আমার নানা তখন আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার ছোট ভাই মাখন নিয়মিত আযান দিত। আর নানাজান বাড়ির সব ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে বাজামা'ত নামায পড়তেন। বড়ই আনন্দে আমাদের দিন কাটছিল। প্রায় ১৫/২০ দিন পর আমার বড় মামা ইয়াহিয়া লস্কর নানাকে নিতে এলেন। নানা তার পুত্র ইয়াহিয়া লস্করকে দেখেই দরজার কোণে লুকিয়ে পড়লেন। ঘরের পালা ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। মাথা নেড়ে যেতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। নানার এ অবস্থা দেখে আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া লস্করের চাপের মুখে আমার মা নানাকে তার ভাইয়ের সাথে যেতে দিলেন। সেদিন এই অসহায় বৃদ্ধের দুর্দশাগ্রস্থ মুখের দিকে একবারও কেউ তাকিয়ে দেখে নি, সেদিন তিনি কতটা দুঃখ পেয়েছিলেন হয়তবা তা কেউই বুঝে নি। কিন্তু আমার হৃদয়ে এখন তা দাগ কেটে আছে।

১৯৯৯ সালের ৭ই রমযান শতাধিক বছর আয়ুপ্রাপ্ত এই নিরলস খাদেমে দীন (ধর্মের সেবক) পরলোক গমন করেন।

Hazrat Maulana Syed Mohammad Abdul Wahed[rah.]
হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)
[১৮৫৩ - ১৯২৬]

সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ(রহ.)-এর মূল্যায়ন

সৈয়দ মীর মাসুদ আহমদ সাহেব লিখেছেন, "লাখনৌতে অবস্থানকালে হযরত সাহেবযাদা [অর্থাৎ সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ শহীদ(রা.)] ফারাঙ্গী মহল নিবাসী মওলানা আব্দুল হাই সাহেবের ছাত্র ছিলেন। মওলানা আব্দুল হাই সাহেব অন্য ছাত্রদের তুলনায় তাঁর দিকে বেশি স্নেহের দৃষ্টি দিতেন। অন্যান্য ছাত্ররা এ বিষয়ে অনুযোগ করলে তিনি বলেন, এর নাম কোমল (লতিফ শব্দের অর্থ কোমল) এর বংশও কোমল, এ কোমল মাটির সন্তান, এর বর্ণ ও অবয়ব কোমল– যেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা তার জন্য এতগুলো কোমলতা একিভূত করেছেন তার জন্য আমার পক্ষ থেকেও একটি কোমলতা থাকলই বা! তোমরা কেন মন খারাপ করছ? এখানে প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখযোগ্য, ফারাঙ্গী মহল নিবাসী মওলানা আব্দুল হাই সাহেবের উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মাঝে আরও দু'জন বুযুর্গ আহমদী ছিলেন, যারা জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হলেন, বঙ্গীয় আমীর হযরত মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এবং বিহারের আমীর হযরত মওলানা সৈয়দ আব্দুল মাজেদ সাহেব।" *(সৈয়দ মীর মাসুদ আহমদ সাহেব রচিত 'শায়খে আজম আওর আপকে শাগেরদ')*

Narrative of an Ahmadi doctor who served the Nusrat Jahan Scheme in Ghana (1994 to 2000)

Dr. Golam Kabir

I am from a renowned Muslim family in Fazilpur, Banglabazar, Begumganj, Noakhali. My maternal grandfather was the first graduate in his village and worked as a collector/clerk in the British period. My father was a primary-school teacher who encouraged all of his children to go for higher studies. Despite our limitations, we were respected as educated people in our village. My mother was our life-line and though was not institutionally educated, was one of the most knowledgeable persons I ever came across. My elder brother did his masters in applied chemistry and was the first University degree holder in our whole village. Unfortunately, he passed away in 2008. He is still my mentor and one of my leading sources of inspiration. He was always ahead of his time. (May Allah grant him highest place in Jannah). I came across Ahmadiyyat through my father in law whom I met while studying in Chittagong Medical College. I always had an inborn urge to find the truth about Islam but faced many troubles with my relatives who were Maulvis and always discouraged us to ask questions. I found that Ahmadiyyat is the true Islam and despite all the odds and opposition, accepted Ahmadiyyat in 1987, Alhamdolillah. I married Dr. Tamanna Khan (daughter of my beloved father in law Janab Aman Ullah Khan; who was a converted Ahmadi himself and my guide to Ahmadiyyat). My father in law was one of the most educated, learned and knowledgeable person I ever met. He departed in 1998 (May Allah grant him highest place in Jannah, Ameen).

Ahmadiyya Muslim Hospital Daboase started at a rented house and by 1997 this was the Hospital block we managed to build by the Grace of Allah The Almighty. Soon afterwards this became the district hospital for the region.

Daboase Ahmadiyya Hospital inauguration in 1997 (front row, from left: Dr. Gulam Kabir, Hon Minister of Health Eunice Brookman-Amissah and Ameer Abdul Wahab Adam of Ghana).

I had little idea at that time about Nusrat Jahan Scheme and came to know more about it through our Murabbi Sahibs especially from Mvi Feroz Alam Sahib and Mvi Imdadur Rahman Sahib. Our ex-Amir of Chittagong Jamaat Janab Nuruddin Sahib was the one who helped me a lot with the official procedures. Prior to starting my journey with my wife and our 3 month old daughter Naushin, I met Principal Musleh Uddin Khadem Sahib who went to Ghana as a teacher. He apprised me of the life and situation in

Dr. Kabir delivering his speech at the inaugural ceremony of Ahmadiyya Muslim Hospital Daboase (1997)

Ghana. We lost this very important member of Jamaat since (May Allah bless his departed soul, Ameen.

I went to participate in UK's Annual Jalsa Salana in 1992 and met Huzur Mirza Tahir Ahmad (aba) and expressed my interest in joining Nusrat Jahan Scheme. Huzur smiled at me and said "we need surgeons". I replied to Huzur, I am just an ordinary MBBS doctor with very little experience in surgeries. He replied, don't worry you will become a surgeon. By the Grace of Allah the Almighty I performed over 6000 operations of almost all categories during my stay in Ghana from 1994 to 2000. I came back to Bangladesh and joined my Government job in Kawkhali, Rangamati and waited for approval of Huzur. It took over two years to get the official permission to join Nusrat Jahan scheme in Ghana. We were posted to a new place known as Daboase, Western Region, Ghana. It was started by our predecessor Dr. Hafiz Ahmed from Pakistan who taught me a lot about surgery during the few weeks of transition period I had with him. I was told by Amir Abdul Wahab Adam that I have to build a proper hospital in Daboase. My first feeling was, oh God, I am just an inexperienced doctor with limited exposure to medicinal knowledge, how am I going to build a hospital; I have no experience in building anything and now I am asked to build a hospital. Ameer Sahib encouraged me a lot and said don't worry all our doctors before you succeeded doing so and you would too. By the Grace of Allah the Almighty we were able to construct our Hospital in Daboase within 3 years time. The Daboase Hospital was inaugurated by the then minister of Health, Ghana in 1997. We went to Ghana knowing nothing about it and our elder daughter Naushin Nawar was 3 months old at the time we went out of Bangladesh in 1994. She is studying Medicine at St Andrews University (2nd year in 2014). We were blessed with our 2nd daughter Nusrat Jahan while working in Ghana in 1995 who is studying Business Administration and Entrepreneurship in Edinburgh Napier University now. We moved to UK in 2000 and have been living

Dish antenna to watch MTA on at the roof of doctors' residence of Ahmadiyya Hospital, Daboase. Dr. Kabir and his two daughters (in 1997) now studying Medicine and Business Administration & Entrepreneurship respectively.

Dr. Kabir along with his two daughters Nusrat and Naushin met Huzur Khalifatul Masih the 4th (rah) in London in 1997 on the way to Bangladesh for a short visit.

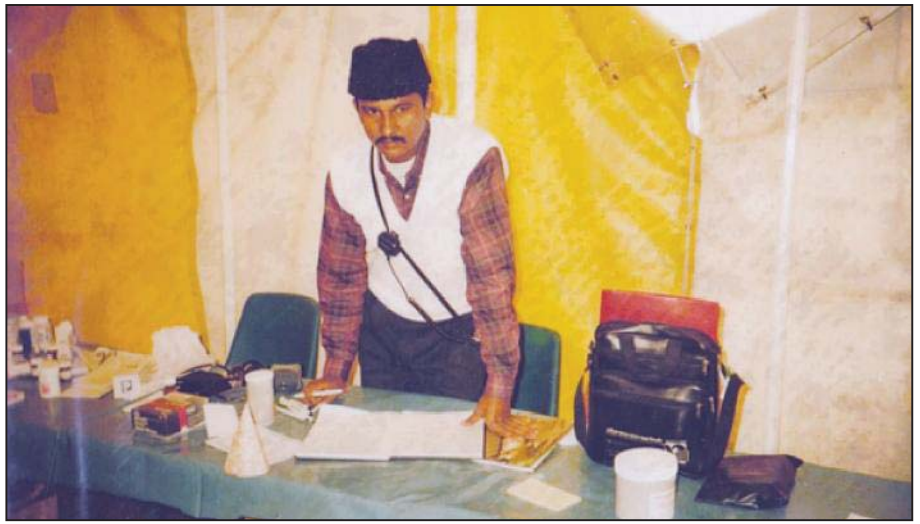

Dr. Kabir at London Jalsa Salana (Islamabad) in 1992 on his first visit to London, attending to the Jalsa participants and providing first aid in the medical camp

in Dundee since then.

There is so much to write and so much to express of our splendid experience in Ghana. As usual like other Nusrat Jahan doctors, we had to work with very limited facilities and by the grace Almighty Allah, were successful in treating hundreds of thousands of Ghanians who did not have any access to hospital facilities within a 40 mile radius. The patients used to visit us from faraway places and from nearby countries e.g. Nigeria, Burkina Faso, Sierra Leone, Ivory Coast etc. My beloved wife Tamanna Khan was always with me and we worked as a team in operating, treating patients and consulting during the construction of our hospital. We started out in a rented house from the chief of the town (nana) and by the time we left Ghana our Hospital was ranked as referral hospital in the district. Ameer Abdul Wahab Adam of Ghana was like a father to us during our stay in Ghana and helped us with all the facilities and co-operation we needed during the construction of the Ahmadiyya Hospital, Daboase in Western Region, Ghana. Hazrat Ameerul Mumineen , Khalifatul Masih the 5th (aba) visited and inaugurated Daboase Hospital officially during his visit in Ghana in 2004.

We are grateful to Allah the Almighty for giving us this opportunity to serve the ailing humanity through Nusrat Jahan scheme. If we think of any contribution to humanity which cannot be bought by all the material wealth we have, we would say that working in Ghana was the most significant time in our life and Allah willing, we would like to contribute more if possible. We had some engineer friends from India who were working in the Western region of Ghana. They came to our hospital as patients and became good friends later. They used to express their surprise about how we manage to stay in a village like Daboase. Our humble answer always was it was only by Allah's Grace. We had a locally made satellite dish and needed to tweak it every time to watch MTA which was installed on the roof of our residence. I used to change the direction of the dish antenna and ask my daughers whether the picture was clear. They used to shout from the room "ji abbu ekhon clear dekha jacche"

I have no hesitation in saying that our time in Ghana was the best part of our life and we would encourage any Ahmadi doctor to sacrifice their time and gain moral, spiritual and peaceful life in addition to a successful worldly life. We tried our level best. Working with the Jama'at made me a better person, an understanding human being and more humble towards ailing humanity. We are still in touch with our friends in Ghana and proud to say that I am a Ghanian too.

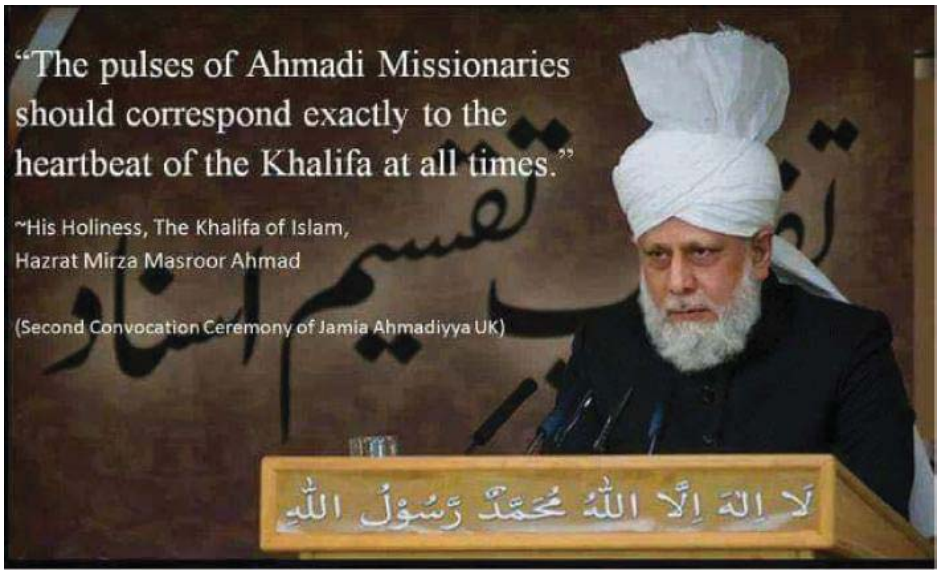

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর দৃষ্টিতে আহমদীয়া জামা'ত

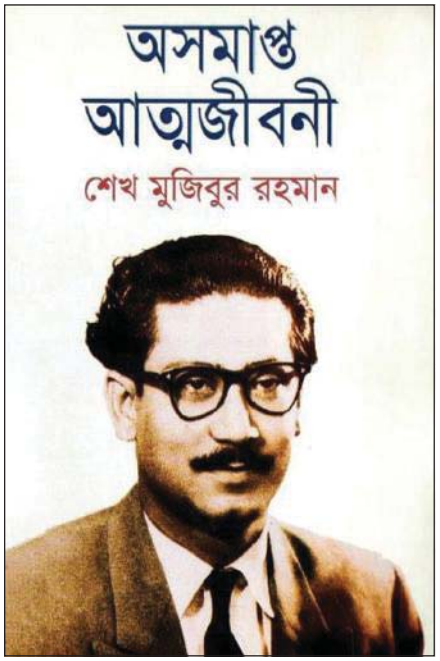

"খাজা সাহেবের আমলে পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তাতে হাজার হাজার লোক মারা যায়। লাহোরে মার্শাল ল' জারি করা হয়। আহমদিয়া বা কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন থেকে এই দাঙ্গা শুরু হয়। কয়েকজন বিখ্যাত আলেম এতে উসকানি দিয়েছিলেন। 'কাদিয়ানিরা মুসলমান না'—এটাই হল এই সকল আলেমদের প্রচার। আমার এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নাই। তবে একমত না হওয়ার জন্য যে অন্যকে হত্যা করা হবে, এটা যে ইসলাম পছন্দ করে না এবং একে অন্যায় মনে করা হয়—এটুকু ধারণা আমার আছে। কাদিয়ানিরা তো আল্লাহ ও রসুলকে মানে। তাই তাদের তো কথাই নাই, এমনকি বিধর্মীর উপরও অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা ইসলামে কড়াভাবে নিষেধ করা আছে। লাহোরে ও অন্যান্য জায়গায় জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে একসাথে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। যারা এই সমস্ত জঘন্য দাঙ্গার উসকানি দিয়েছিল তারা আজও পাকিস্তানের রাজনীতিতে সশরীরে অধিষ্ঠিত আছে।"

(অসমাপ্ত আত্মজীবনী : পৃষ্ঠা ২৪০ - ২৪১)

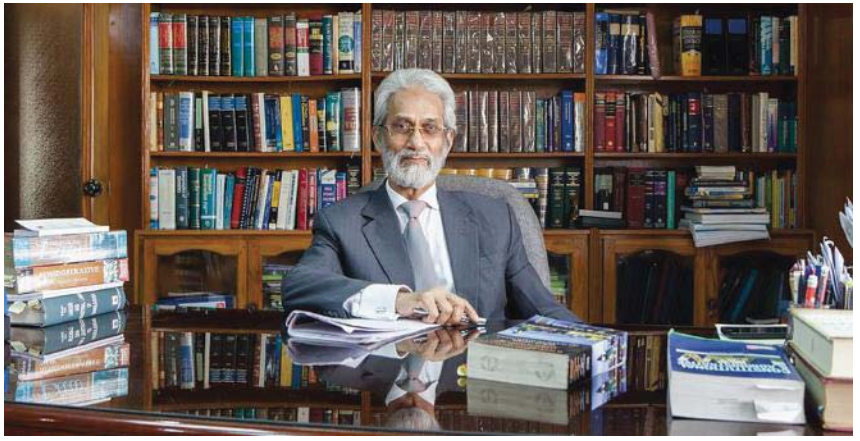

সাবেক এটর্নি জেনারেল এ এফ এম হাসান আরিফ যার ন্যায়-নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার কারণে আহমদীয়া জামা'ত তাঁর জন্য দোয়া করে থাকে। একটি কঠিন লগ্নে তিনি দৃঢ়তার সাথে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন এবং তাঁর নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। আল্লাহ্ তাঁর মঙ্গল করুন।

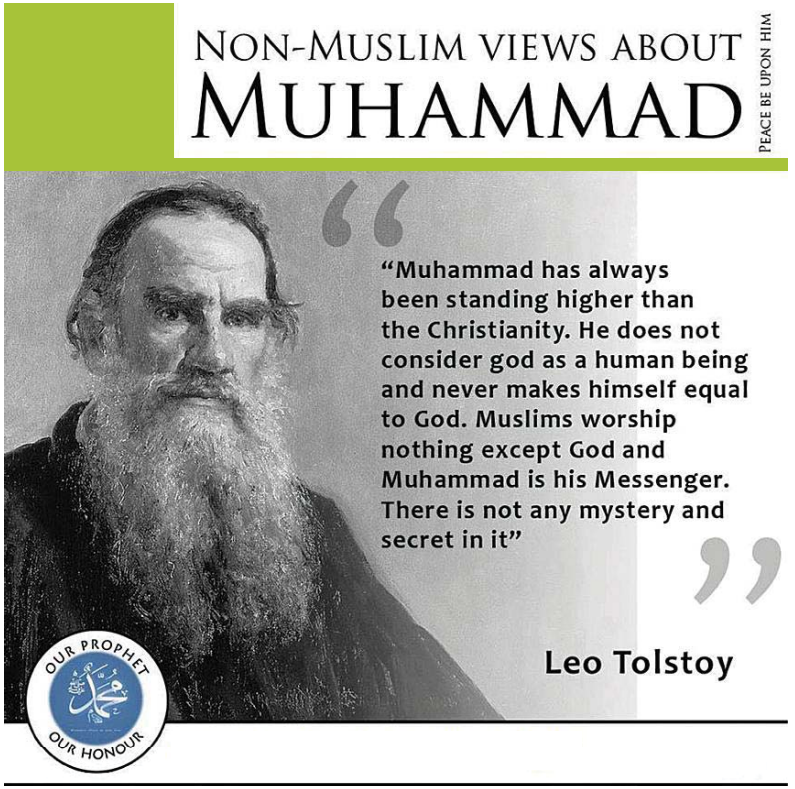

আমার স্মৃতি কথা

আলহাজ্জ সালেহ আহমদ

আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহ, তিনি আমাদের তাঁর মসীহ ও মাহদীকে মানার সৌভাগ্য দান করেছেন। মহানবী(সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী তাঁর হাতে বয়াত করার কল্যাণে ভূষিত করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা ও তাঁর নবী(সা.)-এর আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে, হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর মান্যকারীরা নিজেদের জীবনে আমূল পরিবর্তন করে জগতের জন্য আদর্শ হয়েছেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত অনুযায়ী তারা সফল জীবনের অধিকারী হয়েছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থাৎ যারা এ রসূলকে (তথা) এ উম্মী নবীকে অনুসরণ করে, যাকে তারা তাদের কাছে বিদ্যমান তওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। সে তাদের সৎ কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে তাদের নিষেধ করে, তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল ঘোষণা করে, অপবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করে, তাদের ওপর চেপে থাকা বোঝা এবং তাদের গলার বেড়ি থেকে তাদের মুক্তি দেয়। অতএব যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান দেয় ও সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে এর অনুসরণ করে, এরাই সফল হবে। *(সূরা আল আরাফ : ১৫৮)*

হযরত ইমাম মাহদী(আ.) বলেন, "তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) সে ব্যক্তিকে মনোনীত করে থাকেন, যে তাঁকে মনোনীত করে। যে ব্যক্তি তাঁর অন্বেষী তিনি তার সান্নিধ্যে আসেন। যে ব্যক্তি তাঁর দিকে ধাবিত হয় তিনি তার কাছে আসেন। তাঁকে যে প্রকৃত সম্মান প্রদান করে তিনিও তাকে সম্মান প্রদান করেন। তোমরা নিজ মন সরল করে এবং জিহ্বা, চোখ এবং কান পবিত্র করে তাঁর দিকে অগ্রসর হও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে গ্রহণ করবেন।" *(কিশতিয়ে নূহ)*

মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর আধ্যাত্মিক প্রস্রবন এবং তাঁর(সা.) পবিত্রকরণ শক্তির উত্তরাধিকারী হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর আধ্যাত্মিক ফুৎকারে তাঁর(আ.) জীবনে তাঁর অনুসারীদের মাঝে এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তাঁর খিলাফতের দ্বারা আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবনে এ পরিবর্তন সাধন করছেন। আলহামদুলিল্লাহ আজ হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর প্রত্যাশানুযায়ী এমন আশেকানদের দল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশেও অগণিত সংখ্যায় এমন আদর্শবান মানুষ ছিল, আছে এবং মহানবী(সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণে ও হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর দোয়ার ফলে এমন আদর্শ মানুষের দল সৃষ্টি হতে থাকবে, ইনশা'ল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عٰهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

অর্থাৎ মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মাঝে এমনও আছে যারা নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে। আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যারা এখনও অপেক্ষা করছে এবং তারা কখনও (নিজেদের সংকল্পের) কোন পরিবর্তন করে নি। *(সূরা আল আহযাব : ২৪)*

আমি বাংলাদেশে ১৯৮৭ সন থেকে কর্মরত আছি। উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমার দেখা এমন সব আশেকানদের কয়েকজনের কথা স্মৃতি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি। অনেকে ছিলেন কিন্তু আমি তাদের দেখি নি তাই সে সব মু'মিনদের কথা আমি বলতে পারছি না। আবার অনেকের কথা যাদেরকে দেখেছি এ অল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তাদের জন্য আমি পাঠকের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আমি মুরব্বি সিলসিলাহ হিসেবে আমার পিতা তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবকে ন্যাশনাল আমীর হিসেবে খুব কাছে থেকে দেখেছি তাঁর কথা দিয়ে শুরু করছি। তাঁর মৃত্যুতে যে সব সমবেদনার পত্র মুরুব্বী সিলসিলাহ ও তার পুত্র হিসেবে পেয়েছি তাতে তাঁর যে গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছিল তা হতে লিখছি, "তিনি সদাচারী, সত্যভাষী, নির্ভিক, খোদাভীরু, মহানবী(সা.) এবং হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর আশেক, খলীফায়ে ওয়াক্তের বিনাবাক্যে আনুগত্যকারী এবং তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর ব্যাপারে আদর্শ ছিলেন।" ১৯৩৪ সনে কাদিয়ানে হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-এর হাতে বয়াত করেন। ১৯৩৯ সনের খিলাফত জুবিলী জলসায় তাঁর ভাই মরহুম ডা. মূসা সাহেব ও মৌলভী এ. এইচ.এম.আলী আনওয়ার সাহেবের সাথে যোগদান করেন। তিনি মুস্তাজাবুদ দোয়া ছিলেন। আমি তাঁকে সর্বদা দোয়ায় রত থাকতে দেখেছি। আমরা আমাদের জীবনে তাঁর দোয়ার কল্যাণ ভোগ করছি। কুরআন শরীফের অনেকাংশ তার মুখস্ত ছিল তা তিনি তেলাওয়াত করতেন। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর আরবী কাসীদার অনেক অংশ মুখস্ত ছিল তা মনে মনে পড়তেন। দরূদ শরীফ দিয়ে জিহ্বা সিক্ত রাখতেন। তাঁর কাছ থেকে শুনেছি তিনি শৈশব থেকে নামায পড়তেন। এছাড়া নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন।
আহমদীদেরকে নিজের সন্তান হিসেবে দেখতেন। আমার সামনের একটি ঘটনা না বলে পারছি না। একবার একজন বললেন, আমীর সাহেব, অমুক ব্যক্তি নেযামে জামা'তের সাথে বড় বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে হুযূরকে লিখেন। মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব উত্তরে বললেন "বেচারা নিজেই পরীক্ষায় পড়ে গেছে, আমি কি তাকে ধাক্কা দিয়ে খোদার খলীফার অসন্তুষ্টির পাত্র বানিয়ে দিব? ধৈর্য ধরুন, দোয়া করুন। হুযূরকে কোন কিছু লিখতে হলে বহু দোয়া করতে হয়। কারণ তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি।" ধৈর্যের প্রতীক ছিলেন। বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সমস্ত পুস্তকাদি পাঠ করেছেন। কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর বইয়ের

গভীর জ্ঞান রাখতেন। প্রশিক্ষিত মুরব্বী হওয়া সত্ত্বেও বহুবার এসব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রাহে.)-এর নির্দেশে"– 'আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব' বই এবং তাঁর লেখা অন্যান্য বইগুলো তাঁর কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুস্তকাদির গভীর জ্ঞানের পরিমাপক। হুযূরকে তিনি বলেছিলেন, আমি এ কাজের শক্তি রাখি না হুযূর দোয়া করলে ইনশা'ল্লাহ পারব। এ বইটি লিখতে তিনি বহু দোয়া করেছেন এবং হুযূরকে বারবার দোয়ার জন্য লিখেছেন। বাংলাদেশ হবার পর তিনি যখন প্রথমবার রাবওয়া যান হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সময় আমিও সাথে ছিলাম। তাঁর প্রতি হুযূরের স্নেহ ও ভালবাসা দেখে অবাক হলাম এবং নিজেকে গর্বিত মনে করলাম। দেখামাত্র হুযূর মুচকি হেসে বললেন "বাঙ্গাল কা শের আয়া হ্যা" অর্থাৎ বাংলার বাঘ এসেছে। হুযূর দাঁড়িয়ে আমার পিতার কাছে এলেন এবং জড়িয়ে ধরলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) তাঁর মৃত্যুর পর আমাকে ও আমার মাতাকে যে সমবেদনার টেলিগ্রাম বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা আমার জন্য একটি বড় পাওয়া ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) এমটিএ-র এক বাংলা প্রশ্নোত্তরে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন "হযরত মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব খিলাফতের জন্য শানিত তরবারি ছিলেন।"

দ্বিতীয় যে ব্যক্তির সাথে আমার জামেয়ার ছাত্রাবস্থা থেকে পরিচয় ছিল এবং তাঁকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল তিনি হলেন চট্টগ্রামের মরহুম গোলাম আহমদ খান সাহেব যিনি ফালু মিঞা নামে পরিচিত ছিলেন। আমার দৃষ্টিতে তিনি একজন আদর্শ মু'মিন ছিলেন। খোদাপ্রেমিক, আশেকে রসূল, আশেকে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) এবং খলীফায়ে ওয়াক্তের একনিষ্ঠ আনুগত্যকারী ছিলেন। আমীরে জামা'ত ও নেযামে জামা'তের আনুগত্যে তিনি একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। মুস্তাজাবুদ দোয়া ছিলেন। তিনি তাঁর কবুলিয়তের অনেক ঘটনা শুনিয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর সাথে এক সাক্ষাতের সময় আমি তাঁর সাথে ছিলাম। ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র যে ভালবাসার স্বরে 'ফালু মিঞা' বলে

তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ জলসার এক অধিবেশনে

ডাকলেন। সে ডাকের মাধুর্য আজও আমার কানে গুঞ্জরিত হয়। তাঁর নেকী ও তাকওয়ার দৃষ্টান্ত হল তাঁর মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) নিজেই তাঁর হিস্যায়ে জায়েদাদের চাঁদা আদায় করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুস্তকাদি মূল উর্দূতে পাঠ করতে বহুবার দেখেছি। আমি তাঁকে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে চট্টগ্রামে তাঁর বাসায় তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন। উত্তরে ফার্সিতে একটি পঙ্‌ক্তি পড়লেন। যার অর্থ হল, হে খোদা তুমি ছাড়া আমার এ জীবন অসম্পূর্ণ, আমার দেহ ও মন অসুস্থ। আমাকে ডাকলে (অর্থাৎ মৃত্যু দিলে) তোমার সন্তুষ্টির চাদরে ঢেকে নিও" পঙ্‌ক্তিটি পড়ার পর তাঁর চোখ থেকে পানি টপটপ করে পড়ছিল। এ অবস্থায় তাঁর ব্যক্তিত্বের অনেক গুণাবলির পরিচয় পেলাম। অবাক হলাম তাঁর খোদাপ্রেম ও বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানের গভীরতা দেখে।

জামেয়ার ছাত্রাবস্থায় মরহুম আলী কাসেম আনসার সাহেবকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর মাঝে বহু গুণ দেখেছি। কাদিয়ানের পবিত্র পরিবেশের সুগন্ধি তাঁর কাছ থেকে পেতাম। নেযামে জামা'তের আনুগত্যে তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া সন্তানরা তাঁর দোয়া ও এসব গুণাবলির ফল ভোগ করছেন। আমীরের প্রতি তাঁর সম্মানের একটি ঘটনা আমি না বলে পারছি না। বাংলাদেশ হবার পর তিনি একবার মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সাথে রাবওয়া যান। রাবওয়া হতে চেনাব এক্সপ্রেসে করাচী যাচ্ছিলেন। প্রথম শ্রেণির দু'টি সিট যার একটি বার্থ একটি ওপরে অপরটি নীচে ছিল। আমি তার জন্য ওপরের বার্থে বিছানা করতে লাগলে তিনি বললেন, আমীর সাহেব নীচে থাকবেন তাই আমি ওপরে থাকব না। পরে তিনি নীচের সিটের একজনের সাথে তার সিট বদল করে নিলেন। আমি এখনও তাঁর আমীরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার কথা মনে করি। এ ঘটনা তার উত্তম আদর্শের বহু দিক নির্দেশ করে।

মরহুম মৌলভী এ.এইচ.এম আলী আনওয়ার সাহেবকে তাঁর বার্ধক্যে বিছানায় পড়ে থাকা অবস্থায় কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর অনুবাদ-কর্ম ও পাক্ষিক আহমদী তাঁর পক্ষ থেকে সদকা জারিয়া হিসেবে বহুকাল থাকবে। উর্দূ, আরবী, ফার্সি এবং বাংলা ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। বড় মাপের আলেম ছিলেন। আমি তাকে মানুষরূপী এক ফিরিশতা হিসেবে দেখি। ইবাদত বন্দেগীতে আদর্শ ছিলেন। মুস্তাজাবুদ দোয়া ছিলেন। প্রায়ই দোয়ায় রত থাকতেন। তাহাজ্জুদের সময় উচ্চস্বরে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পর ফজর পর্যন্ত কুরআন, হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর আরবী কাসীদা, ফার্সি ও উর্দূ নযম উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। সে বয়সেও তাঁর স্মরণশক্তি দেখে অবাক হতাম। নিশ্চয় তিনি তাঁর যৌবনে এগুলো পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেকে তাঁর কাছে দোয়ার আবেদন বা দেখা করতে আসলে তোহফা স্বরূপ টাকা দিয়ে যেত। তিনি তা কখনও নিজের কাছে রাখতেন না। আমি বহুবার দেখেছি তাঁর কাছে আসা ব্যক্তির চলে যাবার পর কোন না কোন ব্যক্তিকে ডেকে বলতেন এবং আমাকেও বলেছেন এ টাকাটা আমার পক্ষ থেকে চাঁদা দিয়ে রশিদ কেটে আন।

সিলসিলাহর এক অনন্য খাদেম ছিলেন। মরহুম মওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেব। সিলসিলার একজন বড় মাপের আলেম ও সফল মুরব্বী ছিলেন।

কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান রাখতেন। হাদীসের বড় মাপের আলেম ছিলেন। তখনকার অনেক অ-আহমদী আলেম ও লোকেরা মরহুমকে হাদীসের জাহাজ বলে ডাকত। আরবী, ফার্সি ও উর্দূতে পাণ্ডিত্ব রাখতেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র অস্ট্রেলিয়ার আমীর জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব (জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব ২৩শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন) বলেছেন, তিনি যখন নিজেকে হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-এর সামনে উৎসর্গ করেছেন তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.) বললেন, আপনি একজন আলেম। এ থেকে তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চ পর্যায়ের একজন বুযুর্গ ছিলেন। দরবেশ প্রকৃতির মুত্তাকী ছিলেন। আমার জামেয়ার ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার রাবওয়াহ গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে কাছে থেকে দেখার ও কিছু খেদমত করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও কবুলিয়তে দোয়ার ঘটনা আমি সুন্দরবন জামা'তের প্রবীনদের কাছ থেকে শুনেছি। মওলানা আবুল মুনির নুরুল হক সাহেবের মত আলেমগণ তাঁর বন্ধু ছিলেন।

মরহুম ডা. আব্দুস সামাদ সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি তখন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মজলিসে আনসারুল্লাহর সদর ছিলেন। অমায়িক মানুষ ছিলেন। তাঁর মত ভদ্র লোক এখন আর দেখি না। বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও সাদামাটাভাবে চলতেন। শৈশব ও যৌবন কাদিয়ানে কাটিয়েছেন। সিলসিলাহর প্রখ্যাত সাহাবী এবং বুযুর্গদের সাহচর্যে ছিলেন। তাই তাঁর সাহচর্যে যারা এসেছে তারা তাঁর কাছ থেকে কাদিয়ানের পবিত্র পরিবেশ যেখানে কথা ও কাজে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা ও এর ওপর আমলের নমুনা দেখেছেন। কুরআনের প্রতি গভীর প্রেম ছিল। নিয়মিত কুরআন পাঠ ও তারাবীহর নামায বাজামাত পড়া সত্ত্বেও তিনি রমযান মাসে হাফেযে কুরআন রেখে তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ কুরআন শুনতেন। আমি অবাক হতাম, এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি এসব কাজ কীভাবে করতেন। তাঁর সাথে কথা বললে কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পুস্তকাদির যে কত গভীর জ্ঞান রাখতেন তা জানা যেত। আমি কয়েকবার তাঁর ব্যাগে কুরআন শরীফ ও হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর ইলহাম সম্বলিত পুস্তক তাযকেরা দেখেছি। এরূপ করা তাঁর অনেক গুণাবলির পরিচায়ক। তাঁর উত্তম আদর্শ ও গুণাবলির অনেক আহমদী ও অ-আহমদী সাক্ষী আছেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে প্র্যাকটিস করতেন। আমি যতবার নারায়ণগঞ্জে গিয়েছি মরহুমের গুণাবলির কথা শুনেছি। হযরত রসূল করীম(সা.)-এর প্রতিবেশীর সাথে উত্তমাচরণের আদেশ পালনের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তাঁর প্রতিবেশী বঙ্গবন্ধু-এর সাক্ষী ছিলেন। ভোর বেলায় মরহুমের বাড়ি থেকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি শোনার সাক্ষ্যও তিনি দিয়েছেন। তাঁর উপদেশ দেয়ার ধরন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। গরীব ধনী সবার সাথে সানন্দে মিশতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, তিনি গরীবদের লালন করতেন। নবদিক্ষীতদের তা'লীফে কুলূব-এর ব্যাপারে তিনি এক আদর্শ ছিলেন।

এখানে তাঁর সহধর্মিণী সম্পর্কে বলতে হয়। কাদিয়ানের পবিত্র পরিবেশে লালিত পালিত মরহুমা মাসুদা সামাদ সাহেবার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এই মু'মিনার মধ্যে সেখানকার তৎকালীন বুযুর্গদের ছায়া পরিলক্ষিত হত। গুণাগুণের সমাহার তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল। আমার দেখায়, তাকওয়া, ঈমান, ধর্মীয় জ্ঞানের দিক থেকে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। তাঁর যেমন কুরআন মুখস্ত ছিল তেমনি শত শত দোয়া মুখস্ত ছিল। ইবাদত-বন্দেগীর আশেক ছিলেন। কাদিয়ানের বুযুর্গদের বিশেষভাবে হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-এর দোয়ার পূর্ণতার প্রতীক ছিলেন। মুস্তাজাবুদ দোয়া ছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে বর ও কনের জন্য যেভাবে দোয়া করতেন তা আজ অনেকের জন্য আদর্শ। আমার বিয়েতে তিনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে নিয়ে দোয়া করেছিলেন আমি আজও তাঁর দোয়ার বরকত অনুভব করি। অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন। তাঁর সাথে যে-ই কথা বলেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব তাকে প্রভাবিত করেছে। আমি স্বয়ং এর সাক্ষী। মৃত্যুর পূর্বে একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, খালাম্মা কেমন আছেন, তিনি আমাকে উর্দূতে বললেন, আমি তো এখন এই দোয়া করি "রাব্বি আমিতনি ওয়া আনতা রাযিন আন্নি" অর্থাৎ হে আমার রব, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় মৃত্যু দিও। আমি বললাম, আমীন। আজ তাঁর সন্তানরা তাঁর দোয়ার ফল ভোগ করছেন।

আমি আমার চাচা ডা. মূসা সাহেবের কথা বলছি। তিনি এক দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং একজন মুত্তাকী ছিলেন। একবার আমি মরহুম শহীদুর রহমান সাহেবকে যিনি নিজেই এক মু'মিন ছিলেন এবং জামা'তের একজন দেওয়ানা ছিলেন, ডা. মূসা সাহেব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তিনি ফিরিশতাসূলভ মানুষ ছিলেন। একই কথা জামা'তের নিষ্ঠাবান খাদেম মরহুম শামসুর রহমান এবং মরহুম এ.কে.এম রেজাউল করীম সাহেব আমাকে বলেছেন। গরীব, এতীমের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। কুরআন হাদীসের গভীর জ্ঞান রাখতেন। নম্রভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। মুস্তাজাবুদ দোয়া ছিলেন। তিনি তাঁর বড় ভাই মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবকে যেভাবে মান্য ও শ্রদ্ধা করতেন তা আমি আজ পর্যন্ত কারও মাঝে দেখি নি।

লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। অনেকের কথা মনে পড়ছে, পাতার পর পাতা এসব বুযুর্গদের স্মৃতিচারণে লিখতে পারব। তবে এদের মধ্যে যে বুযুর্গের কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ে তিনি হলেন সাবেক ন্যাশনাল আমীর মরহুম মোস্তফা আলী সাহেব। তাঁর অধীনে সিলসিলার খেদমত করার তৌফিক পেয়েছি। এ বুযুর্গের সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর মন্তব্য-ই তাঁর প্রশংসার জন্য যথেষ্ট। হুযূর বলেন, তিনি একজন কোমল স্বভাবের সাদাসিদে মানুষ ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে বহু গুণের সমাহার ছিল। তাঁর অধীনে খেদমত করার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। সুযোগ হলে ইনশা'ল্লাহ লিখব।

আরেক বুযুর্গের কথা মনে পড়ছে। তিনি হলেন অনলবর্ষি বক্তা, আলেমে দীন, সাবেক ন্যাশনাল আমীর মরহুম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। একবার আমি তাঁর ময়মনসিংহের বাসায় মরহুম মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবের সাথে গিয়েছিলাম এর পর আরেকবার এক রাত তাঁর বাসায় ছিলাম। দেরী করে ঘুমাতে যাওয়া সত্ত্বেও তাহাজ্জুদের সময় উঠে গেলেন। নামাযে ফজর একসাথে পড়লাম। লক্ষ্য করলাম নামাযে কান্নাকাটি করে দোয়া করার কারণে তাঁর চোখ লাল হয়ে আছে ।

আরেক বুযুর্গ জামা'তের একনিষ্ঠ সেবক মরহুম মুতিউর রহমান সাহেব। ধর্মীয় জ্ঞান রাখতেন। জামা'তের কাজে অক্লান্তভাবে কাজ করতেন, দেখে ঈর্ষা হত। মরহুম ও আমি একসাথে হজ্জ করেছি। আমি সেখানে তাঁর বহু গুণাবলি দেখেছি। ১৯৮৮ সনের দিকে আমি জামা'তের ট্যুরে পটুয়াখালী যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন, আমার ছেলে তারেক মুবাশ্বেরের সাথে দেখা করবেন। তাঁকে নসীহত করবেন এবং সফরে দোয়া করবেন। আমার বাসনা, সে যেন জামা'তের সেবক হয়, আল্লাহ তা পূর্ণ করেছেন। আজ তারেক মুবাশ্বের লণ্ডনে ইসলামের যে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছে তা প্রমাণ করে তিনি এক মুস্তাজাবুদ দোয়া ছিলেন। তাঁর সন্তানরা আজও তাঁর দোয়ার ফল ভোগ করছে। তাঁর বহু স্মৃতি মনে পড়ছে। কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে, দেখে আর লিখছি না। তাঁর আহমদীয়াতের জীবন

অনেকের জন্য আদর্শ।

সুন্দরবন জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ সফর উদ্দীন সাহেবের কথা ভুলতে পারি না। প্রায় সাত বছর তাঁর সাথে জামা'তের খেদমত করার তৌফিক পেয়েছি। আমৃত্যু জামা'তের সেবা করে গেছেন। খুবই সাদামাটা সরল মনের মানুষ ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য তাঁর যে ত্যাগ রয়েছে তা এক আশেকে আহমদীয়াতের প্রমাণ বহন করে। দোয়াগো মানুষ ছিলেন। তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। নেকী ও তাকওয়ার অনেক কথা মনে পড়ছে। আল্লাহ তা'লা তৌফিক দিলে তা ইনশা'ল্লাহ ভবিষ্যতে লিখব।

সুন্দরবন জামা'তের আরেক বুজুর্গ শেখ জোনাব আলী সাহেব। ধর্মীয় জ্ঞানের আধিকারী ছিলেন। সারাটা জীবন ধর্মের সেবা করে গেছেন। দোয়াগো ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁর নেকীর অনেক কথা মনে পড়ছে। আল্লাহ তা'লা তৌফিক দিলে তা ইনশা'ল্লাহ পড়ে কখনও লিখব।

জামা'তের একনিষ্ঠ খাদেম, জামা'তের জন্য যাঁর লেখনী ক্ষুরধার ছিল, নিয়মিত জামা'তের কাজ করতে দেখেছি মরহুম মকবুল আহমদ খান সাহেব, মোয়াল্লেম দরবেশ আব্দুস সালাম সাহেব, মরহুম শহীদ এটিএম হক সাহেব, যিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে আল্লাহ তা'লার প্রিয় পাত্র হবার পরিচয় দিয়েছেন। জামা'তের একনিষ্ঠ সেবক মরহুম ব্যারিস্টার শামসুর রহমান সাহেব ও সৈয়দ সাইদ আহমদ সাহেব, সহজ সরল মরহুম নুরুদ্দীন আমজাদ সাহেব, যাঁর মৃত্যুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) তাঁর বোন মরহুমা মাসুদা সামাদ সাহেবাকে সমবেদনা পত্রে তাঁর প্রশংসা করেছেন। মরহুমা নিজে আমাকে হুযূরের এ পত্রের কথা বলেছেন। এছাড়াও ছিলেন চট্টগ্রামের মরহুম খাজা আহমদ সাহেব।

এসব বুযুর্গ ছাড়া অনেকের কথা এখানে বাদ পড়েছে যাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে এবং তাঁদের হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-এর সাক্ষাত হয়েছে বা তারা হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-কে দেখেছেন। অসংখ্য এমন বুযুর্গান এদেশে গত হয়েছেন যাদের সাথে আমার দেখা হয় নি। এসব নিষ্ঠাবান আহমদীয়াতের সেবক ও আশেকে রসূল সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-এর একটি উক্তি তুলে ধরছি যা তাঁদের মর্যাদা আমাদের সামনে তুলে ধরবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.) ১৯৪৬ সনে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় সেখানে উপস্থিত শূরার সদস্যদের বলেন, "যারা হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর যুগ পায় নি কিন্তু আমাকে পেয়েছে (অর্থাৎ আমাকে দেখেছে-অনুবাদক) তারাও এক ধরনের সাহাবী কেননা আমি "মসীলে মসীহ" [অর্থাৎ মসীহ মাওউদ(আ.)- এর প্রতিবিম্ব।"]

জামা'তের আরেকজন বুযুর্গ মরহুম ভিজির আলী সাহেবের কথা মনে পড়ছে। সহজ সরল, নামাযী, মুত্তাকী এবং জামা'তের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। এতায়াত নেযামের বিষয়ে এক আদর্শ বুযুর্গ ছিলেন।

কটিয়াদীর মরহুম কবিরাজ ইজাজুল হক সাহেবের অনেক কথা স্মৃতিতে ভেসে উঠছে, তাও এক ইতিহাস। অত্যন্ত পাক পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন। বিগলিতচিত্তে দোয়া করতেন। জামা'তের কর্মকতা ও মুরব্বী সিলসিলাহর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দেখার মত ছিল। তার নেকী ও তাকওয়ার দরুন তাঁর এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তার সুখ্যাতি ও প্রভাব ছিল।

বাংলাদেশ জামা'তের আরেক বুযুর্গের কথা বলি। তিনি হলেন মরহুম ইয়ামীন সাহেব। তাঁকে আমি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, ভদ্র ও খোদাভীরু হিসেবে দেখতে পেয়েছি। জামাত'কে মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। ইয়ামিন সাহেবে বুযুর্গদের সন্তান ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় চোখ বন্ধ করে আর্থিক কুরবানী করে গেছেন। মহানবী(সা.)-এর আদেশ হল, "আল্লাহর রাস্তায় এভাবে ব্যায় কর যাতে করে ডান হাতে করা ব্যয়ের কথা বাম হাতও না জানে।" এ হাদীসটি ইয়ামীন সাহেবের জন্য প্রযোজ্য হয়। একবার লণ্ডন জলসায় তাঁর সাথে আমার দেখা হয়, সেখানে জানতে পারলাম, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.)-এর সাথে তাঁর অনেক যোগাযোগ। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, হুযূরের জন্য বাংলাদেশী খাবার রান্না করিয়ে নিয়ে যাই। হুযূর তা পছন্দ করতেন। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে এক জুমুআ'র পর তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, আমীর সাহেবের (মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব) কবর যিয়ারত করতে আমাকে যেতে হবে। মৃত্যুর প্রায় আড়াই বছর আগে তিনি ফোন করলেন, অমুক দিন আমি আহমদনগর যাব। বললেন, তুমি ও ভাই নুরুদ্দীন খান সাহেব আমার সাথে যাবে। ভোর বেলা এসে আমার বাসায় নাস্তা করবে এবং এরপর আহমদনগরের জন্য যাত্রা করব। প্রোগ্রাম অনুযায়ী যথাসময়ে আহমদনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি এক রাত থেকে পরদিন সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সারা রাস্তা জামা'তের বুযুর্গদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর পিতামাতা এবং আমার পিতার দোয়ার কথা বলতে বলতে গেছেন। তিনি কষ্ট করে শুধুমাত্র মরহুম আমীর সাহেবের কবর যিয়ারত করতে গেছেন। আমীরের প্রতি তাঁর এ শ্রদ্ধাবোধ দেখে আমি অবাক হলাম। তাঁর দান খয়রাতের কোন হিসেব নাই। বহু মসজিদের আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিয়েছেন। এসব আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিয়ে তাঁর নাম প্রকাশ না করার আবেদন করতেন। কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহর শ্বেতপাথর লাগানোর পূর্ণ ব্যয়ভার তিনি বহন করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ আর্থিক কুরবানী তাঁর পুণ্যবান পিতামাতার দোয়ার ফল ছিল।

জামা'তের আরেক বুযুর্গ বদরুদ্দীন সাহেব যিনি আমার শ্বশুর ছিলেন। আমার বিয়ের পর তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। হিন্দু থেকে আহমদী হয়েছিলেন। আহমদীয়াত তাঁর জীবনে যে আমুল পরিবর্তন করেছে তা হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) ও খিলাফতের পবিত্রকরণ শক্তির দিপ্তীমান সাক্ষী। দেখে মনে হত তাঁর যেন নবজন্ম হয়েছে। আমি তাঁকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াত হিসেবে দেখেছি। তিনি আমাকে তাঁর নামায সম্বন্ধে বলেছেন, আহমদী হবার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করি। তাহাজ্জুদে উঠতাম, নামায পড়তাম, অনেক কষ্ট হত। মশার কামড় আমাকে নামায পড়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করত। তখন চিৎকার করে দোয়া করতাম, হে মুহাম্মদ রসূল(সা.)-এর খোদা-তুমি যদি জীবিত হও এবং নামায যদি তোমার ইবাদত হয়ে থাকে তবে তুমি আমাকে নামায পড়ার শক্তি দাও। নামাযের পথে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে দাও। তিনি বলেন, এরপর নামাযের স্বাদ পেলাম। তিনি তাঁর জীবনের কবুলিয়তে দোয়ার অনেক ঘটনা আমাকে বলেছেন। আমি তাঁকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে তৎকালীন আমীর সাহেব তাঁর রোগমুক্তির জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রাহে.)-এর নিকট দোয়ার জন্য লিখেন। হুযূরের দোয়ায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে তিনি ফিরে আসেন। তাঁর ডাক্তাররা বলেছিল, এ এক অসম্ভব ব্যাপার। আহমদী হবার পর প্রথমে তাঁর হিন্দু আত্মীয় ও পরবর্তীতে অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা হয়। কিন্তু তাঁর দৃঢ় ঈমান ও তাঁর দোয়ায় এসব বিরোধিতা ধোঁয়ার মত বিলীন হয়ে যায়। তিনি গোপনে অনেক নেকী করতেন তা অনেকেরই অজানা। গরীব দরদী ছিলেন, মেহমান নেওয়াজ ছিলেন। আমীরের এতায়াতে আমি তাঁকে

এক দাসের ন্যায় দেখেছি। তবলীগ করা তাঁর নেশা ছিল। আমি তাঁকে কয়েকবার দেখেছি, লোকদেরকে নিজের বাসায় ডেকে সারা রাত তবলীগ করতেন এবং এর সাথে আপ্যায়নও করতেন।

চট্টগ্রামের আরেক বুযুর্গ হলেন মরহুম ফজল আহমদ সাহেব। শেষ জীবনে তিনি নিজেকে হযরত খলীফাতুল মসীহর সামনে তবলীগের জন্য পেশ করলে হুযূর তাকে লিখেছেন, আপনি রাশিয়া যান এবং সেখানে গিয়ে দোয়া করুন। এ কথা তিনি আমাকে বলেছেন। এ থেকে তাঁর বুযুর্গ হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবলীগের দেওয়ানা ছিলেন।

মরহুম আব্দুল বারী সাহেবের কথা না বলে পারছি না। তার সম্পর্কে মওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব আমাকে বলেছেন যার সারমর্ম হল, লিবিয়া থেকে চাকুরি হতে অবসর নিলেন। এসে মরহুম মোস্তফা আলী সাহেবকে বললেন এখন আমি অবসর পেয়েছি, নিজেকে জামা'তের সেবার জন্য আপনার সমীপে পেশ করছি। আমীর সাহেব বললেন, দাড়ি রেখে ফেলেন। কিছুদিন পর দাড়ি রেখে আমীর সাহেবের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। এতায়াতে আমীরের এক দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। আমি তাঁকে সদাচারী, নম্রভাষী ও একেবারে সাদাসিদে মানুষ হিসেবে দেখতে পেয়েছি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী আলাপচারিতায় মরহুম সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে বললেন, তিনি আমাকে পুতুলের মত করে আগলে রেখেছিলেন। মহানবী(সা.) বলেছেন ' তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে তার পরিবারের জন্য উত্তম।' এ হাদীস অনুযায়ী তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অর্ন্তভুক্ত। এটাই তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল।

ওয়াকেফে জিন্দেগীদের অনেককে দেখার সুযোগ হয়েছে। মরহুম মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব, মরহুম মওলানা আনিসুর রহমান সাহেব, যিনি কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মরহুম মওলানা ফারুক আহমদ শাহেদ সাহেব। তাঁরা তাঁদের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন তারা ওয়াকেফে জিন্দেগীর হক আদায় করেছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁদের নিজ সান্নিধ্যে স্থান দিন, আমীন।

ওয়াকেফে জিন্দেগী মোয়াল্লেমদের মাঝে মরহুম মনোয়ার আলী সাহেব, মরহুম আলী আকবর সাহেব, যাঁর সৌভাগ্য হল বেহেশতে মাকবারা রাবওয়াতে তিনি দাফন

হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)-এর সাথে
তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ

হয়েছেন, মরহুম সলিমুল্লাহ সাহেব, মরহুম দরবেশ আব্দুস সালাম সাহেব, মরহুম আহসানুল্লাহ পাটওয়ারী সাহেব, মরহুম আনসারী সাহেব, মরহুম শামসুজ্জামান সাহেব। তাঁরা সবাই নিজেদের দায়িত্ব পালন করে ওয়াকেফীনে জিন্দেগীদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ওয়াকেফে জিন্দেগীর অনেক স্মৃতি আছে। তা অন্য কোন সময়ে লিখার চেষ্টা করব, ইনশা'ল্লাহ।

জামালপুরের ডা. আব্দুল্লাহ্ আল মামুন সাহেব যিনি আমার তবলীগে বয়াত করেন। দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নুসরাত জাহান স্কিমের অধীনে ওয়াকফ করে আফ্রিকাতে মানবতার খেদমত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ওয়াকফ শেষে দেশে এসে হজ্জ করতে যান এবং মক্কাতেই ইন্তেকাল করেন।

বড় বাইশদিয়ার মরহুম গাজী ওমর ফারুক সাহেব এক অদ্ভুত ফিদায়ী মানুষ ছিলেন। তার গ্রামের একটি স্কুলে সীরাতুন নবী জলসার আয়োজন করেন। মরহুম মোস্তফা আলী সাহেব আমাকে সেখানে যেতে আদেশ করলেন। এ পুরোটা সফর-ই এক ইতিহাস। খোদার কাছে কৃতজ্ঞ, মরহুম ফারুক সাহেবের মাধ্যমে প্রথম আহমদী হিসেবে আল্লাহ তা'লা আমাকে বড় বাইশদিয়ার মানুষের কাছে প্রকাশ্যে আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছানোর সৌভাগ্য দান করেছেন। এ সফরে পটুয়াখালীর দেলোয়ার হোসেন, খাকদানের আলী আহমদ মাস্টার সাহেব, মরহুম বারেক মাস্টার সাহেব আরও কয়েকজন আমাদের সাথে ছিলেন। সেখানে উপস্থিত অনেকের মাঝে ফারুক সাহেবের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি এক দরবেশ ধরনের এবং তবলীগ-পাগল মানুষ ছিলেন। গরীব হওয়া সত্ত্বেও বড় মনের অধিকারী ছিলেন। খুলনা মসজিদের ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি একজন গাজী ছিলেন।

খুলনার শহীদদের কথা না বললে এ লেখাটি সম্পূর্ণ হবে না। শহীদ ডা.আব্দুল মাজেদ সাহেব, জি এম মমতাজউদ্দীন সাহেব, সোবহান মোড়ল সাহেব, জাহাঙ্গীর হোসেন সাহেব, নুরুদ্দীন আহমদ সাহেব, জি.এম. মুহিব্বুল্লাহ সাহেব। এঁদের সবার সাথে সাত বছর একসাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তাঁরা সবাই আমার মনের মানুষ ছিল। তাঁদের এতায়াতে নেযাম, জামা'তের জন্য নিষ্ঠা এবং তবলীগের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনুকরণীয়। তাঁদের প্রত্যেকের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল। আমি যেন তাঁদের পরিবারেরই এক সম্মানিত সদস্য ছিলাম। যেকোন কাজে ডাকলে এঁরা সবাই লাব্বায়েক বলতেন। সে সময় খুলনা জামা'ত এক আদর্শ জামা'ত ছিল। আমি সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এটাই বলব, তাদের শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করা তাঁদের সত্যিকার মু'মিন হবার সাক্ষ্য বহন করে। আমি তাঁদেরকে প্রতিটি কাজে খোদার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে দেখেছি।

খুলনার শহীদ জি.এম. আলী আকবর সাহেবের কথা আমি পৃথকভাবে লিখছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে(রাহে.) যখন বয়াতের টার্গেট দেয়া শুরু করেন তখন আমি খুলনা জামা'তের সদস্যদের সাথে মিটিং করে তবলীগের প্রোগ্রাম তৈরী করি। ডা.আব্দুল মাজেদ সাহেবকে বলি, আপনি নতুন জায়গায় মাসে কমপক্ষে একবার ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করুন এবং হিকমতের সাথে তবলীগ করুন। তিনি তা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি নিয়মিত সুন্দরবন জামা'তে যেতেন। চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি তবলীগও করতেন। শহীদ নুরুদ্দীন, জাহাঙ্গীর হোসেন, জি.এম মুহিব্বুল্লাহ এবং আরও তিনজন খাদেমকে বলি ছুটির দিনে যেকোন গ্রামে গিয়ে রাত কাটাবেন এবং

নফল ও তাহাজ্জুদ পড়ে সেখানকার লোকদের আহমদী হবার জন্য দোয়া করবেন। তাঁরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ এ প্রোগ্রামে লাব্বায়েক বলেন। এমনই এক প্রোগ্রামে জাহাঙ্গীর হোসেন, জি.এম. আলী আকবর সাহেবের গ্রামের মসজিদে যান। মাগরিবের নামাযে জি.এম. আলী আকবর সাহেব তাঁকে লক্ষ্য করেন। ইশার নামাযে তাঁকে লক্ষ্য করেন। এর কারণ ছিল শহীদ জাহাঙ্গীর নামাযে আবেগ আপ্লুতভাবে দোয়া করতেন। ইশার নামাযের পর তিনি এসে জাহাঙ্গীর সাহেবের সাথে পরিচিত হন। পরবর্তী সপ্তাহে জাহাঙ্গীর হোসেন আবার সেই গ্রামে যান। রাতে ইশার নামাযের পর তিনি জাহাঙ্গীরের সাথে আবার আলাপ করেন। এবার জাহাঙ্গীর হোসেন তাকে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরেন এবং কয়েকটি লিফলেট পড়তে দিয়ে তাঁকে শুক্রবার নিরালায় জামা'তের মসজিদে জুমুআ'র নামায পড়ার এবং হুযূরের খুতবা দেখার আহ্বান জানান। আমার যতটুকু মনে পড়ে দু'বার-ই জাহাঙ্গীর হোসেন সাহেবের সে মসজিদে রাত কাটান এবং রাতে তিনি অনেক দোয়া করেন। তিনি কথা অনুযায়ী শুক্রবারে মসজিদে আসলেন। তখন খুলনায় প্রচণ্ড বিরোধিতা চলছিল। আমি তাঁকে দেখে আশঙ্কা করলাম হয়ত তিনি শিবিরের কেউ হবেন। যাহোক হুযূরের খুতবা শুনে তিনি বিচলিত হন। খুতবার পর তিনি আমাকে বললেন, আমি বয়াত করব। হুযূর সম্বন্ধে বললেন, তিনি তো মূর্তিমান নূর। আমি তাঁর অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলাম । উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি মাদ্রাসা লাইনে কিছু পড়ালেখা করেছিলেন। খুলনার প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং আমি তাঁকে বললাম, আপনি আমাদের আরও বই-পুস্তক পড়ুন, আপনার আত্মীয় স্বজন অনেকেই মওলানা, তাই আগে জামা'তকে নিজে বুঝুন। পরদিন সকালে চলে যান। জাহাঙ্গীর হোসেন সাহেব তাঁর সাথে বরাবর যোগাযোগ রাখতেন।

কয়েকদিন পর এক দুপুরে তিনি এসে হাজির। বললেন, বই পড়েছি, আমার বয়াত নিন। আমি তাকে বললাম, আপনি জুমআ'র দিন আসুন, সেদিন বয়াত করেন, জামা'তের সদস্যদের সাথে পরিচিত হয়ে যাবেন। খুলনার প্রেসিডেন্ট সাহেবও এমনটি বললেন। তিনি বললেন, আমি যে চাকুরি করি, তাতে আমার জন্য সময় বের করা কঠিন। আমি বললাম, ইনশা'ল্লাহ আসতে পারবেন। পরবর্তী শুক্রবারে তিনি এসে বয়াত করেন। আমাদের গ্রামে গ্রামে তবলীগি প্রোগ্রামের তিনি প্রথম ফসল। সে সময় আমি তাঁকে বললাম, আপনি এত দ্রুত কীভাবে অগ্রসর হলেন? বললেন, জাহাঙ্গীর সাহেবের ব্যবহার ও তাঁর দোয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে। একদিন বললেন, আপনারা কোন মাটির মানুষ। আজকাল এমন মানুষও পাওয়া যায়! জামা'তের সদস্যদের বিশেষভাবে জামা'তের প্রেসিডেন্ট শামসুর রহমান সাহেব ও শহীদ ডা. আব্দুল মাজেদ সাহেবের ব্যবহার তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। তিনি কিছুদিন পরপর আসতেন। এর মধ্যে আমার বদলি চিটাগং-এ হয়ে যায়, আমি সেখানে চলে যাই এবং মোহতারম মওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেবের বদলি সেখানে হয়। পত্র মারফত তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। তাঁর শাহাদাতের এক দুই মাস পূর্বে তিনি আমাকে একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি আমাকে লিখেন, আপনি কোন মাটির মানুষ এবং আমার সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা লিখেন। তিনি এ পত্রে লিখেন (হুযূরের খুতবায় পাকিস্তানে এক শাহাদাতের ঘটনা শুনেছিলেন) কীভাবে শহীদ হয়। আমিও শাহাদাতের কামনা করি। পত্রটি সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম, হয়ত এখনও কাগজের মধ্যে কোথাও আছে। খোদা তা'লা তার শাহাদাতের বাসনা পূর্ণ করলেন এবং অনেক পরে এসে তিনি অল্প সময়ে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হন। এতে শহীদ জাহাঙ্গীর, যিনি একজন টগবগে তরুন খাদেম ছিলেন তাঁর নেকী ও তাকওয়ার মান যে কত উঁচু ছিল তা বুঝা যায়। বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয়।

অনেকের কথা লিখার আছে, কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবার কারণে লিখতে পারি নি। অনেক এমন আহমদী নারী ও পুরুষের কথা আমার মনে পড়ছে, যাদের অনেকের নাম আমি ভুলে গেছি কিন্তু চেহারা মনে আছে। অত্যন্ত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও জীবন্ত খোদার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। তাহাজ্জুদের নামাযে তাঁরা জামা'তের জন্য বিগলিতচিত্তে দোয়া করে গেছেন। নিভৃত ও দুর্গম গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন মানিক-রতন, আমি কুকুয়া, সুন্দরবন, তাহেরাবাদ, নাসেরাবাদ, তারুয়া, আহমদনগর, শালসিঁড়ি, তেবাড়িয়া, কাফুরিয়া, ঘড়িলাল, কুমিল্লা, কটিয়াদী এবং অন্যান্য অনেক জামা'তে দেখেছি। আজ বাংলাদেশ জামা'ত যা কিছু অর্জন করেছে আমি মনে করি এর এক বড় অংশ অনেক এমন গরীব আহমদীদের রাতের অন্ধকারের বিগলিত চিত্তের দোয়া এবং দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের আর্থিক কুরবানীর ফল রয়েছে যাদের অনেককে অনেকেই চেনে না, জানে না। জামা'তের প্রখ্যাত কবি ওবায়দুল্লাহ আলীম সাহেব তার এক কবিতায় লিখেছেন, "খাক হো গায়ে নাগীনে লোগ" অর্থাৎ মূল্যবান হীরা-পান্না সদৃশ মানুষরা মাটিতে বিলীন হয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের নাম জানা অজানা সব নিষ্ঠাবান আহমদীদের জন্য যারা আমাদের মাঝে নেই, পবিত্র কুরআনের এ দোয়া করে এবং সকলকে এ দোয়া করার জন্য আবেদন জানিয়ে লেখাটি শেষ করছি।

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থাৎ আর তাদের পরে যারা এসেছে তারা বলে,'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও ক্ষমা কর যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন ধরনের বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল, বারবার কৃপাকারী। *(সূরা আল হাশর ১১)*

আমীন, সুম্মা আমীন।

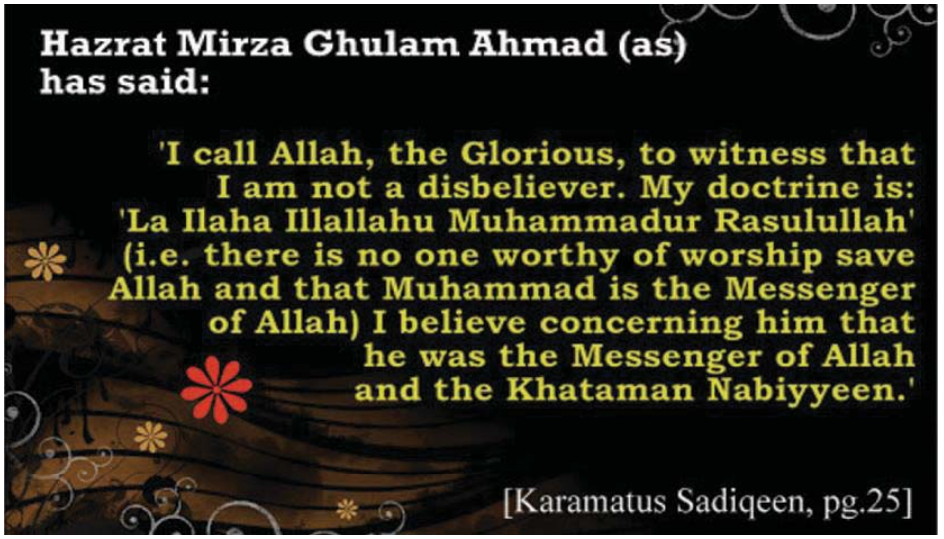

স্মৃতির পাতা থেকে

এহসান উল আলম

আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্‌দাহু

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর এই ইলহামটির বাস্তবায়ন বহু আহমদী মুসলমান বাস্তবে প্রত্যক্ষ করে থাকেন, পেয়ে থাকেন জীবন্ত খোদার স্বাদ। এই অধমও এ থেকে কিছুটা পরশ পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আমি এখানে কেবল দু'টি ঘটনার উল্লেখ করছি।

এক সময় ছবি তোলার আমার খুবই শখ ছিল। আমার নিজের ক্যামেরাও ছিল। ছবি তোলার পর তা প্রিন্ট করে দেখার জন্য আমি খুবই অস্থির হয়ে যেতাম। এমন অস্থির হতাম যা বুঝানোর মত ভাষা আমার নেই। ছবি তোলার পর আমি প্রায় সাথে-সাথেই নেগেটিভ ডেভেলাপ করে একই সাথে ছবি প্রিন্ট করে নিয়ে ঘরে ফিরতাম। আর এজন্য যদি দোকানে ৩/৪ ঘন্টাও বসে থাকতে হত–তাও থাকতাম।

এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সনের একটি ঘটনা। একদিন আমার শ্যালিকা আসে আমার বাসায় বেড়াতে, তখন তাকেসহ অন্যান্যদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়ালাম এবং এক রিল ছবিও তুললাম। রিল শেষ হওয়া মাত্রই স্বভাববশতঃ নেগেটিভ দেখার জন্য সেদিনই রিল ডেভেলাপ করে ফেলি। এরপর ছবির প্রিন্ট দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। নেগেটিভ নিয়ে আমি বাসা থেকে রিকশা নিয়ে রওনা হলাম মালিবাগের দিকে, যেখানে ছবি ভাল প্রিন্ট করা হয়। পথিমধ্যে শুধু বারবার মনে হচ্ছিল কখন ছবিগুলো দেখব। কিন্তু যখন কাকরাইল মোড়ে সিগন্যালে রিকশা থামল তখন আমি প্যাকেটে হাত দেই, দেখি নেগেটিভটি নাই।

হায়! আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। মনের মধ্যে কী যে এক কষ্টের সৃষ্টি হল তা আমি ভাষায় বুঝাতে পারব না। আমি রিকশা ছেড়ে দিয়ে প্যাকেটটি হাতে নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর মহান আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ করতে লাগলাম, নেগেটিভটি পাবার কোন রাস্তাই দেখি না। তবুও জানি মহান আল্লাহ তা'লা সবই পারেন, আমি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়তে লাগলাম। পরক্ষণেই দেখি এক রিকশাওয়ালা নেগেটিভের প্যাকেটটি হাতে নিয়ে আমার দিকে আসছে। আমার সামনে থেমে আমাকে নেগেটিভের প্যাকেটটি দিল।

আমি তা হাতে নিলাম, অবস্থাটা এমন হল যেন আগে থেকেই রুটিন করা ছিল, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি আর সেও আমার জন্য এদিকে আসছিল, রিকশাওয়ালা আমাকে কিছুই বলল না, আমিও তাকে কিছুই বললাম না। আমি মহান আল্লাহ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই আমার খেয়াল হল এটা রিকশাওয়ালা না বরং ফিরিশতা, আমি তখন রিকশাটি দেখার জন্য তাকালে ততক্ষণে রিকশাটি অন্যান্য রিকশার সাথে মিশে গেছে। আমি আর তখন রিকশাটিকে চিহ্নিত করতে পারলাম না। সেই ঘটনা আর পাওয়া না পাওয়ার অনুভূতি আজও আমার হৃদয়ে দাগ কেটে আছে।

আরেকবার আমি অসুস্থ হবার কারণে ডাক্তারের পরামর্শে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ল্যাবে প্যাথলজি টেস্ট করি। আমার শারীরিক সমস্যা থাকার কারণে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে টেস্টগুলো করাতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। একদিন রিপোর্টগুলো নিয়ে কোন কাজে বাইরে গেলাম এবং আসার সময় বাজার থেকে কেনাকাটা করে রিকশা করে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ পর আমার মনে হল, রিপোর্টের প্যাকেটটি আমি ঘরে নিয়ে আসি নি! প্যাকেটটি কখন কোথায় হারিয়েছি কিছুই বলতে পারছি না। আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম, তখন আমি যেসব জায়গায় বা দোকানে ঘুরাঘুরি করেছি সেখানে গিয়েও কাগজের প্যাকেটটির কোন হদিস পেলাম না।

আমার মন এতটাই ভেঙে গেল, এ রিপোর্টগুলো না পেলে আমি আর নতুন করে টেস্ট করাব না বলে ঠিক করলাম। আমি রিপোর্টগুলো পাবার জন্য আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ করতে লাগলাম। পূর্বের নেগেটিভটি হারানোতে যতটা না কষ্ট পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি কষ্ট অনুভূত হচ্ছিল।

আমার তখন মনে হল, পূর্বের নেগেটিভটি যদি মহান আল্লাহ তা'লা আমাকে ফিরিশতার মাধ্যমে দিয়ে থাকেন তবে আমার পূর্বের চেয়ে বেশি কষ্ট ও প্রয়োজন হওয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা এখন কেন ফিরিশতার মাধ্যমে তা আমাকে দিবেন না? আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আমার ওয়াকফে নও মেয়েকে বললাম, তুমি দেখে নিও আমার কাগজগুলো ফিরিশতা এসে দিয়ে যাবে।

তখন তার চার-পাঁচ বছর বয়স হবে। সে এ ঘর থেকে ঐ ঘর হাঁটছে আর আমার আম্মা ও বোনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে **'আব্বুর কাগজ ফিরিশতা দিয়ে যাবে।'** পরের দিন বেলা ১১/১২ টার দিকে আমি ঘরে ছিলাম তখন বানু নামে এক পরিচিত মহিলা প্যাকেটটি ঘরে নিয়ে এসে বলল, এহসান ভাই-এর কাগজগুলো এক রিকশাওয়ালা আমার কাছে দিয়ে গেছে।

উপরোক্ত দু'টি ঘটনা আমার স্মৃতিতে এখনও অম্লান হয়ে আছে। এ দু'টি ঘটনার পর আমার হৃদয়ে এটা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে, সত্যিকার অর্থে আল্লাহই তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট। এ কথা আমার আল্লাহ নিজে আমাকে বুঝিয়েছেন।

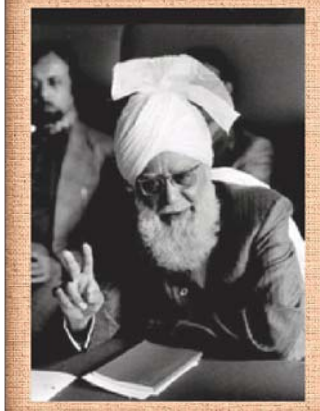

"কুরআন ছাড়া আপনাদের বাড়ি-ঘর কল্যাণ বিবর্জিত থাকবে। প্রতিটি আহমদী বাড়ি যেখানে কুরআন পড়ার বয়সে উপনীত আহমদীরা থাকে তারা যেন অবশ্যই প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াত করে।"

- খলীফাতুল মসীহ সালেস(রাহে.)

নূরুদ্দীন আফ্রাদ একটি উজ্জ্বল তারকা

আমাতুস সামী রহমান (বেবী)

মানুষ সৃষ্টির সেরা। তাই পবিত্র ও সাধু স্বভাব বিশিষ্ট লোকেরা তাদের স্রষ্টার অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে থাকে আলোর পথ। তেমনি এক ব্যক্তি শৈশব থেকে যিনি সত্যের সন্ধানে দিগ্‌বিদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন, অবশেষে পেয়েছেন আলোর পথ। সেই ব্যক্তিত্বের জীবনের কিছু কথা এখানে তুলে ধরছি।

১৯১৮ সনে বৃহত্তর ময়মনসিংহের রামপুর গ্রামে একটি ছেলের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় তার আব্দুল হামিদ। এককালে তাদের আরাফাত বংশের পূর্ব পুরুষরা সৌদিআরব থেকে এসেছিলেন বলে জানা যায়। বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে এখানেই তারা স্থায়ী হয়ে যান। যখন ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর তখন তার পিতা নাসির উদ্দীন আরাফাত মৃত্যুবরণ করেন। কালের পরিবর্তনে তাদের বংশগত নাম আরাফাত বদলে আফ্রাদ হয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার জন্য তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি এক পীর সাহেবের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতে থাকেন। পীর সাহেবের বাড়িতে থাকাকালেই তিনি একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সন্ধান লাভ করেন। কিন্তু তিনি যতই আহমদীয়াতের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে চাইলেন লোকেরা ততই তাকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে লাগল। একদিন কিশোরগঞ্জ জেলার প্রেমারচর ইব্রাহীম মুন্সি নামক এক আহমদী ব্যক্তির সাথে দেখা। তিনি জানালেন, ঈসা(আ.)-এর আকাশ থেকে দৈহিকভাবে অবতীর্ণ হবার কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি ধারণা। তার গুণে গুণান্বিত হয়ে মির্যা গোলাম আহমদ নামক ভারতের কাদিয়ানের এক ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী(আ.) হবার দাবি করেছেন। তার নিকট থেকে বিস্তারিত শুনে তিনি মৌলভী তালেব হোসেনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং আহমদীয়াত সর্ম্পকে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি একটি স্বপ্নের মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং প্রেমারচরে গিয়ে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

মৌলভী নূরুদ্দীন আফ্রাদ

আহমদী হবার সাথে সাথে তার ওপর নেমে আসে নানাবিধ অত্যাচার, চলতে থাকে তার ওপর মানসিক ও শারীরিক নিপীড়ন। আহমদী হবার কারণে তার কাছ থেকে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে তালাক লিখিয়ে নেয়া হয়, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। কিন্তু সত্যের প্রতি তার ভালবাসা ও দৃঢ়তা এতটাই প্রবল ছিল যার কারণে, শত্রুর শত সহস্র বিরোধিতাও তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

আহমদীয়াতের প্রতি আব্দুল হামিদ আফ্রাদ সাহেবের ভালবাসা, প্রেম ও দৃঢ়তা দেখে কিশোরগঞ্জ জেলার পাইকশা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সৈয়দ ওসিউজ্জামান খান (সোনা মিয়া) সাহেব তার কন্যা সৈয়্যদা জিনাতুন নেসা খানমকে তার সাথে বিয়ে দেন। একবার তিনি আল ফযল পত্রিকায় হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-এর একটি ঘোষণা পড়লেন, প্রত্যেক আহমদী যেন তার প্রথম সন্তান ধর্মের জন্য ওয়াকফ করে। তা না পারলে, প্রত্যেক জামা'ত যেন অন্তত একটি করে যুবক জামা'তকে উৎসর্গ করে। খলীফার ডাকে সাড়া দেবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে দোয়া করতে লাগলেন, হে খোদা! আমিও যেন যুগ-খলীফার ডাকে সাড়া দিতে পারি। কয়েকবার তার স্ত্রীর মৃত সন্তান জন্ম হবার পর ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে তার একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। তিনি হুযূরকে তার ব্যাকুলতা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। উত্তরে হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.) লিখেন, 'হযরত মরিয়মও তো মেয়ে ছিলেন। তোমার মেয়েটিকে উত্তম তালীম-তরবিয়ত দিয়ে গড়ে একজন ওয়াকেফে জিন্দেগী ছেলের সাথে বিয়ে দাও। এতে তোমার ওয়াকফের স্পৃহা পূরণ হবে।' হুযূর(রা.) মেয়েটির নাম রাখেন আমাতুস সামী। ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের কৃতী সন্তান মওলানা আনিসুর রহমান সাহেবের সাথে এই মেয়ের বিবাহ হয়।

১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ তারিখে আব্দুল হামিদ নামক এক ব্যক্তি হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে ছুরিকাঘাত করে। আল্লাহর মনোনীত খলীফার ওপর নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য হামলার খবর শুনে তার মন কেঁদে ওঠে। এই নামের প্রতি তার চরম ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যার ফলে তিনি এফিডেভিট করে নিজের নামই পরিবর্তন করে ফেলেন। তার নতুন নাম হয় নূরুদ্দীন আফ্রাদ। খিলাফতের প্রতি, যুগ-খলীফার প্রতি ভালবাসার এমন অতুলনীয় দৃষ্টান্ত যুগ যুগ ধরে হাজারো মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে। ১৯৮১ সালের জুন মাসে নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব আপন প্রভুর সান্নিধ্যে মিলিত হন। তাকে শালসিঁড়ি জামা'তের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে।

হে প্রিয় খলীফা

সিবগাতুর রহমান

পুণ্য কর পূর্ণ কর আমার হৃদয় খানি
তুমি আমার প্রাণের প্রিয় জানি আমি জানি
তোমার লাগি সদা-ই কাঁদে আমার অবুঝ মন
কখন পাব এই মাটিতে তোমার বিচরণ।
তোমার পুণ্য চরণ দু'টি এই মাটিতে রাখ যদি
সেই চরণে লুটিয়ে দেব আমার জীবন খানি
তুমি আমার প্রাণের প্রিয় জানি আমি জানি।

এই জগতের তুমি শিক্ষক, তুমি যে কবিরাজ
দূর করে দাও আমার মনের যত ব্যাধি আজ
তোমার মুখের মধুর বাণী আমার প্রাণের সঞ্জীবনী
এই বাণীতে মিটাই পিয়াস ইথার থেকে আনি
তুমি আমার প্রাণের প্রিয় জানি আমি জানি।

হে প্রিয় মোর কবুল কর আমার আবেদন
তোমার ছোঁয়ায় ধন্য কর আমার দেহ মন
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই যদি ঠাঁই ওগো স্বামী
আর কিছুতো চাইব না গো এই জীবনে আমি
তুমি আমার প্রাণের প্রিয় জানি আমি জানি
পুণ্য কর পূর্ণ কর আমার হৃদয় খানি
তুমি আমার প্রাণের প্রিয় জানি আমি জানি।

মসজিদ ফযল, যুক্তরাজ্য (The Fazl Mosque, London)

মসজিদে বায়তুল মুকীত, নিউজিল্যাণ্ড (Baitul Muqeet Mosque, New Zealand)

ভেলেন্সিয়া নগরীতে আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ 'বাইতুর রহমান' (Baitur Rahman Mosque, Valencia)

মসজিদ নূর, ঘানা (Masjid Noor, Ghana)

বাইতুর রহমান মসজিদ, কানাডা (Baitur Rahman Mosque, Canada)

‘আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।’ *–ইলহাম হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)*

বাইতুল ইসলাম মসজিদ, মেপাল, কানাডা (Baitul Islam Mosque, Maple, Canada)

আল মেহদী মসজিদ, ব্রেডফোর্ড, যুক্তরাজ্য (Al Mahdi Mosque, Bradford, UK)

‘মসজিদ-ই-বাইতুর রহমান’ মেরিল্যাণ্ড আহমদীয়া মসজিদ, যুক্তরাষ্ট্র
‘Masjid-e-Baitur Rahman’ Maryland, USA

বাইতুল গফুর আহমদীয়া মসজিদ, জার্মানি
Baitul Ghafur, Ginsheim, Germany

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে ২০১৩ সালে নির্মিত আহমদীয়া মসজিদ
Recently built Ahmadiyya Mosque at Brisbane, Australia

আহমদীয়া মসজিদ, দি গ্যাম্বিয়া
Ahmadiyya Mosque, The Gambia

মসজিদ-ই-মোবারক, কাদিয়ান, ভারত
Masjid-e-Mubarak, Qadian, India

বাইতুল ফতূহ আহমদীয়া মসজিদ, লণ্ডন
Baitul Futuh, The Central Ahmadiyya Mosque in UK

আহমদীয়া মসজিদ, হিউসটন, যুক্তরাষ্ট্র
Ahmadiyya Mosque, Houston, USA

বাইতুস সামী, হানুভার, জার্মানি
Baitus Sami, Hannover, Germany

মসজিদে আকসা, রাবওয়া, পাকিস্তান
Masjid-e-Aqsa, Rabwah, Pakistan

মসজিদ-ই-বাশারাত, পেডরো আবাদ, স্পেন
Masjid-e-Basharat, Pedro Abad, Spain

মসজিদ এবং মিশন হাউজ, জিনজা, উগাণ্ডা
Masjid and Mission House, Jinja, Uganda

আহমদীয়া মসজিদ, নরওয়ে
Baitul Nasr, Ahmadiyya Mosque in Norway

খলীফা মোদের প্রাণ

আহমদ তারেক মুবাশ্বের

সম্প্রতি হুযূর আনোয়ার(আই.) দূরপ্রাচ্যের ৪টি দেশ সফর করে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন। এই সফরে হুযূরের সঙ্গে অনেকের মাঝে ছিলেন হুযূরের প্রেস সচিব জনাব আবেদ খান সাহেব। এই সফর সম্পর্কে তিনি যে ডায়েরি লিখেছেন, এতে তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং হুযূরকে কাছ থেকে দেখার এবং বারবার হুযূরের ব্যক্তিত্ব, ইসলাম সেবার আকুল বাসনা এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি গভীর ভালবাসা দেখে তিনি আপ্লুত হয়েছেন। খাকসারকে তিনি তা পড়তে দিয়েছিলেন। রাত জেগে পড়েছি। একটি বিষয় আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে আর তা হল, প্রচার মাধ্যম বা সুশীল সমাজের প্রশ্নের উত্তরে সর্বত্র হুযূর বলেছেন, আমি আমার জামা'ত এবং অনুসারীদের দেখতে এসেছি। আর তারাও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল। এই যে দ্বিপাক্ষিক আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা এটি পৃথিবীতে একমাত্র আহমদীয়া জামা'ত ছাড়া অন্য কোথায় আজ দেখা যায় না।

বাংলাদেশ এবং বাঙালিদের প্রতি যুগ-খলীফাদের বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসা রয়েছে। আমি অনেকের মুখে একথা শুনেছি কিন্তু বর্তমান হুযূরকে কাছ থেকে যতটুকু দেখার সুযোগ হয়েছে তাতে আমি জোর গলায় বলতে পারি, সত্যিই তিনি আমাদের ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর এই ভালবাসার প্রতিদান আমি বা আমরা সঠিকভাবে দিতে পারছি কি? আমরা কি নিষ্ঠার সঙ্গে দাবি করে বলতে পারি, আমরা খলীফার প্রতি অনুগত বা তাঁর সকল নির্দেশ আমাদের জন্য যথাযথভাবে শিরোধার্য করেছি? কিছুটা আত্মবিশ্লেষণ করে দেখার অনুরোধ রইল পাঠকদের কাছে।

অধম একজন দুর্বল ও নিতান্তই অযোগ্য ওয়াকেফে জিন্দেগী। লিখতে বসে মনের মাঝে অনেক কিছু উঁকি দিচ্ছে, ভীড় করছে, আবার লিখতেও ভয় করছে, পাছে কেউ আবার মনে কষ্ট পায়। তবে একজন ওয়াকেফে জিন্দেগী হিসেবে আজ আমি বাংলাদেশে বসবাসরত আমার সহকর্মী ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে, নিঃসন্দেহে এটি আমাদের অনেক বড় পাওয়া কিন্তু শতবছরে আমাদের অর্জন কী? আমরা কী পেলাম? কতটা পাওয়া উচিত ছিল আর সে তুলনায় আমরা কী পেয়েছি? সবাই একটু ভেবে দেখবেন কি?

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল, আমরা যদি আমাদের কর্মে ও দায়িত্ব পালনে আরও আন্তরিক হতাম তাহলে আজ বাংলাদেশে আহমদীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি হতে পারত। জামা'তের প্রচার ও প্রসার কয়েকগুণ বেড়ে যেত আর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আহমদীয়া জামা'ত বিশেষভাবে মূল্যায়িত হত। যেভাবে দিনরাত ওয়াকেফে জিন্দেগীদের কাজ করার কথা সেভাবে আমরা করতে পারলে জামা'ত আজ সবদিক থেকে আরও অনেক অগ্রগামী থাকত।

হুযূর(আই.) যেখানেই যাচ্ছেন তবলীগ করছেন। আমাদের অনেকেরই হয়ত ধারণা নেই, পাশ্চাত্য সমাজে তবলীগ করা কতটা কঠিন। কিন্তু তিনি করে যাচ্ছেন, কখনও স্পেনে আবার কখনও বা আমেরিকায়। তিনি বিশ্বের মহাশক্তিধর সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে পত্র লিখেছেন, মুসলমান বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে পত্র লিখেছেন, পোপকে পত্র পাঠিয়েছেন। আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে গিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্ট, ইউকে'র পার্লামেন্ট, জার্মানির সেনাবাহিনীর কেন্দ্রে এমনকি সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেন্টেও বক্তব্য প্রদান করেছেন। সবার কাছে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরছেন আর একমাত্র এ শিক্ষাই যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তা জোর গলায় বলছেন।

পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও-টিভিতে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এবং তাঁর আগমণ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত মূল বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি কোটি কোটি মানুষের কাছে সত্যের বাণী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী(আ.)-এর আগমন বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা কি করছি? সম্প্রতি তিনি কানাডার জামেয়ায় প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, ওয়াকেফে জিন্দেগীর কাজের কোন সময় বাঁধা নেই, বছরে ৩৬৫ দিনই তাকে কাজ করতে হবে। আমরা যারা এখানে অফিসে কাজ করি, জামা'তের নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে একদিন ছুটি পাওয়া যায় কিন্তু হুযূর চান এ সময় আমরা যেন তবলীগ করি বা নিজ নিজ গণ্ডিতে জামা'ত প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করি। আমি শুধুমাত্র আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা এবং নিজেদের স্মরণ করানোর জন্য একথাগুলো লিখছি।

খাকসার একবার হুযূরের কাছে নিবেদন করেছিলাম, হুযূর আমার এই সমস্যার কারণে যথাযথভাবে কাজ করতে পারছি না। হুযূর বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) তো সারাজীবন দু'টি রোগ নিয়েই এত কাজ করেছেন। আমরা কেন পারব না? হুযূর কিন্তু ৩৬৫ দিনই কাজ করছেন।

হুযূর(আই.)-এর সান্নিধ্যে লেখক ও তাঁর পরিবার পরিজন

আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি, যে বা যারা সত্যিকার ওয়াকফের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে একমাত্র আল্লাহর ভালবাসা লাভের জন্য কাজ করবে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উভয়জগতে পুরস্কৃত করবেন, তাঁকে খলীফার সাহায্যকারী হবার সৌভাগ্য দেন, তার দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা ঢেকে রাখেন আর জামা'তের সেবার জন্য তার পথকে প্রশস্থ করে দেন। এমন ব্যক্তির সামনে অভাবনীয়ভাবে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র উন্মোচিত করা হয় এবং তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্যকারী সরবরাহ করা হয়। তবে এই সৌভাগ্য লাভের জন্য শর্ত হচ্ছে, খোদা তা'লার সাথে আন্তরিক ও নিবিড় প্রেম আর ধর্মসেবার অদম্য স্পৃহা। কত সৌভাগ্যবান সেই মানুষ যাকে আল্লাহ তা'লা এই পুরস্কার দান করেন।

বাংলাদেশে আমরা আহমদীয়াত শিখেছি বই-পুস্তক পড়ে কিন্তু লণ্ডনে আসার পর বুঝলাম আসল আহমদীয়াত কী-তা জানার বা শেখার জন্য পুণ্যবানদের সাহচর্য আবশ্যক। আমাদের বাংলাদেশে এর বড়ই অভাব। কেউ কেউ অবশ্যই আছেন আর সে কারণে তাঁদের প্রতি বাংলার আহমদীদের ভালবাসাও অপরিসীম। অনেকেই হুযূরকে পত্র লিখেন, হুযূর দোয়া করুন যেন আমাদের ছেলে বড় হয়ে অমুকের মত হয়। চিঠি পড়ে বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। আমরা যারা ওয়াকেফে জিন্দেগী, আমি বা আমরা কি পারি না নিজ নিজ জায়গায় এরূপ আদর্শ হয়ে উঠতে? দেশের উন্নতি এবং আহমদীয়াতের উন্নতি আজ আমাদের ওপর নির্ভর করে বলে আমাদের প্রত্যেককে মনে করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের মাঝে আমূল পরিবর্তন না আনব, ধর্মসেবার সৌভাগ্য ও দায়িত্বকে চাকরির পরিবর্তে খোদার মহাঅনুগ্রহ জ্ঞান না করব, ততদিন আমাদের আত্মিক উন্নতির স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

শতবছর হয়ে গেল, খলীফা আমাদের প্রতি এত আন্তরিক এবং তাঁর অপরিসীম ভালবাসা ও স্নেহের পরশে আমাদের সকল চাহিদা পূর্ণ করছেন কিন্তু আজও তিনি তাঁর অনুসারীদের দেখতে যেতে পারছেন না, তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারছেন না, তাদের মাঝে বসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে পারছেন না– এটি খলীফার মনের কত বড় যে কষ্ট তা অনুমান করার সাধ্য হয়ত আমাদের নেই। কিন্তু বিগত জলসার সমাপনী ভাষণের পর যখন নযম গাইতে গাইতে আমাদের যুবকরা বলে উঠল, **'হে আমীরুল মু'মিনীন! এমটিএ'তে দেখে আমাদের মন আর ভরছে না, আমরা আপনার কাছে আর কিছুই চাই না আপনি শুধু একবার বাংলাদেশে পদধূলি দিন'–** তখন হুযূরের চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যুগ-খলীফার প্রেমিক হিসেবে বাঙালি আহমদীরা তাঁকে কাছে পাবার জন্য যতটা উদ্‌গ্রীব হুযূর(আই.)-ও তাদেরকে স্বচক্ষে দেখার জন্য ততটাই ব্যাকুল। আমাদের এই আত্মিক সম্পর্কটি দ্বিপাক্ষিক। এবার আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করার পালা, হুযূরকে বাংলাদেশে নেয়ার জন্য বাস্তবে আমরা কী করেছি বা করছি? আমরা কতটা আগ্রহী আর কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে হুযূরকে নেয়ার জন্য চেষ্টা করছি। উত্তর আপনার কাছেই আছে।

সবশেষে বলতে চাই, এমটিএ খোদার এক অশেষ নিয়ামত আমাদের জন্য। আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই খলীফাকে দেখতে পান নি বা দেখার সুযোগ ঘটে নি। আজ আমরা এমটিএ-র কল্যাণে প্রতিদিন হুযূরকে নিজেদের ঘরে দেখতে পাচ্ছি। হুযূর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছেন কিন্তু আমরা ঘুমাচ্ছি। এই ঘুম কি আর ভাঙ্গবে না? উঠুন নতুবা এই বেলা কেটে গেলে আর ফিরে আসবে না। হুযূর তাঁর বিভিন্ন অধিবেশনে আজকাল সকল আহমদীকে নিয়মিত পরিবার-পরিজন নিয়ে এমটিএ-র অনুষ্ঠান দেখার আহ্বান জানাচ্ছেন। যে অনুষ্ঠান আপনার পছন্দের সেটিই দেখুন, অবশ্যই এতে আপনি আত্মার খোরাক পাবেন, জ্ঞানের খোরাক পেয়ে যাবেন।

'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠান বাঙালি আহমদীদের জন্য হুযূরের এক অমূল্য উপহার। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তবলিগ ও তরবীয়ত হচ্ছে। তবলীগী প্রশিক্ষণ হচ্ছে। দুই বাংলার মানুষ হুযূরকে লিখছেন, অনেক অ-আহমদীও হুযূরকে লিখেছেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ এই অনুষ্ঠানটিকে কাজে লাগান। নিয়মিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের দেখানোর ব্যবস্থা করুন। এর ফলে আমাদের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাবে। এই আশা দুরাশা নয় আর আমাদের নিরলস প্রচার ও প্রসারই একসময় বাংলার মাটিকে হুযূরের পদধূলির যোগ্য করবে বলে আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

হে আমীরুল মু'মিনীন! এমটিএ'তে দেখে আমাদের মন আর ভরছে না, আমরা আপনার কাছে আর কিছুই চাই না আপনি শুধু একবার বাংলাদেশে পদধূলি দিন

শেষদিকে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করছি। জ্ঞানের স্বল্পতা এবং লেখালেখির অভ্যাস না থাকায় মনের কথাগুলো হয়তো গুছিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু হৃদয়ের গহীন থেকেই লিখছি।

ওয়াকেফে জিন্দেগীদের কারও কাছে যেন নত হতে না হয়। মনে রাখতে হবে দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম। কারো কাছ থেকে কিছু পেলে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী দেয়ারও অভ্যাস রাখতে হবে। আর্থিক কুরবানীর বেলায়ও সামর্থ্য অনুযায়ী অংশ নেয়া আবশ্যক। মানুষের সুখে-দুঃখে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর ইসলামী শিক্ষার প্রচলন বাংলাদেশের আহমদীয়া সমাজে খুব একটা দেখা যায় না বললেই চলে কিন্তু এটি আমাদের ওয়াকেফে জিন্দেগীদের চালু করতে হবে। জামা'তকে শেখাতে হবে, কারো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ বা সমবেদনা জানাতে তার বাড়িতে যাওয়া বা কারো ঘর আলো করে সন্তান এলে সেখানে গিয়ে শুভেচ্ছা জানানো প্রয়োজন। আর কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তাকে দেখতে যাওয়া উচিত। জামা'তের সদস্যরা যদি তাদের সুখে-দুঃখে আপনাকে কাছে পায় তাহলে আপনি তাদের নয়নের মণি হয়ে যাবেন, তাদের মাথার মুকুট হয়ে থাকতে পারবেন। আপনার জন্য জামা'তের দায়িত্ব পালন করাও সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু এসবই করতে হবে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে, লৌকিকতা হিসেবে নয়।

২০০০ সালে প্রথমবার আমার চোখের অপারেশন হয়েছিল, অস্ত্রোপচারের পর প্রায় তিন সপ্তাহ বকশী বাজারেই ছিলাম কিন্তু কেউ দেখতে এসেছিলেন বলে মনে পড়ে না, কিন্তু ২০১০ সালে লণ্ডনে যখন আমার চোখের অপারেশন হয় তখন খলীফা হুযূর স্বয়ং এই গরীবের ঘরে এসে তাঁর সেবককে দেখে যান। এটি এমন একটি বিষয় যা লিখতে ভয় করছে কিন্তু এতে শিক্ষণীয় দিকটির প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে আর সমস্যা হবার কথা নয়।

১১ই জানুয়ারি ২০১৪ জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় হুযূর কথা প্রসঙ্গে বলেন, যেখানে খলীফা অবস্থান করেন সেটিই জামা'তের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে খলীফাতুল মসীহ্ এবং তাঁর সঙ্গে যারা প্রতিনিয়ত কাজ করেন তাদের ব্যবহারিক জীবনের আলোকে উপরোক্ত কথাগুলো লিখলাম। আশা করি এগুলো আমাদের সবার কাজে লাগবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে যুগ-খলীফাকে বাংলাদেশে নেয়ার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করার তৌফিক দিন আর এটিই হোক আমাদের নতুন শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার। আমীন।

মুহাম্মদী মসীহ্‌র আদি পুরুষের দেশে

শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সাতক্ষীরার একেবারে শেষ প্রান্তে শ্যামনগর উপজেলার যতীন্দ্রনগর গ্রাম। এ গ্রামের পরই বঙ্গোপসাগরের সাথে লাগোয়া বিশ্বের সর্ব বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। একভাবে বলা যায় বাংলাদেশের একপ্রান্ত, আবার অন্যভাবে বলা যায় বঙ্গোপসাগরের এক প্রান্ত। তবে যা-ই বলি না কেন আজও এ গ্রাম শহরের তেমন কোন ছোঁয়া পায় নি। ১৯৬২ সালে আমার দাদা মরহুম শেখ জোনাব আলী আহমদীয়াতের পয়গাম পেয়ে মসীহ মাওউদ(আ.)-এর জামা'তে দীক্ষা নেন এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এর একবছর পর বয়াত গ্রহণ করেন। সেই সুবাদে আমার জন্ম এক আহমদী পরিবারে। এই গ্রামেই আমার শৈশব ও কৈশর কেটেছে।

আহমদীয়াতের সুবাদে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার অভিপ্রায়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসি। আহমদীয়াতের প্রতি ভালবাসা আমাকে ধর্মের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করতেও অনুপ্রাণিত করে। বাবার কাছে অনুমতি নিয়ে ধর্ম সেবার নিমিত্তে জীবন উৎসর্গ করি। তখন কে জানত এই সৌভাগ্য আমাকে একদিন মসীহ মাওউদ(আ.)-এর পূর্ব পুরুষের আদি নিবাস পারস্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা করা অবস্থায় ঢাকাস্থ ইরান কালচারাল সেন্টার থেকে স্কলারশিপে এক মাসের ভাষা শিক্ষা কোর্সে ইরান যাবার অনুমতি পাই। দানেশগাহে বাইনুল মিলালি ইমাম খোমেনি (ইমাম খোমেনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি)-তে উক্ত কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ২০১২ সনের ৯ই আগস্ট ইরান পৌঁছাই এবং ১০ই আগষ্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনে কোর্স শুরু হয়।

ইমাম খোমেনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইরানের কাজবিন শহরে অবস্থিত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় কাজবিনও একসময় ইরানের রাজধানী ছিল। তাই রাজধানীর সকল সুযোগ সুবিধা কাজবিনেও পাওয়া যায়।

কাজবিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলো এত সুচারু, সাজানো-গোছানো এবং পরিচ্ছন্ন যা আমি নিজ চোখে না দেখলে কখনো কল্পনাই করতে পারতাম না। প্রত্যেক হোস্টেলের একজন হোস্টেলসুপার থাকেন এবং হোস্টেলসুপারগণ উক্ত হোস্টেলেই নিজ পরিবারসহ বসবাস করেন। রাত এগারোটার পর হোস্টেলে প্রবেশ বা হোস্টেল থেকে বের হওয়া নিষেধ। বিশেষত রাত নয়টার পর কোন ছাত্রকে অযথা ঘোরাফেরা করতে দেখলে হোস্টেল এলাকায় ভ্রাম্যমান গার্ডরা দ্রুত হোস্টেলে প্রবেশ করতে অনুরোধ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকের বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর। এঁরা নিতান্তই বিনয়ী এবং ছাত্রদের সাথে তাদের আচরণ-ও বন্ধুসুলভ। প্রতিটি ক্লাসের সময় ছিল এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট। এত দীর্ঘ সময় ক্লাস নেবার পরও তাদেরকে বিন্দুমাত্র ক্লান্ত দেখাত না। পড়া আদায় করার ব্যাপারে তারা খুব সিরিয়াস ছিলেন। একবার এক শিক্ষক বললেন, যারা আজ পড়া পারবে না তাদেরকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। আমরা প্রথমে ভেবেছি তিনি হয়তো কে কৌতুক করে বলছেন কেননা সকলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা মাস্টার্সের ছাত্র। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ছাত্রদেরকে হাসতে হাসতে একপায়ে দাঁড় করালেন। এভাবে ক্লাসের ভিতরেই তিনি সকলকে পড়া মুখস্ত করিয়ে দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য কম্পিউটার ল্যাব আছে তবে প্রত্যেক কম্পিউটারে তাদের নির্ধারিত পাসওয়ার্ড দেয়া থাকে তাই তাদের অনুমতি নিয়ে তা ব্যবহার করতে হয়। তবে ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবহার নিষেধ। শুধুমাত্র ই-মেইল ব্যবহার করা যায়। এছাড়া দেশের কোথাও ১ মিনিটের জন্যও বিদ্যুৎ-বিভ্রাট নেই এটি আমাদের জন্য একটি আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের খেলাধুলার জন্য একটি বিশাল সবুজ ঘাসে ঢাকা ফুটবল মাঠ এবং একটি তার দিয়ে ঘেরা মাঠ রয়েছে যার পুরোটাই কার্পেট বিছানো। যারা দিনের বেলা খেলার সময় পান না তারা রাতে ফ্লাড লাইটের আলোয় ফুটবল বা অন্যান্য খেলাধুলায় অংশ নিয়ে থাকেন। এছাড়া ইনডোর গেমের জন্য বিশাল বড় একটি বিল্ডিং রয়েছে যার ভিতরে ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, টেবিল টেনিস এবং ব্যাডমিন্টন খেলারও ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের ক্লাসে ২৪টি দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে যাদের মাঝে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, জর্জিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, কাজাকিস্তান এবং তুর্কিস্তান উল্লেখযোগ্য। তবে সোমালিয়া, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, চীন, জাপানের ছাত্র-ছাত্রীও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে।

সপ্তাহে চার দিন ক্লাস হত এবং কোন দিন ৩টি আবার কোন দিন ৪টি ক্লাস হত। সপ্তাহের দুই দিন বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া হত। ক্লাসের অধিকাংশ সময় শিক্ষকগণ কোন না কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন। বিভিন্ন সময় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রভাষক আসতেন বিশেষ করে তেহরান থেকে প্রতিদিন কোন না কোন প্রভাষক অবশ্যই আসতেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝে তারা বিভিন্ন কবিতা আবৃতি করে তা ব্যাখ্যা করে দিতেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই যেন অগণিত কবিতা মুখস্ত।

পারস্য আমার কাছে একটি স্বপ্নের দেশ। হযরত রসূলে পাক(সা.) তাঁর যে সাহাবীর কাঁধে হাত রেখে মসীহ

মাওউদ(আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিও পারস্যের অধিবাসী ছিলেন।

ধর্মীয় দিক থেকে বিবেচনা করলে পারস্য একটি ঐতিহাসিক দেশ এবং প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রও বটে। সেখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন হয়েছে তবে তাদের মাতৃভাষার মাঝে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন আসে নি। পারস্যের রাষ্ট্রভাষা ফার্সী। এ দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ খুবই সুন্দর এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের বিনয়, শিষ্ঠাচার এবং আতিথেয়তা দেখে ঈর্ষা হয়।

ইরানে প্রবেশের পর প্রথম যে বিষয়টি আমাকে বেশি অবাক করেছে তা হল, ইরানের টাকার মান। ইরানের মুদ্রাকে বলা হয় তোমান। তবে তাদের মুদ্রার কোথাও তোমান লেখা দেখি নাই। তাদের মুদ্রায় লেখা আছে রিয়াল। বাংলাদেশের এক টাকার বিনিময়ে ১৫০ রিয়াল পাওয়া যায়। তাই বাজারে গিয়ে লক্ষ লক্ষ রিয়াল খরচ করেও অনেক সময় প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব হয় না।

ইরানকে বলা হয় কবিতার দেশ। পথে-ঘাটে, অলি-গলির প্রতিটি দেয়ালে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের দেয়ালগুলোতেও কোন না কোন কবিতা লেখা দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও হাফেজের কবিতা, কোথাও রুমীর

বাম থেকে তুর্কী, ইরান ও আমরা বাঙালি দু'জন

মাসনবীর কবিতা, কোথাও গালেবের কবিতা আবার কোথাও শেখ সাদীর গুলিস্তাঁর কবিতা আবার কোথাও আধুনিক কবিগণের কবিতা। কোথাও লেখা দেখলাম–

"আয়ে ওয়াকেফে আসরারে যামিরে হামে কাস
দার হালাতে আজুয দাস্তগিরে হামে কাস
ইয়া রাব তু মারা তওবাহ দেহ ওয়া উযর পাযির
আয়ে তওবা দেহ ওয়া উযর পাযির হামে কাস।

-(আবু সাইদ আবিল খায়ের)

অনুবাদঃ হে সকলের হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত সত্তা! অসহায় এবং দুর্বলের সাহায্যকারী!
হে খোদা! তুমি আমাকে তওবার সৌভাগ্য প্রদান কর এবং আমার দুর্বলতা ক্ষমা কর।
হে তওবা করার সৌভাগ্য প্রদানকারী এবং সকলের দুর্বলতা ক্ষমাকারী।

এসব কবিতা পাঠে তাদের মাঝে খোদার প্রতি ভালবাসা পরিলক্ষিত হয়। তারা গর্ব করে বলে, পৃথিবীতে ফার্সির চেয়ে মিষ্টি কোন ভাষা নেই এবং ফার্সি কবিতার চেয়ে সুন্দর কোন কবিতা নেই।

"বেদেহ সাকি মেইয়্যে বাকি কে দার জান্নাত না খাহি ইয়াফত, কেনারে আবে রুকনাবাদ ও গালগাসতে মুসাল্লারা" হাফেজের এই কবিতার মাঝে যে রুকনাবাদ নদী এবং মুসাল্লা বাগানের উল্লেখ করা হয়েছে এ দু'টি দেখার সুযোগ না হলেও ইরানের ঐতিহাসিক শহর 'ইস্পাহান' দেখার সুযোগ হয়েছে। সৌন্দর্য্য কাকে বলে! নকশা খচিত সুরম্য অট্টালিকা ও মসজিদগুলো আজও অক্ষত। বিশেষকরে ইস্পাহানের গীর্জাগুলোর দেয়ালে তৈলচিত্র বিগত পাঁচশ' বছরের ইরানের ইতিহাসের সাক্ষী। যদিও ঐসকল গীর্জায় এখন আর কেউ উপাসনা করে না তবে ইরান সরকার এগুলো দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করে।

ফারসিতে চোরকে বলা হয় "দুযদ"। আমার মনে হয় অধিকাংশ ইরানি শিশুর এ শব্দটি জানা নেই কারণ ইরানে সাধারণত চুরি হয়-ই না। ইরানি এক যুবককে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এখানে চুরির শাস্তি কী? সে একটু তামাশা করেই বলল, সৌদি আরবে চুরি করলে হাত কেটে দেয়া হয় আর আমাদের এখানে কেউ চুরি করলে তাকে আরও কিছু জিনিষ দিয়ে দেয়া হয়।

প্রযুক্তির দিক থেকে ইরানি জাতি অন্যান্য উন্নত জাতির তুলনায় কোন অংশে পিছিয়ে নেই। তারা নিজেরাই গাড়ি তৈরি করে নিজ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করে থাকে। এছাড়া ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ এ দেশটি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে উক্ত শক্তির ব্যবহার করে থাকে। কাজবিন শহর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উত্তরে পাহাড়ের ওপর দর্শনীয় একটি জায়গার নাম "আলামুত"।

বলা হয়ে থাকে এ "আলামুত"-ই ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ পাহাড়ের সমষ্টি এবং এখানে সোনার খনিও আছে। আলামুতেও যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। উক্ত পাহাড়ে উঠতে আরও কয়েক শত পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হয়। এ পাহাড়গুলোও মেঘের ওপরে ফলে পাহাড় থেকে নিচের মেঘগুলোকে তুলার সাগর বলে ভ্রম হয়।

আমাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রেস্টুরেন্টে। হোস্টেল থেকে রেস্টুরেন্টের দূরত্ব ছিল প্রায় তিন কিলোমিটার। প্রতি বেলায় আমাদের হোস্টেলের অনতিদূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভলভো বাস অপেক্ষা করত। সময় নির্ধারণ করে দেয়া ছিল। কেউ যদি সময় মত প্রথম ট্রিপে না যেতে পারত তবে দ্বিতীয় ট্রিপে যেত আর দ্বিতীয় ট্রিপ মিস করলে তার জন্য খাবার নিয়ে আসা হত। সময়ের সদ্ব্যবহার, নিয়ম-শৃঙ্খলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এ সবকিছু তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে সারিসারি ঝাউগাছ এবং কিছু দূরে দূরে ফুলের বাগান। বাগানের মালীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছের পরিচর্যা এবং পানি দেয়ার কাজ করতেই থাকে। প্রচণ্ড রোদেও তাদেরকে সামান্য ক্লান্ত হতে দেখা যায় না।

ইরানিদের মাঝে অদ্ভূত কিছু বিষয় আছে যার উল্লেখ না করলেই নয়। ইরানীরা চায়ে চিনি খায় না। প্রথমে শুনতে অবাক লাগে কিন্তু যখন দেখবেন চা পানের পূর্বে মিছরির (ফার্সিতে বলে 'কান্দ') একটা খণ্ড মুখের ভিতরে দিয়ে তার পর চা পান করে তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। অর্থাৎ চিনিহীন চায়ের মিষ্টতা নিশ্চিত করার জন্য আগের থেকেই মিষ্টির ভাণ্ডার এদের মুখে দেয়া থাকে।

ইরানে মেয়েদেরকে অশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। কারগুলোর চালকের আসনে প্রায়ই মেয়েদেরকে দেখা যায় যা আমাদের দেশে বিরল। শাহ্‌দের পতনের পর জনাব আয়াতুল্লাহ্ খুমেনিইর শাষনামল থেকে মেয়েদের মাথায় কাপড় দেয়া বাধ্যতামূলক। যদি কেউ ভুলবশতঃ মাথায় কাপড় না দেয় তবে অন্যান্য মহিলারা তাকে তিরস্কার করে অথবা দূরে কোথাও দাঁড় করিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করে। ফলে মেয়ে শিশুদের মাথায়ও কাপড় (যদিও নাবালিকাদের জন্য হিজাব মোটেও আবশ্যক নয়) দেয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়। এছাড়া বাসের ভিতরে মহিলাদের জন্য পিছনের অর্ধেক অংশ নির্ধারণ করে রাখা আছে যেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ আবার পুরুষের জন্য বাসের সামনের

রিফ্রেশার্স কোর্সে আগত সকল ছাত্র-ছাত্রী

অর্ধেকাংশ নির্ধারণ করা আছে যেখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ।

সৌভাগ্য বশতঃ আমি যে সময় ইরানে ছিলাম, সময়টা ইরানি ফলের মৌসুম ছিল। পিচ, অলু, গুলাবি বা নাশপাতি, খরবুজা, তরমুজ, আঙুর, আপেল এবং নাম-না-জানা অনেক ফলের সমাহারে বাজারগুলো ভরপুর ছিল। সেদেশে আপেল-আঙুর ৩০ টাকা কেজি যে আঙুর আমাদের দেশে ৪০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়। তবে ফল ভিন্ন অন্যান্য খাবারের দাম আমাদের দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া ইরানের কাপড় বাংলাদেশের কাপড়ের তুলনায় খুব একটা উন্নত না। তাই তারা ভাল কাপড়ের জন্য দুবাই বা অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীল। ইরানের একটি পুরাতন বাজার আছে যেখানে ক্রেতার সামনে কাপড় তৈরি করে তা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করে দেয়া হয়। অথচ মূল্যের তুলনায় এগুলো তা আহামরী কিছু নয়।

ইরানের প্রধান আয়ের উৎস্য হল পেট্রোল। তবে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে অবাধে আর তেল বিক্রি করতে পারছে না। তাদের দেশের এক লিটার পেট্রোলের মূল্য আমাদের দেশের এক লিটার বোতলজাত পানির মূল্যের সমান অথাৎ ২০/২২ টাকা। আর এই মূল্য বিগত কয়েক বছরে চারবার মূল্যবৃদ্ধির পর নির্ধারিত হয়েছে। তেলের এই মূল্যবৃদ্ধিও অনেক ইরানির কাছে অগ্রহণযোগ্য।

ইরান বর্তমানে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ইরানে বেকার যুবকের সংখ্যাও আমাদের দেশের তুলনায় কম নয়। তবে অধিকাংশ বেকার যুবক কার কিনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আর ক্যাবিং করে।

ইরানিরা শিক্ষকদেরকে যে কতটা সম্মান করে তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। একটা ঘটনা না বললেই নয়। দেশে ফেরত আসার পথে ইরান এয়ারপোর্টে আমি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যখন আমাদের মালামাল প্লেনে পাঠানোর জন্য ওজন করাচ্ছিলাম তখন সহযাত্রী শিক্ষকের মালামাল অনুমোদিত ওজনের চেয়ে প্রায় ১২ কেজি বেশি ছিল। প্লেনের ইরানি কর্মকর্তা তার মালামাল প্লেনে ওঠাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং প্রায় ২০০ ডলারের বিনিময়ে তা প্লেনে ওঠাতে সম্মত হল। সে মুহূর্তে উক্ত শিক্ষকের কাছে বড়জোর ৫০ ডলার ছিল। অনেক কিছু বলেও তিনি উক্ত কর্মকর্তার মন গলাতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে আমি উক্ত ইরানি কর্মকর্তাকে বললাম, 'ইনি আমাদের শিক্ষক (আমি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউটের ছাত্র বিধায় এ কথা বললাম)। তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বইগুলো দেয়া হয়েছে। তিনি তো বইগুলো রেখে যেতে পারবেন না'। তখন সে কর্মকর্তা বলল, ঠিক আছে শিক্ষকদেরকে আমরা সম্মান করি। কোন টাকা দেবার দরকার নেই। তবে অন্যান্য যাত্রীরা যেন না জানে। তার এমন ব্যবহারে বারবার বলতে মন চাইছিল, হে ইরানি তোমায় হাজার সালাম।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টি ইরানের কাজবিন শহরে অবস্থিত যা তেহরান থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরত্বে

কাজবিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি লাইব্রেরী

অবস্থিত। বই ক্রয় উপলক্ষে এক মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বার তেহরানে যাবার সুযোগ হয়েছে । তেহরানের প্রাণকেন্দ্র ময়দানে আযাদীতে মূলত সকল বইয়ের দোকান দেখা যায়। সেখান থেকে কিছু বই ক্রয় করেছি বটে তবে তাদের বইয়ের মূল্য আমাদের দেশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ। তবুও বিভিন্ন বইয়ে সমৃদ্ধ তাদের লাইব্রেরীগুলো। একটা ছবি তুলে ফেললাম, সাথে সাথে একজন এসে বলল "আকস গ্রেফতান মামনু" অর্থাৎ এখানে ছবি তোলা নিষেধ। আমি ক্ষমা চাইলাম। তেহরানের বাস এবং ট্রেন আরও অদ্ভুত। দ্বিতল বাসের দেখা পেলাম না তবে সব ট্রেনই দ্বিতল। ইরানে বিভিন্ন দর্শনীয় স্মৃতি চিহ্ন আছে বিশেষ করে তাদের যাদুঘরগুলো। এসকল যাদুঘরে লেখা থাকে "ফ্লাস মামনু" অর্থাৎ ছবি তোলা যাবে তবে ফ্লাস ব্যবহার করা যাবে না।

ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার ব্যাপারে ইরানের অভিভাবকগণ খুবই সাবধানতা অবলম্বন করেন। পার্কগুলোতে এবং রাস্তাঘাটে ছেলে-মেয়েদের অনৈতিক আচরণ কখনোই চোখে পড়ে না। তবে ইউরোপীয় ছেলেদের কাছে তারা তাদের মেয়ে বিয়ে দিতে বেশ আগ্রহী। ইরানে কর্মসংস্থান কম হবার কারণে যুবকদের মাঝেও ইউরোপে যাবার প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়।

পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এ সুন্দর দেশটিতে দীর্ঘদিন যাবত বৃষ্টি হয় না ফলে দেশের প্রায় সব জায়গা শুষ্ক। ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে তারা দিনাতিপাত করে এমনকি মালিরা বাগানে সারাদিন যে পানি দিতে থাকেন তা ঐ ভূগর্ভস্থই। শুনে অবাক হবেন, ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী ইস্পাহানে অথচ সে নদীতে একফোঁটা পানি নেই। তবুও ইরান সরকারের প্রচেষ্টায় শোভাবর্ধনে মালীরা দিন-রাত পরিশ্রম করে শহরগুলিকে সবুজ-শ্যামল করে রেখেছেন। এ সুন্দর দেশটিতে বহু বিখ্যাত কবিদের সৃষ্টি হয়েছে যাদের কবিতা আজও সেদেশের মানুষকে সামনে চলার পথ দেখায়, মানুষের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে। তেমনি একজন প্রেমের কবি হাফেজ বলেছেন, "মারা দার মানযিলে জানান চে আম্ন ও এ্যাশ চুন হারদাম
জারাস ফারয়াদ মি দারাদ কে বার বান্দিদ মুহমেল হা।"

অর্থাৎ আমার প্রেমাস্পদের বাড়িতে আমি কীভাবে শান্তিতে থাকতে পারি কেননা সারাক্ষণ মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে, (আর বলছে) গুছিয়ে নাও, ওপারে যেতে হবে।

কবি ঠিকই বলেছেন। পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষণস্থায়ী। তাই এ সামান্য সময়ে একদিকে যেমন পরকালের প্রস্তুতি নিতে হবে তেমনি এ সুন্দর পৃথিবী যদি মন ভরে দেখতে না পারি, অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত না করতে পারি তাহলে মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে, যেকোন সময় ডাক আসবে আর পরে আক্ষেপ করতে হবে। তাই যারই সুযোগ আছে তার এ পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখা উচিত। ইবনে বতুতাও হয়তো এ মতে বিশ্বাসী ছিলেন তাইতো তিনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ভ্রমণ করেছেন। "ইন সাআদাত বেজুরে

বাযু নিস্ত
গার না বাখশে খোদায়ে বাখশান্দে”

এই সৌভাগ্য গায়ের জোরে লাভ হয় না, অনন্ত অসীম দাতা খোদা যদি এটা দান না করেন।

ইরান বা পারস্য হযরত আকদাস মসীহে মাওউদ(আ.)-এর পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস। এই জাতির মাঝে সততা, ভদ্রতা, শালীনতা, শিষ্টাচার, সহমর্মিতা ও মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অনেকগুলো বিরল গুনাগুণ বিদ্যমান। আমি একমাস ধরে এদেরকে দেখেছি আর চিন্তা করেছি। সময়ের বিবর্তনে ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনে এ জাতি আজ অনেক কিছু অর্জন করেছে আবার একই সাথে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিতও বটে। আমি ভেবেছি আর চিন্তা করেছি এঁদের গুণাগুণ আমরা কীভাবে আমাদের জাতির মাঝে সঞ্চারিত করতে পারি? আবার ভেবেছি আমাদের কাছে যে সব নেয়ামত আছে ও আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার আছে তা কীভাবে এঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। আল্লাহর কাছে আমার দোয়া, এঁদের উত্তম গুণাগুণের বিনিময়ে এঁদের পূর্ণ সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য দাও। কেননা সমস্ত ক্ষমতার সর্বাধিকারী একমাত্র তুমিই।

যে স্মৃতি ভুলবার নয়

এন এন মোহাম্মদ সালেক

মোহতরম গোলাম মওলা খাদেম সাহেব বাংলাদেশ জামা'তে আহ্‌মদীয়ার এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে তিনি নীরব ও নিভৃতে আহ্‌মদীয়াতের আলোর দিপ্তশিখা নিজ হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন। গোলাম মওলা খাদেম সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়া খড়মপুর গ্রামের খাদেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। অল্প বয়সে যখন তিনি ষষ্ঠ/সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সৌভাগ্যক্রমে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ প্রাপ্ত হন মরহুম মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব(রহ.)-এর মাধ্যমে। তখন থেকে তাঁর স্পৃহা কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর দর্শন লাভ করা। কিন্তু পারিবারিক এবং সামাজিক বাধা ও সর্বোপরি আর্থিক সীমাবদ্ধতা তাঁর জন্য প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মুহাম্মদী মসীহ্‌র সন্ধানে গোলাম মওলার উদ্বেলিত মন সকল বাধা অতিক্রম করে অবশেষে পরিবারের সকলের অগোচরে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করে প্রতিশ্রুত মসীহ্(আ.)-এর প্রথম খলীফার হাতে হাত রেখে বয়াতের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থেই ‘গোলাম মওলা’য় পরিণত হলেন। মরহুম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব তার আর্থিক দূরঅবস্থার কারণে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে- একথা মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি কোলকাতার নিজ গৃহে রেখে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। গোলাম মওলা সাহেব আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্ভবত: ১৯১৭-১৯ সনে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সংসারের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়। তাই আর লেখাপড়া হল না। ছোট ভাইদের লেখাপড়া চালিয়ে সংসার পরিচালনার জন্য তাঁকে বৃটিশ আমলে রেল বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করতে হল। পরিবারের ভরণপোষণ ও ভাইদের পড়াশোনার খরচের জন্য কখনও তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। কেননা তাঁর একজন সুযোগ্য সহধর্মিণী লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভালবাসার সাথে এই সমস্যা ভাগাভাগি করে নিলেন। তাঁদের প্রধান কর্তব্য হিসেবে বেছে নিলেন দীনের তথা ধর্মের সেবা- তারপর ছোট ভাইদের লেখাপড়ার দায়িত্ব। ছোট ভাইদের মধ্যে মরহুম গোলাম সামদানী সাহেব বি.এ বি. এল আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া উল্লেখযোগ্য। সহধর্মিণী ছিলেন জামা'তে আহমদীয়ার প্রখ্যাত ধর্ম প্রচারক আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের ভগ্নী। ন্যায়পরায়ণতা খোদাভীরুতা, জামা'ত ও নেযামের এতায়াতের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ ছিলেন গোলাম মওলা সাহেব। প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন জামা'তের খলীফা, আমীর এবং সর্বোপরি সকল স্তরের আহ্‌মদী ভাই বোনদের। জামা'তের আদেশ-নির্দেশকে শিরোধার্য হিসেবে গণ্য করতেন তিনি। ইসলাম তথা আহ্‌মদীয়াতের জন্য ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জীবনীতে জামা'তী চাঁদা আদায়ে, দোয়ায় ও ইস্তেকামতে। স্বল্প আয়ের জীবনে এক তরকারী খেয়ে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করতেন। জামা'তের জলসা ও ইজতেমার কথা শুনলে দেওয়ানার মত ছুটে যেতেন অংশগ্রহণ করতে এবং নিভৃতে বসে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। কারও প্রতি তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না। কেউ তাঁকে কিছু বললে নীরবে সহ্য করতেন। এই জন্মে তাঁর কোন শত্রু ছিল না। সকলেই তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসত। আমি তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে যে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করেছি-তিনি তবলীগের মাঠে নিবেদিত প্রাণ সৈনিক ছিলেন। এই বুযুর্গ ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৮৯ সালে তাঁর পুত্র জনাব জালাল উদ্দীন খাদেম সাহেবের চট্টগ্রামস্থ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন : (ইন্নানিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন)।

তিনি প্রায় একশ' বছর আয়ু লাভ করেছিলেন। তিনি তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে এবং বহু নাতি-নাতনি ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি ও সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাই।

গোলাম মওলা খাদেম

মোহাম্মদ এনামুল হক ভূইয়া

পিতা: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ভূইয়া, মাতা: মোছাম্মদ সালেমা বেগম, জন্ম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ক্রোড়া গ্রামে ১৯৫৮ সালে। সম্ভ্রান্ত বাখরাম ভূইয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। মৃত্যু: ২৮ শে জুলাই, ২০০১। জামাতী দায়িত্ব: কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া। সদালাপী, বন্ধুত্বসুলভ, অতিথিপরায়ণ, সুবক্তা, উদার, দানশীল ও তবলীগকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্র রেখে গেছেন। সকলের কাছে দোয়ার আবেদন।

মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবানের তালিকা

বাংলাদেশ জামা'তে কর্মরত মুরব্বীগণ:

১. মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ২. মওলানা সালেহ আহমদ ৩. মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ৪. মওলানা বশিরুর রহমান ৫. মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম ৬. মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন ৭. মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ৮. মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান ৯. মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ ১০. মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন ১১. মওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম ১২. মওলানা রইছ আহমদ ১৩. মওলানা আকরামুল ইসলাম ১৪. মওলানা জাফর আহমদ ১৫.মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ ১৬. মওলানা মোহাম্মদ খুরশীদ আলম ১৭. মৌলানা আরিফুর রহিম ১৮. মওলানা নওশাদ আহমদ ১৯. মওলানা শেখ শরীফ আহমদ ২০. মওলানা মামুনুর রশিদ ২১. মওলানা মোবারেজ আহমদ সানি ২২. মওলানা মাসুম আহমদ ২৩. মওলানা সালাহ উদ্দীন ২৪. মওলানা রশিদ আহমদ ২৫. মওলানা রাসেল সরকার ২৬. মওলানা খালেদ হোসেন সবুজ ২৭. মওলানা ইয়াসিন আহমদ ২৮. মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন ২৯. মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ৩০. মওলানা জাহিদুল ইসলাম ৩১. মওলানা নাসের আহমদ ৩২. মওলানা তারেক আহমদ ৩৩. মওলানা রুহুল বারী ৩৪. মওলানা আনিসুল ইসলাম।

বাংলাদেশ জামা'তে কর্মরত মোয়াল্লেমগণ:

১ মৌলভী আব্দুর রহমান রানু ২. মৌলভী হাফেজ আবুল খায়ের ৩. মৌলভী মাহমুদ আহমদ শরীফ ৪. মৌলভী মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম ৫. মৌলভী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ৬. মৌলভী ফরহাদ হোসেন ৭. মৌলভী এস.এম. তৌহিদুল ইসলাম ৮. মৌলভী এস.এম. আব্দুল হক ৯. মৌলভী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম ১০. মৌলভী শেখ আব্দুল ওয়াদুদ ১১. মৌলভী মোহাম্মদ আমীর হোসেন ১২. মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুস সালাম-১ ১৩. মৌলভী দাউদ আহমদ বোখারী ১৪. মৌলভী এনামুল হক রনি ১৫. মৌলভী মোজাফফর আহমদ রাজু ১৬. মৌলভী আসাদউলাহ আসাদ ১৭. মৌলভী শাহ আলম খান ১৮. মৌলভী মাহমুদ আহমদ আনসারী ১৯. মৌলভী এহতে শামুল বশীর আহমদ ২০. মৌলভী নাসের আহমদ আনসারী ২১. মৌলভী মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ২২. মৌলভী মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ২৩. মৌলভী ইদ্রিস আহমদ ২৪. মৌলভী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ২৫. মৌলভী মাহমুদ আহমদ সুমন ২৬. মৌলভী এস.এম. মাহমুদুল হক ২৭. মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ২৮. মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুস সালাম-২ ২৯. মৌলভী সাদেক আহমদ ৩০. মৌলভী তাহের আহমদ ৩১. মৌলভী মনিরুজ্জামান ভুঁইয়া ৩২. মৌলভী জাকির হোসেন ৩৩. মৌলভী মাহমুদুল হাসান মিনহাজ ৩৪. মৌলভী দেওয়ান মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন ৩৫. মৌলভী মোহাম্মদ আবু তাহের ৩৬. মৌলভী মোহাম্মদ আবদুর রহমান-২ ৩৭. মৌলভী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ৩৮. মৌলভী যিকরে এলাহী ৩৯. মৌলভী সেলিম আহমদ কাজল ৪০. মৌলভী মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ৪১. মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াহীয়া ৪২. মৌলভী রবিউল ইসলাম ৪৩. মৌলভী লুৎফর রহমান ৪৪. মৌলভী সেলিম আহমদ ৪৫. মৌলভী ওলিউর রহমান ৪৬. মৌলভী আব্দুল হাকিম ৪৭. মৌলভী শামীম মিয়া ৪৮. মৌলভী রাশিদুল ইসলাম ৪৯. মৌলভী মোস্তাফিজুর রহমান ৫০. মৌলভী আসলাম আহমদ ৫১. মৌলভী ফরহাদ আলী ৫২. মৌলভী আসাদুজজামান রাজিব ৫৩. মৌলভী রফিকুল ইসলাম ৫৪. মৌলভী আল-আমীন ৫৫. মৌলভী শামসুল হুদা

তোমার এই ঝরনাতলায়

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আল্লাহর নাম স্মরণ করে যাই ধর্মের জারি গাইয়া
শোনেন-শোনেন বিশ্ববাসী, শোনেন মন দিয়া।
শতবর্ষে বাংলাদেশের জামা'ত আহমদীয়া
জামা'ত পাইল একশত উনিশ খোদার দয়া নিয়া।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সরাইল, নাটাই, বাশারুক, বিষ্ণুপুর,
ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তালশহর, দুর্গারামপুর,
আখাউড়া, তারুয়া, ক্রোড়া, শালগাঁও, শাহবাজপুর
ঘাটুরা–মিলিয়া চৌদ্দ জামা'ত ভরপুর।

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ফতুল্লা, তেজগাঁও, মিরপুর,
রিকাবিবাজার, আশুলিয়া, ভৈরব, গাজীপুর,
নরসিংদি, সোনারগাঁও, মুন্সিগঞ্জ, চরসিন্দুর,
বৃহত্তর ঢাকার তের জামা'ত সুমধুর।

বীরপাইকশা, তেরগাতী, হোসনাবাদ, জামালপুর
কটিয়াদী, ধানীখোলা, ময়মনসিংহ, বাজিতপুর,
সরিষাবাড়ী, বানিয়াজান, বকশীগঞ্জ, ছোনটিয়া,
ফুলবাড়িয়া, গালিমগাজি, চাঁনতারা, রাংটিয়া,
সোহাগী–সতেরটি জামাত মোমেনশাহী দিয়া।

কৃষ্ণনগর, পটুয়াখালী, খাকদান, কুকুয়া,
বরিশাল, কাউনিয়া আর বড় বাইশদিয়া,
সাতটি জামাত বৃহত্তর বরিশাল জেলায়
উথাল-পাথাল নদীর জলে কী সুন্দর দেখায়।

পশ্চিম শাকদী, কুটিরহাট, ফাজিলপুর, চরদুখিয়া,
চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, অম্বরনগর, মাহিল্লা,
নোয়াখালী-চাঁদপুর-চট্টগ্রাম-কুমিল্লায় এই জামাত
দোয়া করে অষ্টপ্রহর তুলিয়া দুই হাত।

চানপুর চা বাগান, হবিগঞ্জ-জামালপুর,
ইসলামগঞ্জ, পাগুলিয়া, উমেদপুর,
শেলবরষ, সিলেট, বীরগাঁও, বড়চর,
হাওর-বাওর সিলেট জেলায় নবরত্নকর।
বলিয়ানপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, ভেটখালী,
বটিয়াপাড়া, নওবেকী, সুন্দরবন, উথলী,
চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, উত্তর ভবানীপুর
রঘুনাথপুরবাগ, ঘড়িলাল, যশোর, সন্তোষপুর।

স্বর্ণরাজপুর, নাসেরাবাদ, শৈলমারী,
খুলনা বিভাগ জুইড়া আছে আঠার জামাত তারই,
রয়েল বেঙ্গল টাইগার সম গর্জন করিতেছে
নতুন-নতুন সম্ভাবনা উঁকি মারিতেছে।

রাজশাহী, তাহেরাবাদ, বড়হাট, পুরুলিয়া,
পাবনা, নুরনগর, মেরীগাছা, তেবাড়ীয়া,
মহারাজপুর, নিউসোনাতলা, কাফুরিয়া,
কিসমত মেনানগর, শ্যামপুর, রংপুর, বগুড়া।

লালমণিরহাট, মাহীগঞ্জ, গাইবান্ধা, সৈয়দপুর,
হেলেঞ্চাকুড়ি, ভাতগাঁও, জগদল, দিনাজপুর,
ক্ষুদ্রপাড়া, আহমদনগর, শালসিঁড়ি, ডোহাণ্ডা,
কমলাপুকুরি, বীরগঞ্জ, সৈয়দপুর-বাগমারা।

নাজিরপুর বাজার, সিরাজগঞ্জ, চড়াইখোলা,
তেত্রিশখানি জামা'ত লইয়া উত্তরবঙ্গের মেলা,
রব পড়েছে দিকে- দিকে চিন্তার কারণ নাই
শতবর্ষে জ্বলে উঠল বাংলাতে রোশনাই।

দিনে-দিনে বেড়ে চলছে বাংলাদেশের বুকে
একশ' উনিশ জামা'ত লইয়া আছি সুখে-দুখে,
মনস্তুষ্টি বাংলার হল– আরো হওয়া চাই
বঙ্গবাসী খোদার কাছে চাইলে শুধু পাই।

এহসানুল হাবিব বলে, হে আল্লাহ দয়াবান
বাংলাদেশের জামা'তগুলির লিখাইলে নাম,
বিজয় শতাব্দীতে কর এত জামা'ত দান
গুণে যেন শেষ না করতে পারে মানব-প্রাণ।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝

যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না কেবল সে-ই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করতে পারে। অতএব এরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে বলে আশা করা যায়। *(সূরা তওবা : ১৮)*

বাংলাদেশের আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন

প্রায় দেড় হাজার মুসল্লী ধারণক্ষমতা সম্বলিত তিনতলা 'দারুত তবলীগ' মসজিদ
Darut Tabligh Central Mosque, Dhaka, Bangladesh

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বকশীবাজারে অবস্থিত ‘দারুত তবলীগ’ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্স
‘Darut Tabligh’ Central Ahmadiyya Mosque and Mission, Dhaka, Bangladesh

মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্সের সরাসরি পশ্চিম থেকে তোলা ছবি
The Darut Tabligh Mosque and Mission Complex

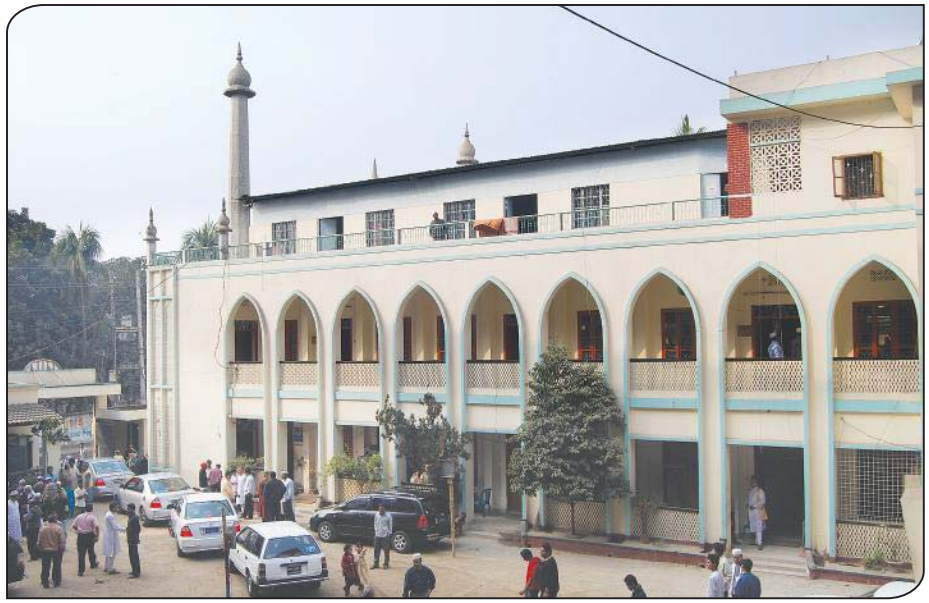

দারুত তবলীগ মসজিদের প্রাঙ্গন থেকে তোলা ছবি
The Darut Tabligh Mosque

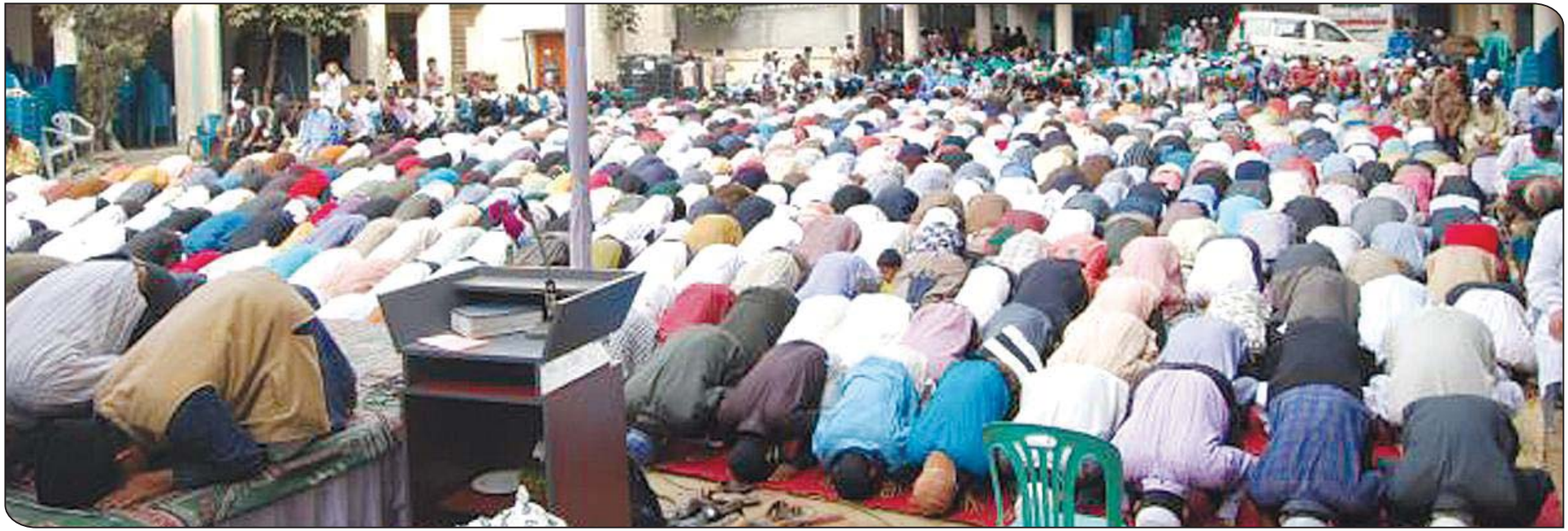

২০১১ সালে ঢাকা জলসায় আগত মুসল্লীদের নামাযের দৃশ্য
Ahmadis in submission to Allah during a congregation

খিলাফত শতবার্ষিকী

(১৯০৮-২০০৮) স্মারক মসজিদ, মসজিদে নূর, ফতুল্লা

Khilafat Centenary Memorial Mosque 'Masjid Noor' at Fatullah built by Majlis-e-Ansarullah, Bangladesh

২০০৮-০৯ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের উদ্যোগে এই স্মারক মসজিদটি নির্মিত হয়। নীচে ২২শে মে '০৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে আনসারুল্লাহ্‌র কর্মকর্তাবৃন্দ

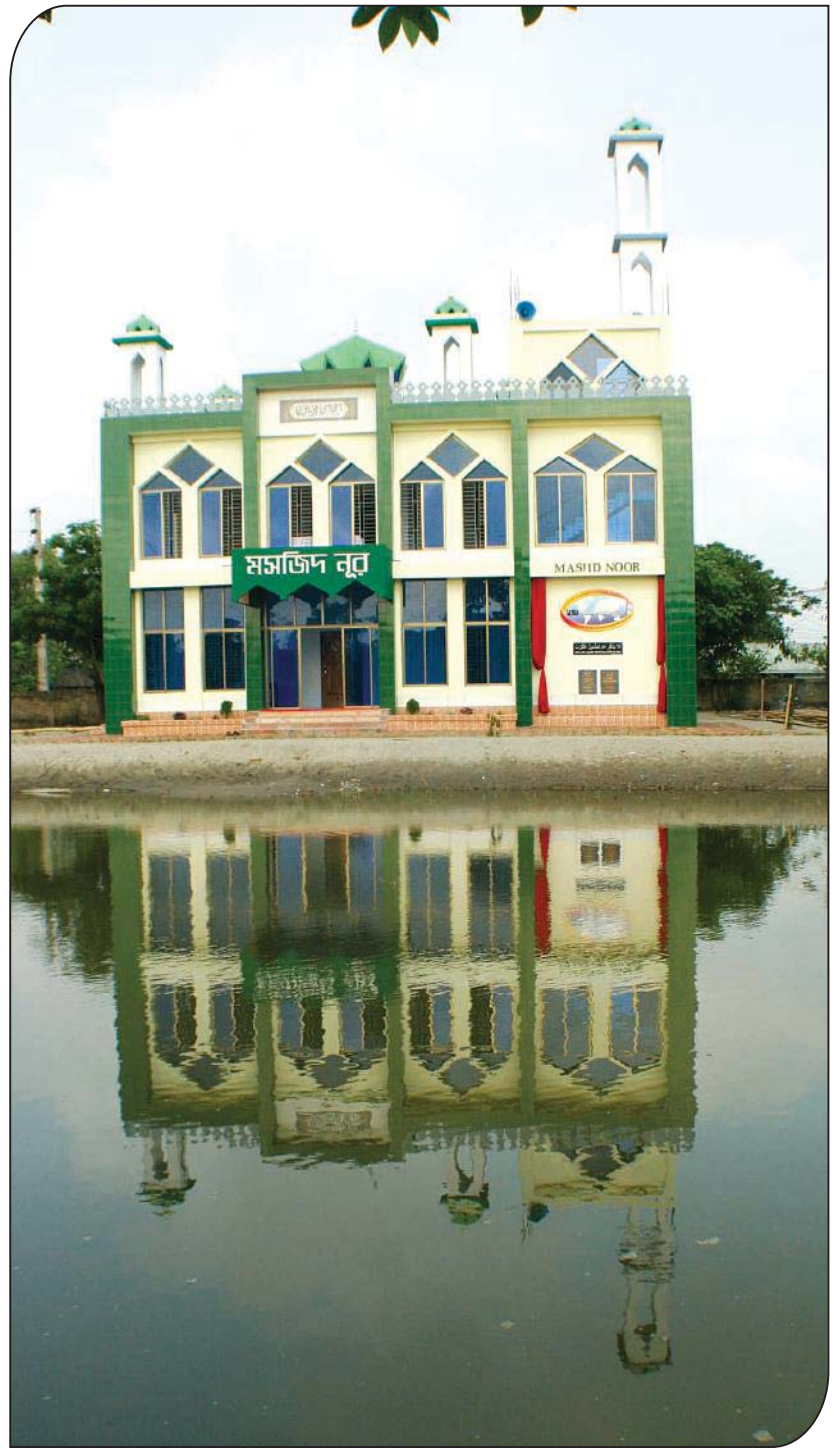

আহমদীয়া মসজিদ, মুন্সিগঞ্জ
Ramzan Beg Ahmadiyya Mosque, Munshiganj

নারায়ণগঞ্জ আহমদীয়া মসজিদ
Mission Para Ahmadiyya Mosque, Narayanganj

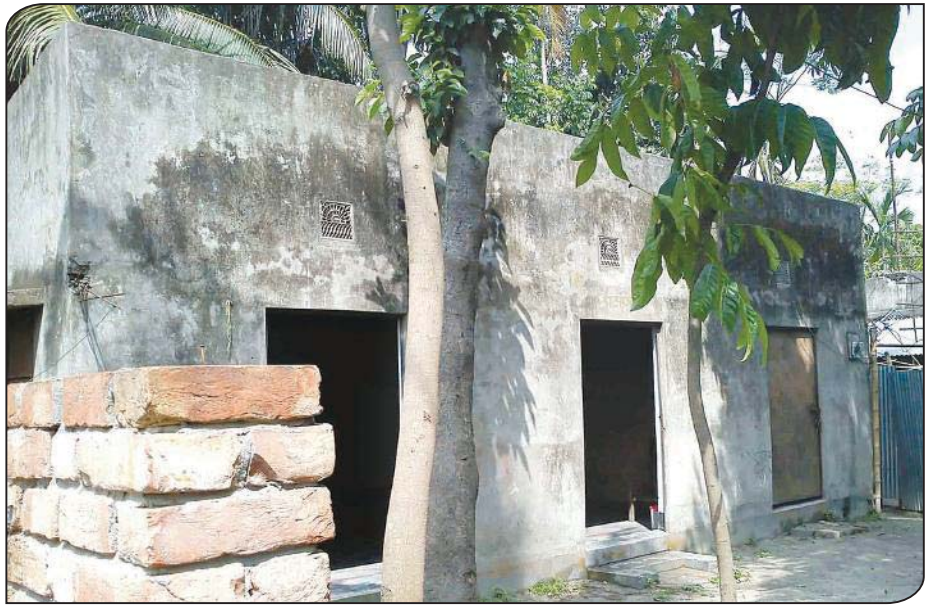

উত্তর বাহেরচর আহমদীয়া মসজিদ, সাভার
Uttar Bahirchar Ahmadiyya Mosque, Savar

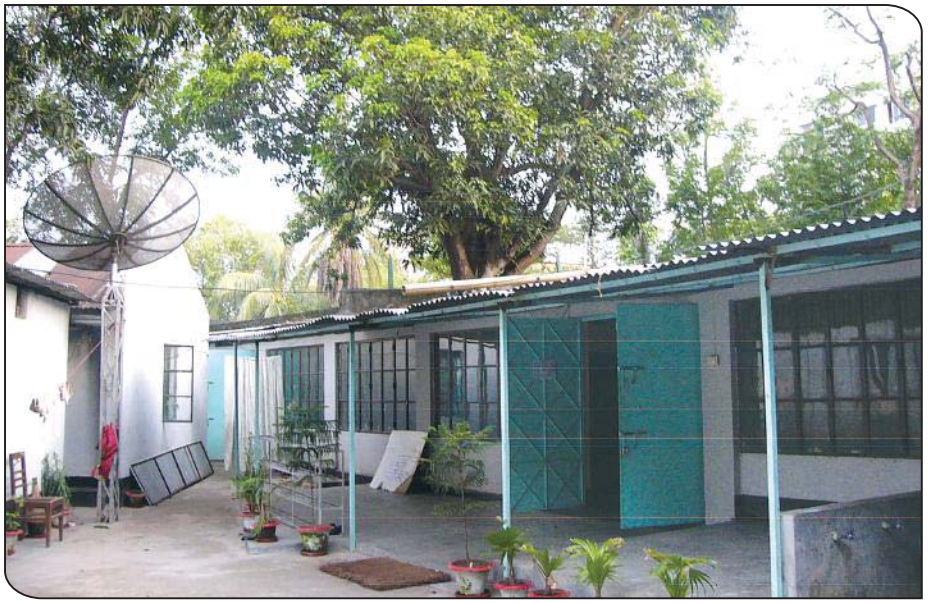

মিরপুরে আহমদীয়া মসজিদ
Ahmadiyya Mosque at Mirpur

তেজগাঁও আহমদীয়া মসজিদ, ঢাকা
Tejgaon Ahmadiyya Mosque, Dhaka City

ঢাকার তেজগাঁও থানাধীন নাখালপাড়াস্থ আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুল হাদী'। ২০০৩ ও ২০০৪–এ ছোট্ট এই মসজিদকে দখল করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত 'খতমে নবুয়ত' সংগঠন বারবার মিছিল, আন্দোলন ও ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে।

Nakhalpara Ahmadiyya Mosque in Dhaka. This small Mosque was targeted many times by the fanatics of the so-called Khatme Nabuwwat movement.

'মস্‌জিদুল হুদা' আহমদীয়া মসজিদ, মাদারটেক
'Masjidul Huda'-Ahmadiyya Mosque, Madertek, Dhaka City

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদীয়া মসজিদ
Ahmadiyya Mosques in Brahmanbaria

মসজিদে বায়তুল ওয়াহেদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
Masjid-e-Baitul Wahed, Brahmanbaria

'মসজিদুল মাহদী'তে হুযূরের প্রতিনিধি মুফতি মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন ও অন্যান্যরা
Masjidul Mahdi, Brahmanbaria. The first Ahmadiyya Mosque in Bengal

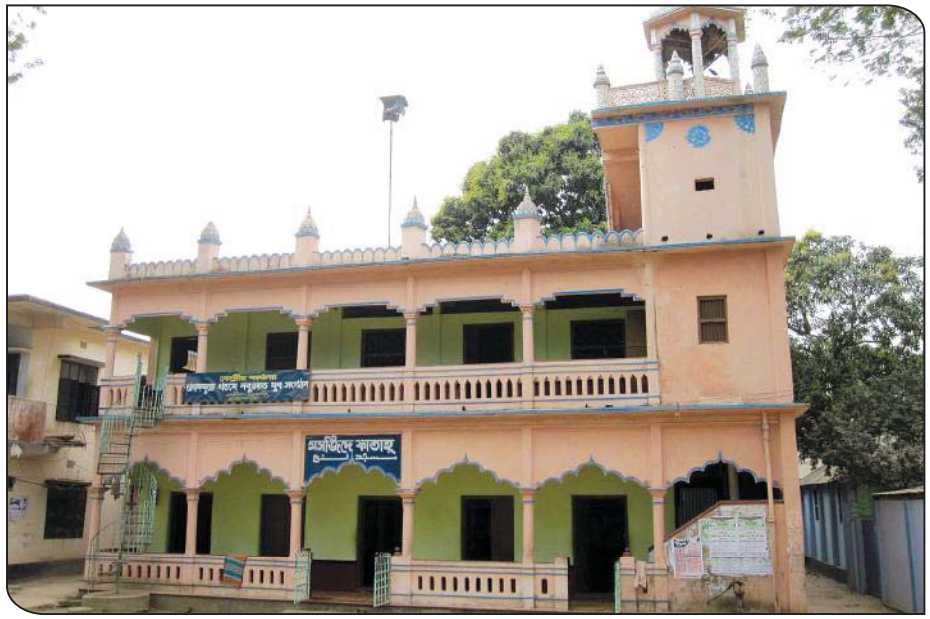

উগ্রপন্থি ধর্মান্ধচক্র কর্তৃক দখলকৃত মসজিদে মোবারক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
Masjid-e-Mubarak, built by Ahmadis and captured by fanatic Mullahs

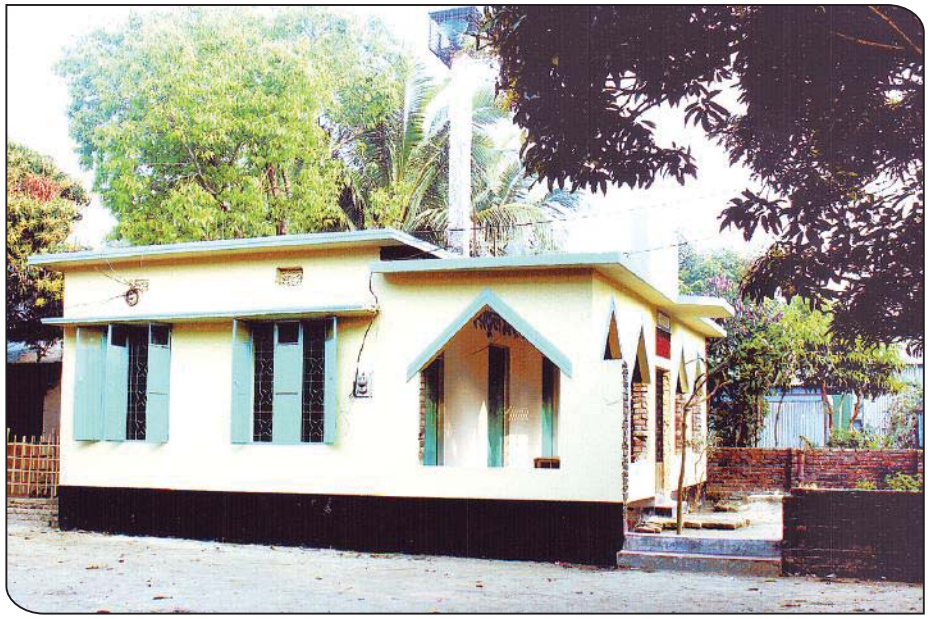

মসজিদে বাইতুল মাহ্‌দী, দূর্গারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
Masjid-e-Baitul Mahdi, Durgarampur, Brahmanbaria

মসজিদে আল ফজল, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
Masjid Al Fazl, Bishnupur, Brahmanbaria

ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া মসজিদ
Ahmadiyya Mosque at Khudro Brahmanbaria

তারুয়ায় অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদ ‘মসজিদে বাশারত’
‘Masjid-e-Basharat’ Tarua Ahmadiyya Mosque, Ashuganj, Brahmanbaria

শালগাঁও আহমদীয়া মসজিদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
Shalgaon Ahmadiyya Mosque, Brahmanbaria

ঘাটুরা আহমদীয়া মসজিদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
Ghatura Ahmadiyya Mosque, Brahmanbaria

আহমদীয়া মসজিদ, শাহবাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
Shahbazpur Ahmadiyya Mosque, Brahmanbaria

কোড্ডার শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ এবং এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি

১২ই এপ্রিল ২০০০ সনে ধর্মান্ধরা কোড্ডার আহমদীয়া মসজিদ জোরপূর্বক দখল করে নেয়। অনেক ত্যাগ ও সংগ্রাম করে সে গ্রামের আহমদীরা ৮ই মে ২০০০ তারিখে তা ফিরে পায়। ছবিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জনাব আসাদুজ্জামান ভূঞার নিকট মসজিদ হস্তান্তর করেন হাজী জমশেদ ভূঞা

The Ahmadis of Kodda demonstrated great patience and sacrifice during the anti-Ahmadiyya upsurge in the year 2000. They got their mosque back due to their perseverance.

কোড্ডা আহমদীদের সাহসিকতা ও ত্যাগের কারণে আজ সেখানে বাংলাদেশের আহমদীয়া শতবার্ষিকীর মূল স্মারক মসজিদ নির্মিত হয়েছে

৮ই মে ২০০০ সালে মসজিদের তালা খুলে মসজিদ হস্তান্তর করছেন হাজী জমশেদ ভূঞা
Haji Jamshed Bhuiyan handing over the mosque on May 8th, 2000

শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
A view of the audience at the inauguration of Centenary Mosque

কোড্ডা আহমদীয়া জামা'তের পূর্বেকার মসজিদ
The previous Ahmadiyya mosque at Kodda.

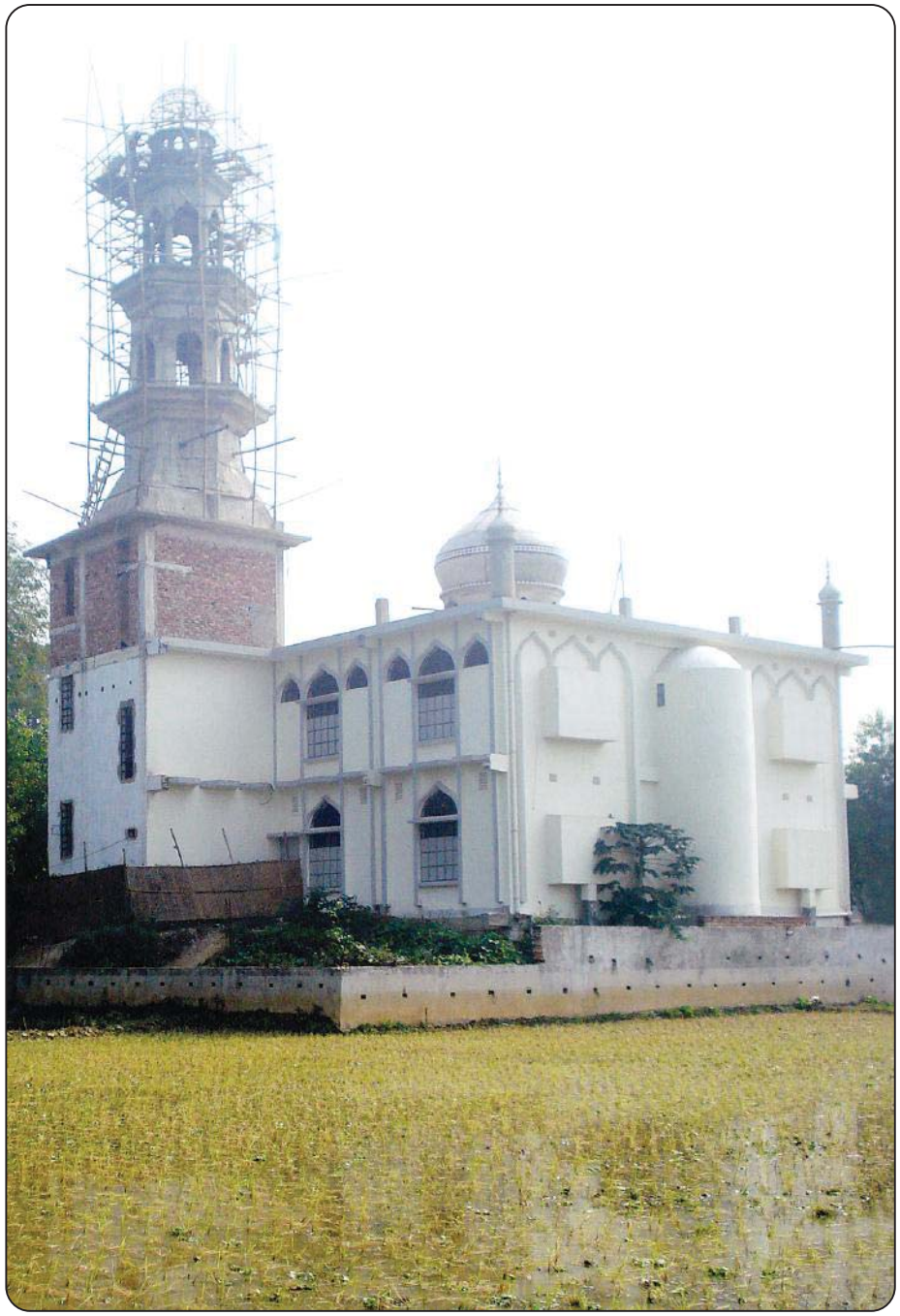

শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ, কোড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
Centenary Memorial Mosque, Kodda, Brahmanbaria

আহমদনগর আহমদীয়া মসজিদ, পঞ্চগড়
Ahmadnagar Ahmadiyya Mosque, Panchagarh

পঞ্চগড়ে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী আহমদনগর জামা'তের আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্স

Ahmadiyya Mosque and Mission Complex at Ahmadnagar, Panchagarh

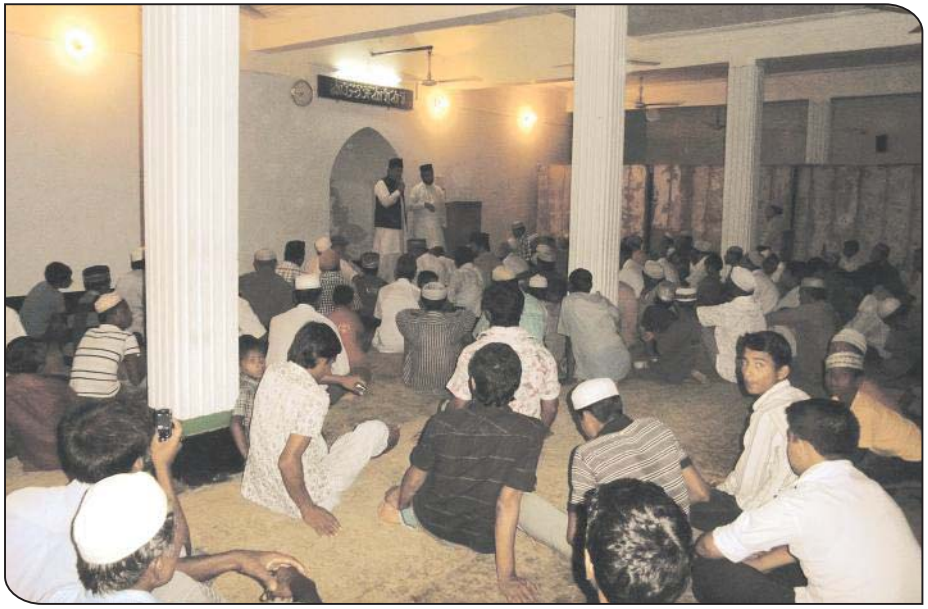

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাহাবী এবং হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.)সহ কেন্দ্রের অনেক বিশিষ্ট বুযুর্গদের পদধূলি পড়েছে এই গ্রামে

দারুল মোবারক আহমদীয়া মসজিদ, আহমদনগর, পঞ্চগড়
Ahmadiyya Mosque at Darul Mubarak, Ahmadnagar

সোনাচান্দি আহমদীয়া মসজিদ, শালসিঁড়ি
Shonachandi Ahmadiyya Mosque, Shalshiri

পঞ্চগড়ের ঐতিহ্যবাহী শালসিঁড়ি জামা'তের মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্স
Shalshiri Ahmadiyya Mosque and Mission, Panchagarh

বীরগঞ্জ আহমদীয়া মসজিদ, দিনাজপুর
Birganj Ahmadiyya Mosque, Dinajpur

রংপুর আহমদীয়া মসজিদ, মুন্সিপাড়া
Rangpur Ahmadiyya Mosque, Munshipara

হেলেঞ্চাকুড়ি আহমদীয়া মসজিদ, দিনাজপুর
Helenchakuri Ahmadiyya Mosque, Dinajpur

ডোহাণ্ডা আহমদীয়া মসজিদ, দিনাজপুর
Dohanda Ahmadiyya Mosque, Dinajpur

দিনাজপুর আহমদীয়া মসজিদ, বড় গুড়গোলা
Ahmadiyya Mosque Dinajpur, Boro Gurgola

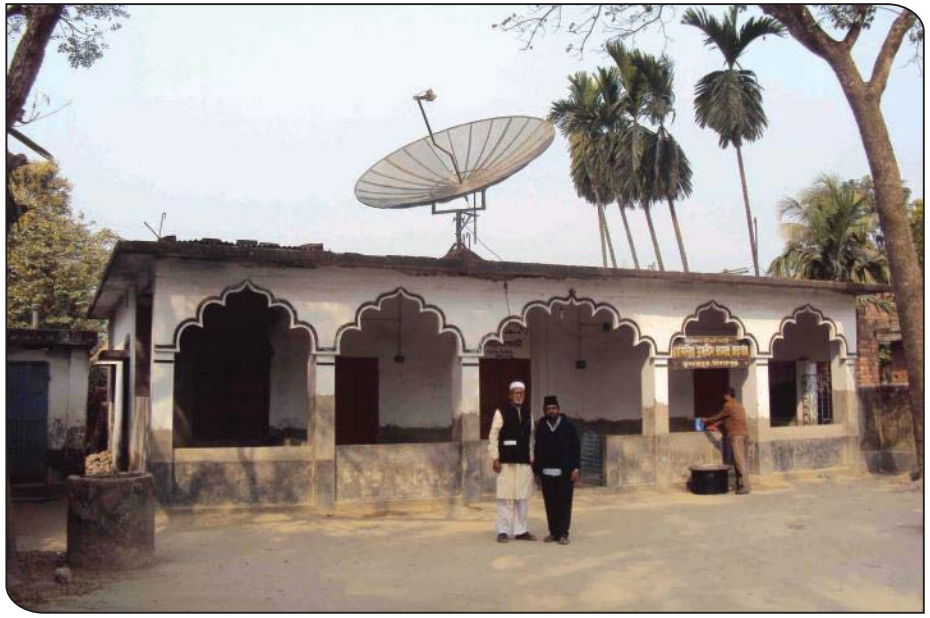

দিনাজপুরের ভাতগাঁও আহমদীয়া মসজিদ
Bhatgaon Ahmadiyya Mosque, Dinajpur

‘মসজিদে মাহমুদ’ আহমদীয়া মসজিদ রামপুর, দিনাজপুর
‘Masjid-e-Mahmud’ Ahmadiyya Mosque Rampur, Dinajpur

চড়াইখোলার আহমদীয়া মসজিদ

নীলফামারী জেলার অন্তর্গত চড়াইখোলা গ্রামের আহমদীয়া মসজিদের অতীত ও বর্তমান
Choraikhola Ahmadiyya Mosque past & present

হুযূর(আই.) একান্ত দয়াপরবশ হয়ে এই মসজিদের নাম রেখেছেন 'মসজিদে তাহের'
'Masjid-e-Taher' Ahmadiyya Mosque

গাইবান্ধার পূর্ব মদনপাড়ায় অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদে ‘মসজিদে সালাম’

‘Masjid-e-Salam’ Situated in Gaibandha District reconstructed in 2012. Inaugurated on 27.04.2012

গাইবান্ধার পূর্ব মদনপাড়ায় অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদের পূর্বেকার অবস্থা

মসজিদের বর্তমান রূপ। মোয়াল্লেম এহতেশামুল বশির সাহেব এর নির্মাণে নিরলস কাজ করেছেন

মসজিদ উদ্বোধনের পর জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে জনাব আব্দুল গাফ্‌ফার, জনাব শাহরিয়ার সাহেব ও অন্যান্যরা

গাইবান্ধার পূর্ব মদনপাড়ায় অবস্থিত নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদ 'মসজিদে সালাম'। ২৭শে এপ্রিল ২০১২ সালে ন্যাশনাল আমীর সাহেব এ মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন।

পূর্বেকার মাহিগঞ্জ আহমদীয়া মসজিদ, রংপুর
Mahiganj Ahmadiyya Mosque, Rangpur

স্থপতির অঙ্কিত আহমদীয়া মসজিদ মাহিগঞ্জ, রংপুর (বর্তমানে নির্মাণাধীন)
Architect's view of the upcoming Ahmadiyya Mosque at Mahiganj

শ্যামপুর আহমদীয়া মসজিদ, রংপুর
Shyampur Ahmadiyya Mosque, Rangpur

দিলালপুর, আহমদীয়া মসজিদ, রংপুর
Dilalpur Ahmadiyya Mosque under Rangpur District

আহমদীয়া মসজিদ পুরুলিয়া, নাটোর
Purulia Ahmadis with Maulana Feroz Alam in front of their Mosque

‘বাইতুল আওয়াল’ আহমদীয়া মসজিদ, রাজশাহী শহর
‘Baitul Awwal’ Ahmadiyya Mosque, Rajshahi City

আহমদীয়া মসজিদ মহারাজপুর, নাটোর
Ahmadiyya Mosque, Maharajpur, Natore

তাহেরাবাদ আহমদীয়া মসজিদ, বাঘা
Group photo in front of Taherabad Ahmadiyya Mosque, Bagha

নূরনগর আহমদীয়া মসজিদ, ইশ্বরদী
Ahmadiyya Mosque, Noornagar, Ishwardi

নাসেরাবাদ আহমদীয়া মসজিদ, কুষ্টিয়া
Naserabad Ahmadiyya Mosque, Kushtia

বটিয়াপাড়া আহমদীয়া মসজিদ, চুয়াডাঙ্গা
Recently inaugurated Botiapara Ahmadiyya Mosque, Chuadanga

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেবের স্মৃতি বিজড়িত আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্স, সেউজগাড়ী লেন, বগুড়া
Bogra Ahmadiyya Mosque Complex

নিউসোনাতলা আহমদীয়া মসজিদ, বগুড়া
New Sonatala Ahmadiyya Mosque, Bogra

বাগমারা আহমদীয়া মসজিদ, রাজশাহী
Syedpur-Baghmara Ahmadiyya Mosque, Rajshahi

মসজিদে হাশেম, নাটোর
Masjid-e-Hashem, Tebaria Ahmadiyya Mosque, Natore

মসজিদে হাশেম-এর অতীত ও বর্তমান
Masjid-e-Hashem Tebaria, Natore

আহমদীয়া মসজিদ তেবাড়িয়া, মসজিদে হাশেমের আগের চিত্র
'Masjid-e-Hashem' Tebaria : previous structure

১৯৯১-এ মসজিদে হাশেম নির্মাণকালে স্থানীয় আহমদীদের স্বেচ্ছাশ্রম
Volunteers working at the construction site of Masjid-e-Hashem, 1991

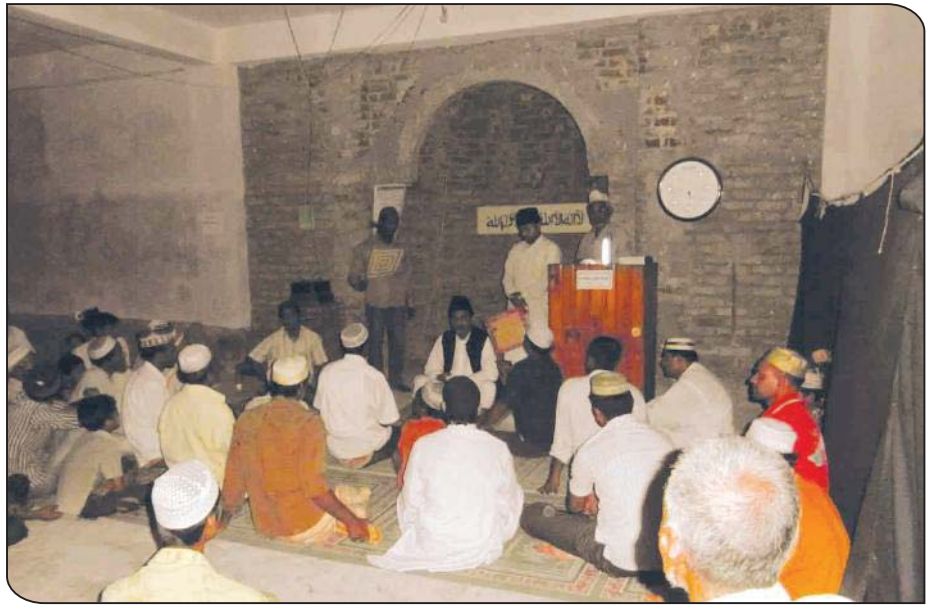

২০১২ সালে হুযুর(আই.)-এর বিশেষ প্রতিনিধি
জনাব সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব নাটোরের মসজিদ পরিদর্শন করেন

রাঙামাটির মাহিল্লায় আহমদীয়া মসজিদের অতীত ও বর্তমান

Past and present of Ahmadiyya Mosque & Mission at Mahilla, Rangamati

মাহিল্লার প্রথম মসজিদ নির্মাণের দৃশ্য। চট্টগ্রামের তৎকালীন আমীর জনাব নূরুদ্দীন আহমদ ও অন্যান্যরা
The structure of the first Mahilla Ahmadiyya Mosque

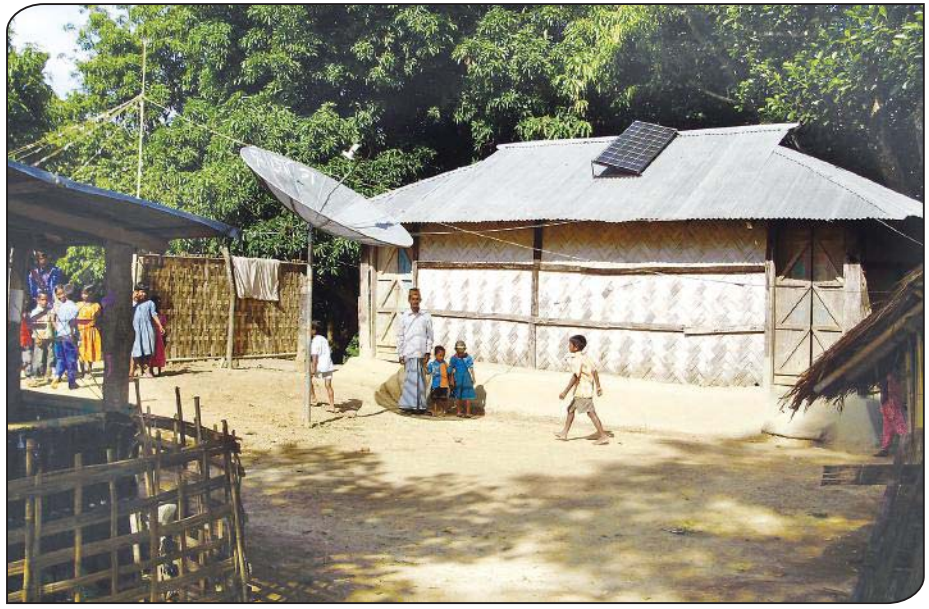

মসজিদ সংলগ্ন এমটিএ ডিশ ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা
MTA installation at Mahilla

মাহিল্লার আহমদীদের সাথে ন্যাশনাল আমীর সাহেব
Open air tarbiyyati discussion by National Amir Sb. at Mahilla

মাহিল্লার আহমদীদের মাঝে ন্যাশনাল আমীর সাহেব
National Amir Sb. with the locals of Mahilla

মাহিল্লার তিনজন নিষ্ঠাবান আহমদী
Three devout Ahmadis of Mahilla

মাহিল্লা আহমদীয়া মসজিদ, রাঙামাটি
Mahilla Ahmadiyya Mosque, Rangamati

প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রাম আহমদীয়া মসজিদ। চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র চকবাজারে অবস্থিত 'মসজিদ বায়তুল বাসেত'
Chittagong Ahmadiyya Mosque 'Masjid-e-Baitul Basit'

ষোলশহর আহমদীয়া মসজিদ, চট্টগ্রাম
Sholoshohor Ahmadiyya Mosque, Chittagong

আহমদীয়া মসজিদ, পতেঙ্গা হালকা
Potenga Halqa Ahmadiyya Mosque, Chittagong

‘বায়তুর রহমান’ আহমদীয়া মসজিদ, খুলনা
‘Baitur Rahman’ Ahmadiyya Mosque, Khulna

রঘুনাথপুর বাগ আহমদীয়া মসজিদের পূর্বের অবস্থা, ১৯৯০
The first Raghunathpur Bagh Ahmadiyya Mosque, 1990

রঘুনাথপুর বাগ আহমদীয়া মসজিদের বর্তমান অবস্থা, ২০১২
Present Raghunathpur Bagh Ahmadiyya Mosque, 2012

পুনর্নির্মাণের পর মসজিদ বায়তুস্ সালাম, সুন্দরবন, সাতক্ষীরা

Recently reconstructed Masjid-e-Baitus Salam, Sundarban Ahmadiyya Mosque, Shatkhira

‘মসজিদে বায়তুস সালাম’ সুন্দরবন আহমদীয়া মসজিদ অতীত ও বর্তমান

‘Masjid-e-Baitus Salam’ Sundarban Ahmadiyya Mosque

বায়তুস সালাম মসজিদের ঐতিহাসিক সাইন বোর্ড
The previous structure of Baitus Salam Mosque

পূর্বেকার মসজিদের উত্তর পূর্ব প্রান্ত থেকে তোলা ছবি
Baitus Salam: from the North-eastern corner

২০১২ সনে জনাব মাহমুদ শাহ্ সাহেব সুন্দরবন মসজিদে
Maulana Syed Mahmud Ahmad Shah Sb. visited Sundarban in 2012

কুষ্টিয়া আহমদীয়া মসজিদ
Courtpara Kushtia Ahmadiyya Mosque

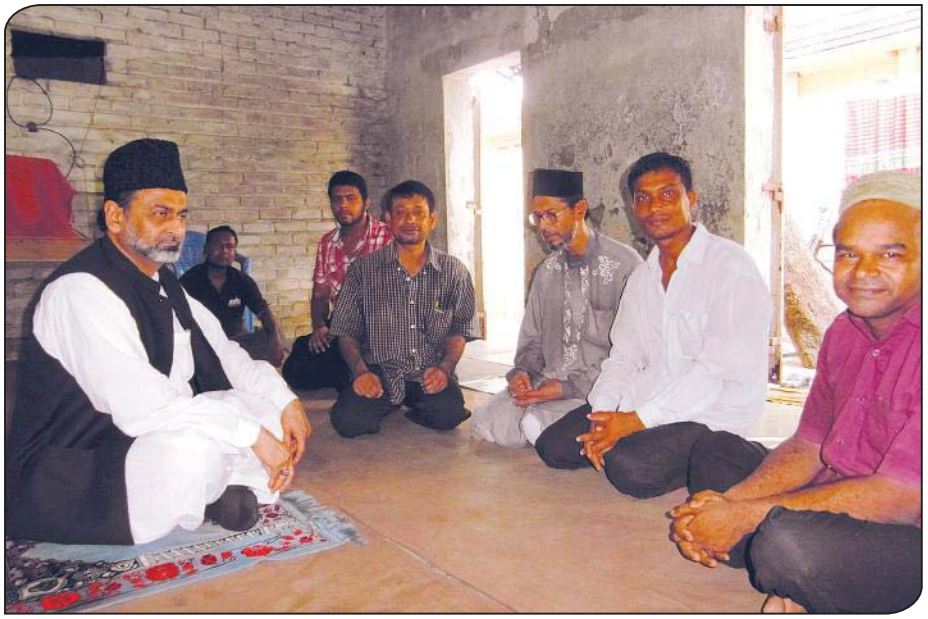

কুষ্টিয়া মসজিদে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি সৈয়দ মাহমুদ আহমেদ শাহ্ সাহেব
Huzur's representative Syed Mahmud Ahmad Shah Sb. in Kushtia Mosque

মসজিদ মোবারক, সন্তোষপুর, চুয়াডাঙ্গা
Shantoshpur Ahmadiyya Mosque, Masjid-e-Mubarak

শৈলমারী আহমদীয়া মসজিদ, চুয়াডাঙ্গা
In front of Shoilmari Ahmadiyya Mosque

সম্প্রতি উদ্বোধনকৃত ‘মসজিদে মাহ্‌মুদ’ যশোর আহমদীয়া মসজিদ

Recently built and inaugurated ‘Masjid-e-Mahmud’ Ahmadiyya Mosque Jessore. A part of the Centenary Projects

উথলী আহমদীয়া মসজিদ
'Masjid-e-Baitus Subhan Utholi Ahmadiyya Mosque

উথলী আহমদীয়া মসজিদের সামনে স্থানীয়দের মাঝে মিঞা তাহের আহমদ সাহেব, ১৯৬১
Hazrat Mirza Tahir Ahmed Sb. in front of Utholi Ahmadiyya Mosque, 1961

উথলী আহমদীয়া পূর্বেকার মসজিদ
The previous Utholi Ahmadiyya Mosque

উথলী নতুন আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
Inauguration Ceremony of the new Utholi Ahmadiyya Mosque

মসজিদ ‘বাইতুস সোবহান’ উথলী

‘Baitus Subhan’ Ahmadiyya Mosque, Utholi. This new construction was completed under Centenary projects.

আহমদীয়া মসজিদ, পটুয়াখালী
Ahmadiyya Mosque, Patuakhali

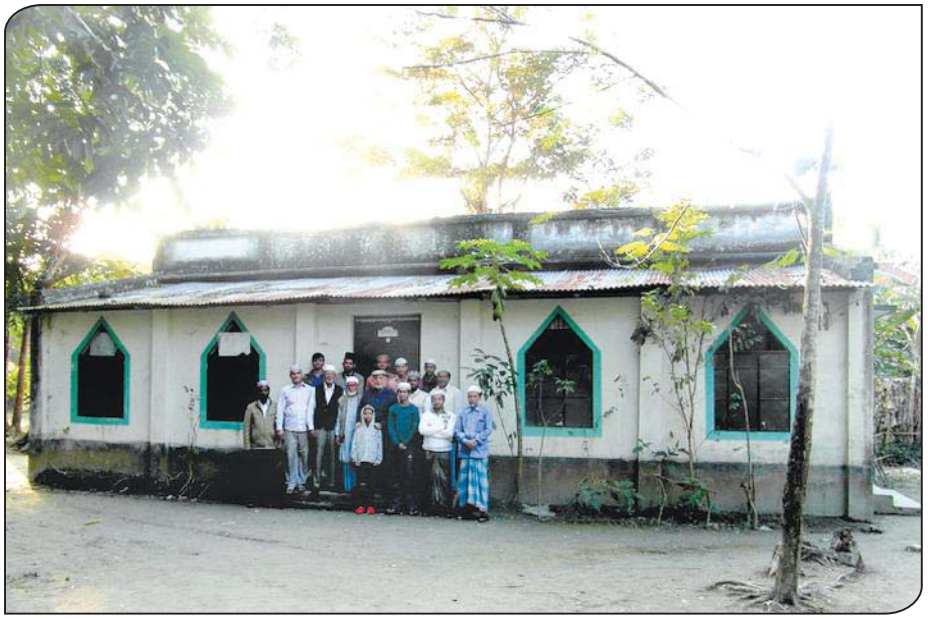

কৃষ্ণনগর আহমদীয়া মসজিদ
Krishnanagar Ahmadiyya Mosque

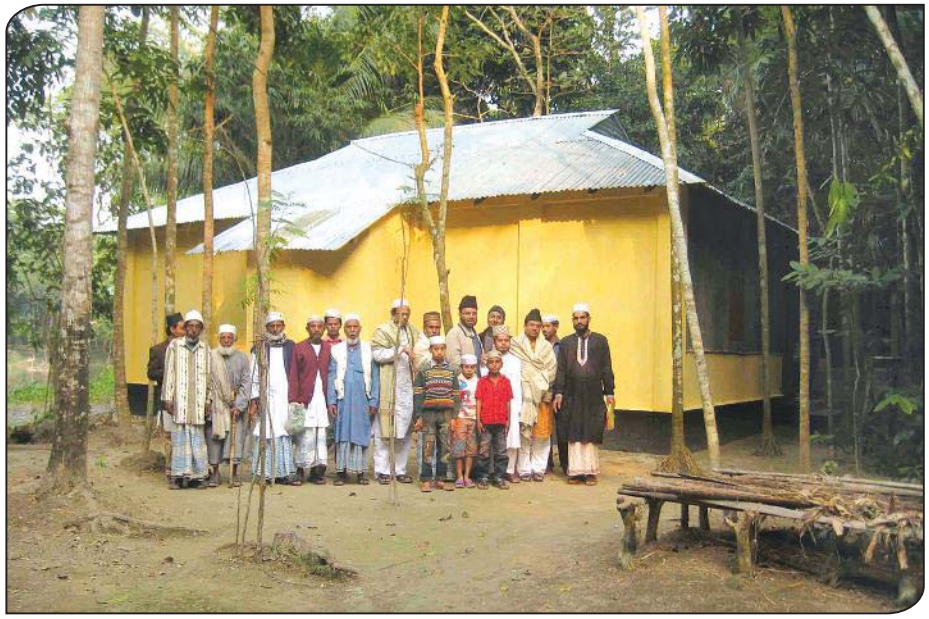

কাউনিয়া আহমদীয়া মসজিদ
Kaunia Ahmadiyya Mosque

আউলিয়াপুর আহমদীয়া মসজিদ
Auliapur Ahmadiyya Mosque

খাকদান আহমদীয়া মসজিদ, বরগুনা
Khakdan Ahmadiyya Mosque, Borguna

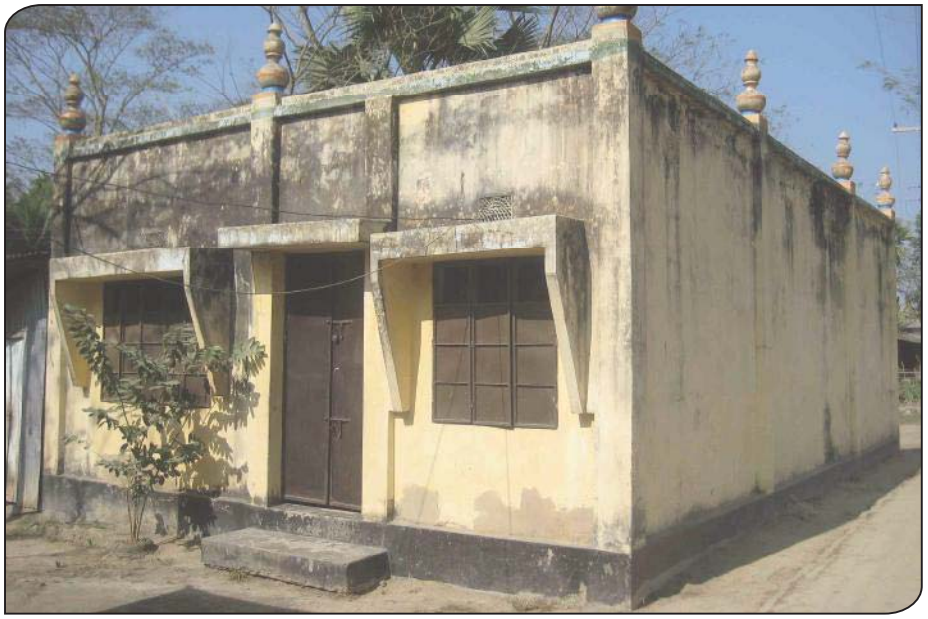

কুকুয়া আহমদীয়া মসজিদ, বরগুনা
Kukua Ahmadiyya Mosque, Borguna

বড় বাইশদীয়া পূর্বের আহমদীয়া মসজিদ এবং বর্তমানে নির্মাণাধীন পাকা মসজিদ ও মিশন
Boro Baishdia previous Mosque and the under construction Ahmadiyya Mosque

কুমিল্লায় নির্মাণাধীন আহ্‌মদীয়া মসজিদের বর্তমান অবস্থা
The under-construction Comilla Ahmadiyya Mosque

কুমিল্লায় নির্মাণাধীন আহ্‌মদীয়া মসজিদের নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়
The preliminary stage of the Comilla Mosque construction

ফাজিলপুর আহমদীয়া মসজিদ
Fazilpur Ahmadiyya Mosque

চরদুঃখিয়া আহমদীয়া মসজিদ, চাঁদপুর
Chardukhia Ahmadiyya Mosque, Chadpur

আহমদীয়া মসজিদ, নয়াপাড়া, জামালপুর
Jamalpur town Ahmadiyya Mosque

সোহাগী আহমদীয়া মসজিদ, ইশ্বরগঞ্জ
Shohagi Ahmadiyya Mosque, Ishwarganj, Mymensingh

বড়ভেটখালি হালকা আহমদীয়া মসজিদ, সুন্দরবন
Boro Bhetkhali Ahmadiyya Mosque, Sundarban

ঘড়িলাল আহমদীয়া মসজিদ, কয়রা, খুলনা
Gharilal Ahmadiyya Mosque, Koyra, Khulna

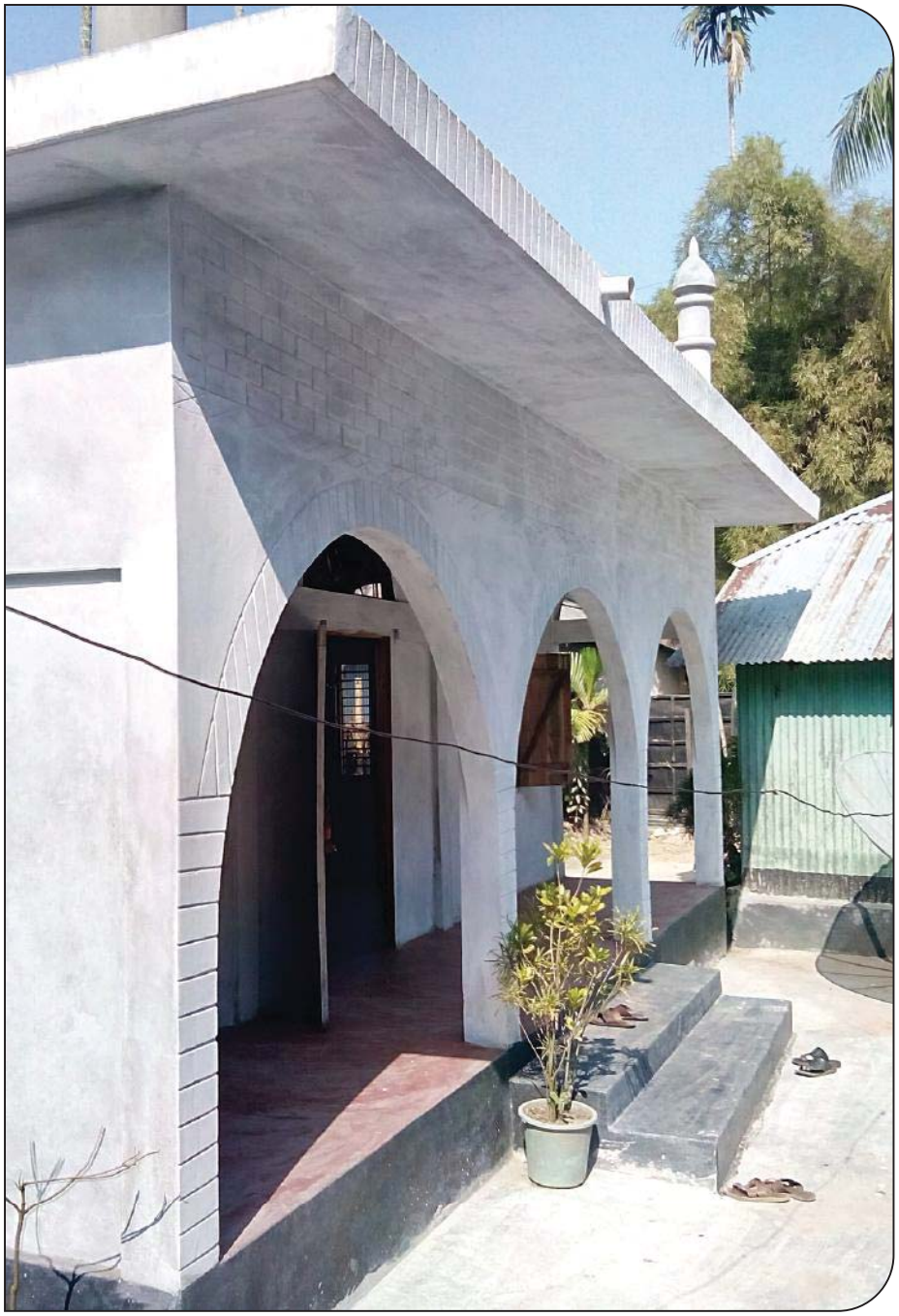

চাঁনপুর চা বাগান আহমদীয়া মসজিদ
Chanpur Tea Garden Ahmadiyya Mosque

চাঁনপুর চা বাগান আহমদীয়া মসজিদ পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় আনসারুল্লাহ্‌র টিম
Central Ansarullah team visiting the Chanpur Tea Garden Mosque

জামালপুর হবিগঞ্জ আহমদীয়া মসজিদ
Ahmadiyya Mosque at Jamalpur village, Habiganj

আহমদীয়া মসজিদ পাগুলিয়া, মৌলভীবাজার
Ahmadiyya Mosque at Pagulia, Moulvibazar

কটিয়াদী আহমদীয়া মসজিদ, কিশোরগঞ্জ
Kotiadi Ahmadiyya Mosque, Kishoreganj

বেতাল আহমদীয়া মসজিদ, কিশোরগঞ্জ
Betal Ahmadiyya Mosque, Kishoreganj

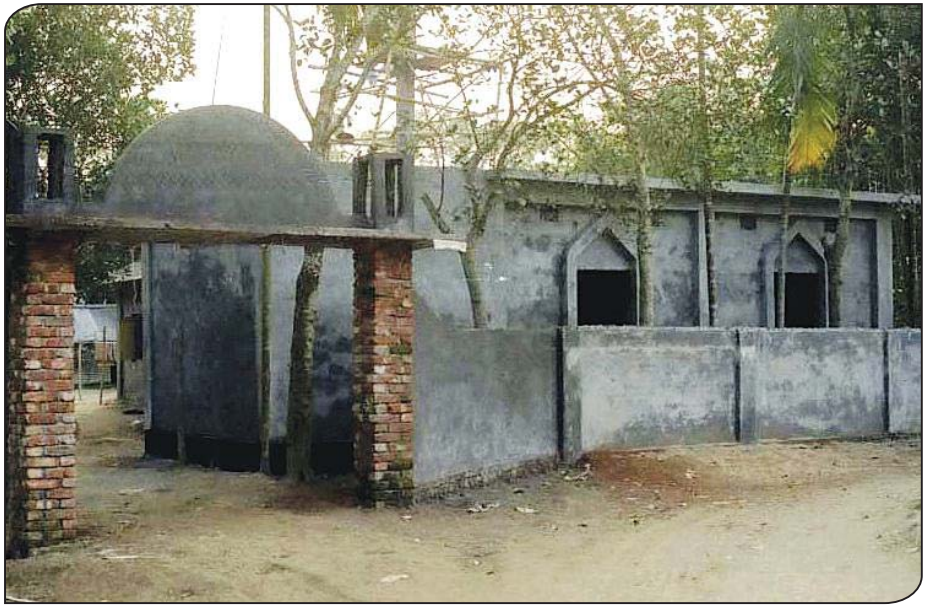

মসজিদে হাদী, বীরপাইকশা, কিশোরগঞ্জ
Masjid-e-Hadi Ahmadiyya Mosque, Birpaiksha, Kishoreganj

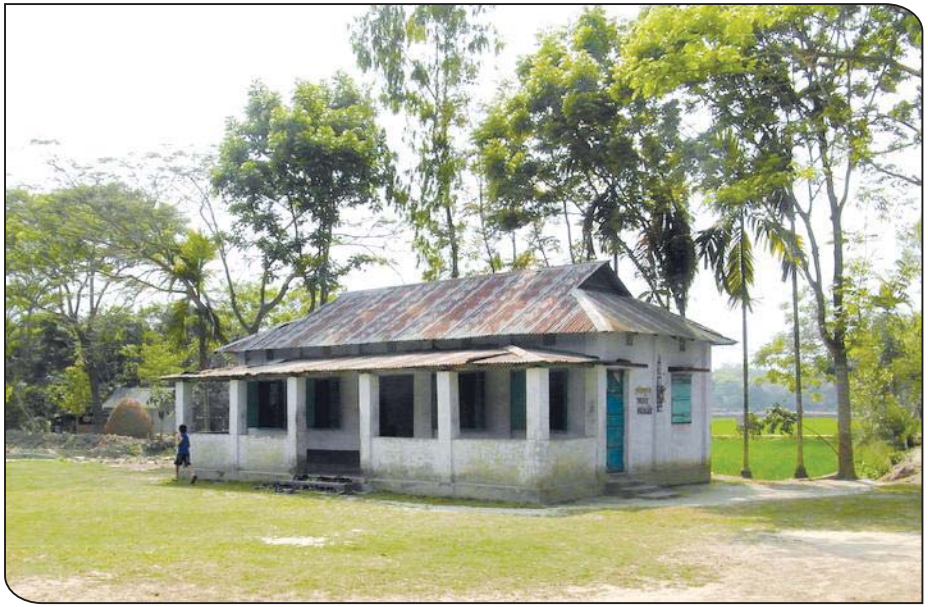

তেরগাতী আহমদীয়া মসজিদ, কিশোরগঞ্জ
Terogati Ahmadiyya Mosque, Kishoreganj

গালিমগাজী আহমদীয়া মসজিদ অতীত ও বর্তমান
Galimgazi Ahmadiyya Mosque past & present under Kishoreganj

মসজিদুল মাহদী, চরসিন্দুর আহমদীয়া মসজিদ
Masjidul Mahdi, Charshindur Ahmadiyya Mosque

বৈরাগীরচর হালকা আহমদীয়া মসজিদ, কটিয়াদী
Boiragirchar Ahmadiyya Mosque under Kotiadi Jama'at

মসজিদে নাসের রাংটিয়া, শেরপুর
Masjid-e-Naser, Rangtia, Sherpur

ময়মনসিংহ আহমদীয়া মসজিদ, আকুয়া
Mymensingh Ahmadiyya Mosque

মসজিদে মোবারাকা, হোসনাবাদ, জামালপুর
Masjid-e-Mubaraka, Hosnabad, Jamalpur

ছোনটিয়া আহমদীয়া মসজিদ, জামালপুর
Chhonotia Ahmadiyya Mosque, Jamalpur

ধানীখোলা আহমদীয়া মসজিদ, ময়মনসিংহ
Dhanikhola Ahmadiyya Mosque, Mymensingh

মীরগাং আহমদীয়া মসজিদ, সুন্দরবন
Mirgang Halqa Ahmadiyya mosque, Sundarban

বানিয়াজান আহমদীয়া মসজিদ
Baniajan Ahmadiyya mosque, Baniajan, Dhonbari

বিরুদ্ধবাদীদের দখলকৃত খড়মপুর আহমদীয়া মসজিদ, আখাউড়া
Khorompur Ahmadiyya mosque captured by the fanatics in 1987

হোসেনপুর আহমদীয়া মসজিদ, কিশোরগঞ্জ
Hussainpur Ahmadiyya mosque, Kishoreganj

আশুলিয়া আহমদীয়া মসজিদ, সাভার
Ashulia Mosque, Savar

কাফুরিয়া আহমদীয়া মসজিদ, নাটোর
Kafuria Mosque, Natore

আহমদীয়া মসজিদ বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
Bashudeb Mosque, Brahmanbaria

চাঁনতারা (অস্থায়ী) আহমদীয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল
Chantara Ahmadiyya Mosque, Tangail

ঝাউডাঙ্গা আহমদীয়া মসজিদ, সাতক্ষীরা
Jhaudanga Mosque, Shatkhira

বড় দরগাহ আহমদীয়া মসজিদ, রংপুর
Boro Dargah Mosque, Rangpur

বলিয়ানপুর আহমদীয়া মসজিদ, সাতক্ষীরা
Bolianpur Mosque, Shatkhira

বলারদিয়ার আহমদীয়া মসজিদ, সরিষাবাড়ী
Bolardiar Namaz Centre (demolished by the fanatics)

আহমদীয়া মসজিদ নাজিরপুরহাট
Nazirpurhat Ahmadiyya Mosque

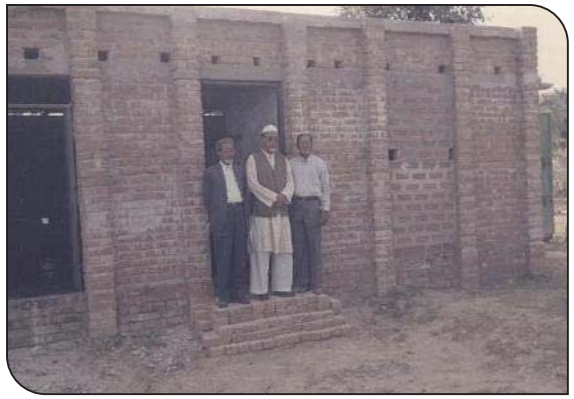

সর্পরাজপুর আহমদীয়া মসজিদ, যশোর
Sharporajpur Mosque, Jessore

ফুলবাড়িয়া আহমদীয়া মসজিদ, ময়মনসিংহ
Phulbaria Mosque, Mymensingh

ডাঙ্গাপাড়া, শালসিঁড়ি আহমদীয়া মসজিদ, পঞ্চগড়
Dangapara Mosque, Panchagarh

আহমদীয়া মসজিদ, খেলারডাঙ্গা, সাতক্ষীরা
Khelardanga Mosque, Shatkhira

জগদল আহমদীয়া মসজিদ, দিনাজপুর
Jogdol Mosque, Dinajpur

আহমদীয়া মসজিদ কমলাপুকুরী, বোদা
Kamlapukuri, Panchagarh

উত্তর ভবানীপুর আহমদীয়া মসজিদ, কুষ্টিয়া
Uttor Bhabanipur, Kushtia

কড়িতলা আহমদীয়া মসজিদ, বগুড়া
Koritola Mosque, Bogra

সেংগুয়া আহমদীয়া মসজিদ, সরিষাবাড়ী
Shengua Mosque, Sharishabari

Namaz Centres

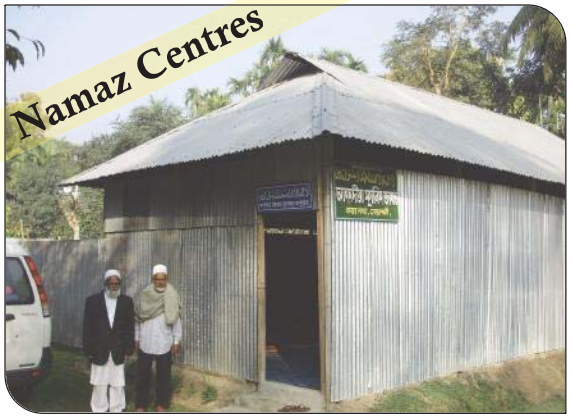

অম্বরনগর আহমদীয়া নামায কেন্দ্র, নোয়াখালী

নোয়াখালী অঞ্চলের অম্বরনগরে কয়েকজন আহমদীর সাথে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ

সিরাজগঞ্জ আহমদীয়া নামায কেন্দ্র

দিলালপুর হালকা আহমদীয়া মসজিদ, রংপুর জেলা

চর হাজীপুর নামায কেন্দ্র (পূর্বেকার ছবি), কিশোরগঞ্জ

তালশহর আহমদীয়া মসজিদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কয়রা নামাযঘর, মাদারগঞ্জ, জামালপুর

ইসলামগঞ্জ নামায কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ

উমেদপুর নামায কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ

সেলবরশ নামায কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ

সরাইল আহমদীয়া নামায কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

শিবপুর, শ্যামপুর আহমদীয়া জামা'ত, রংপুর

সৈয়দপুর আহমদীয়া নামায কেন্দ্র, নীলফামারী

আখাউড়া নামায কেন্দ্র

বড়হাট আহমদীয়া নামায কেন্দ্র, বীরগঞ্জ

বাশারুক নামায কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মিশন হাউস, বকশীবাজার, ঢাকা
Darut Tabligh Central Mission House, Dhaka

হেলেঞ্চাকুড়ি জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Helenchakuri Imam Quarters

বড় বাইশদিয়া জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Boro Baishdia Imam Quarters

রঘুনাথপুর বাগ জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস-এর সামনে স্থানীয় জলসা
Raghunathpur Imam Quarters

মাহিগঞ্জ জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Mahiganj Imam Quarters

যশোর জামা'তের ইমাম কোয়ার্টারস
Jessore Imam Quarters

পাগুলিয়া জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস, মৌলভীবাজার
Pagulia Imam Quarters, Maulvibazar

তেরগাতী জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Terogati Imam Quarters

বানিয়াজান জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Baniajan Imam Quarters

হোসনাবাদ জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Husnabad Imam Quarters

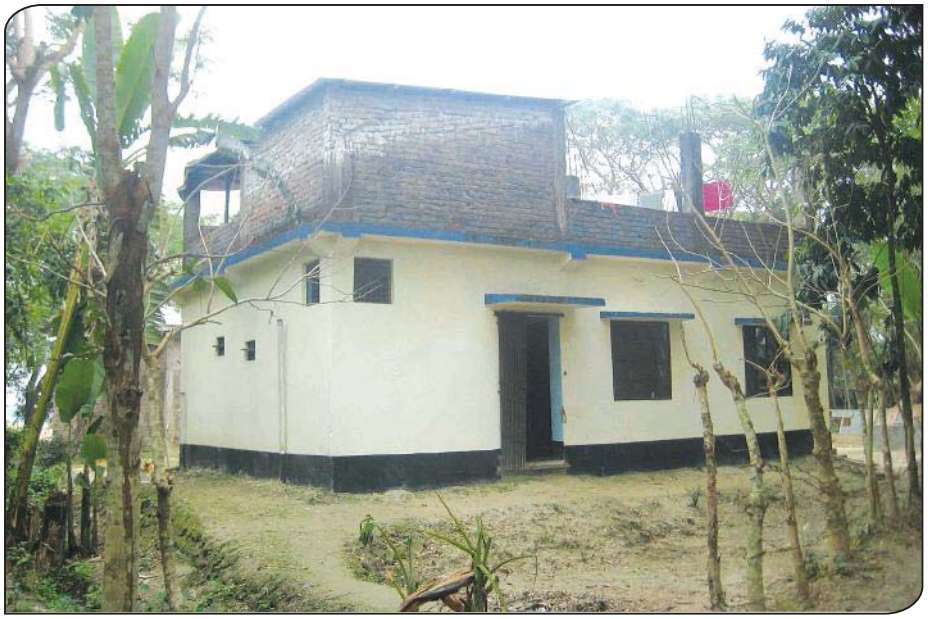

খাকদান জামা'তের ইমাম কোয়ার্টারস
Khakdan Imam Quarters

মাহিল্লা জামা'তের মোয়াল্লেম সাহেবের বাসগৃহ
Muallem Residence at Mahilla

শৈলমারী জামা'তের ইমাম কোয়ার্টারস
Shoilmari Imam Quarters

খুলনা জামা'তের মুরব্বী কোয়ার্টারস
Khulna Imam Quarters

ছোনটিয়া জামা'তের ইমাম কোয়ার্টারস
Chhonotia Imam Quarters

জামালপুর, হবিগঞ্জ জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Jamalpur, Habiganj Imam Quarters

উথলী জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Utholi Imam Quarters

সুন্দরবন জামা'তের মিশন ও গেষ্ট হাউস
Sundarban Mission & Guest House

মিরপুর জামা'তের মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস (মসজিদের বাঁ-পাশে)
Mirpur Imam Quarters (on the left)

রাজশাহী জামা'তের ইমাম কোয়ার্টারস
Rajshahi Imam Quarters

ঘাটুরা মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Ghatura Imam Quarters

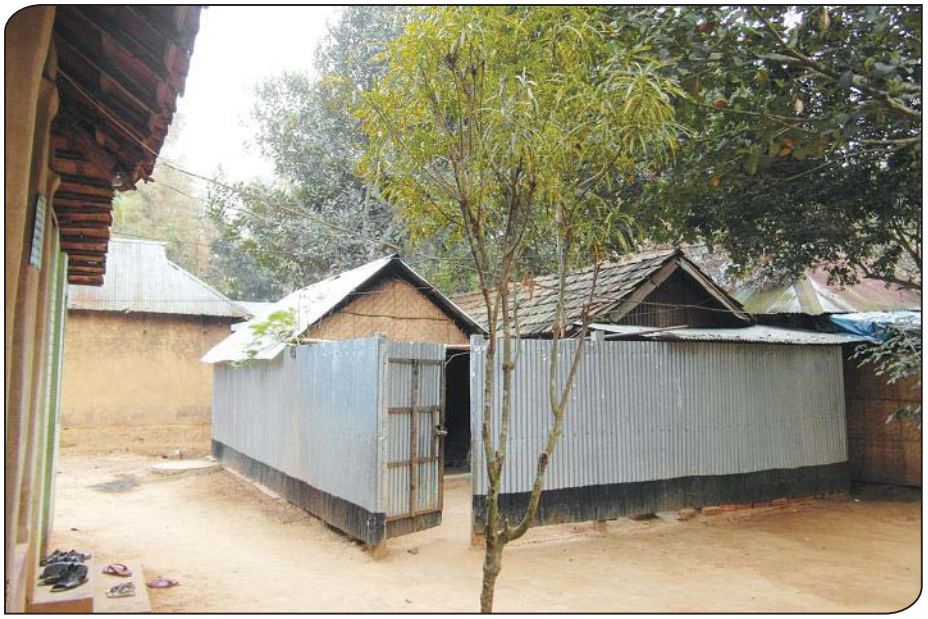

বিষ্ণুপুর মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Bishnupur Imam Quarters

কুকুয়া মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Kukua Imam Quarters

শালসিঁড়ি মোয়াল্লেম কোয়ার্টারস
Shalshiri Imam Quarters

স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

‘সেই ধন্য নরকূলে লোকে যারে নাহি ভুলে...’

সংগ্রহ ও সংকলন: মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে আহমদীয়াত প্রচার ও প্রসারে অনেক অনেক বুযুর্গ-মনীষীর অবদান রয়েছে। আমরা এদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ উপস্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছি। সময়, সুযোগ ও আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ জামা’তের আরো অনেক গুণী-বুযুর্গের স্মৃতিচারণ সম্ভব হয় নি বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

১. হযরত মওলানা আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ(রা.)

তাঁর কবরের ছবি

প্রথম বাঙালি আহমদী হযরত মওলানা আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ(রা.)। তাঁর পৈতৃক বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামে। তিনি ১৯০৪/ ১৯০৫ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় প্রবেশ করেন। জানা যায়, তিনি হযরত মোহসেন আউলিয়ার(রাহে.)-র বংশধর এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার আলেম ছিলেন। ১৯১১ বা ১৯১২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

২. হযরত রইস উদ্দিন খাঁ(রা.)

হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.) –এর কবরে সোয়ারত।

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার নাগেরগাঁও-এর সন্তান হযরত রইস উদ্দিন খাঁ(রা.)। তিনি ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়া জামা’তভুক্ত হন। ১৯২১ সালে মারা যান। নিজ বাড়ির প্রাঙ্গণে তাঁর মাজার অবস্থিত।

৩. সৈয়দা আজিজাতুন নেসা সাহেবা

কুলিয়ারচর থানার তাতারকান্দী গ্রামের এ মহীয়সী নারী সাহাবী হযরত রইসউদ্দিন খাঁ(রা.)-এর সহধর্মিণী। ১৯০৭ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর কাছে পত্রের মাধ্যমে বয়াত করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। চট্টগ্রামের মুরাদপুরে জামা’তের কবরস্থানে তিনি সমাহিত আছেন।

৪. এডভোকেট মুন্সি মোহাম্মদ দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব

আখাউড়ার অদূরে দেবগ্রামে তাঁর জন্মস্থান। তিনি ১৯০২ সালে লাহোর থেকে আনীত হেকিমী ঔষধের পার্সেলের সাথে হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর আবির্ভাবের বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হন। খাঁ সাহেব ১৯১৩ সালে বয়াত করেন এবং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথম ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জামা’তের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ১৯২৪ বা ১৯২৫ সালে মারা যান।

৫. মীর সেকান্দর আলী সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালে বয়াত করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইশায়াত সেক্রেটারি হিসেবে জামা’তের খেদমত করেছেন। প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব তাঁর সুযোগ্য পৌত্র। তিনি ১৯৩৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

৬. মৌলভী হায়দার আলী ভূঁইয়া সাহেব

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসুদেব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় প্রথম আমীর সাহেবের হাতে বয়াত করেন। কর্মজীবনে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লাকসাম, সিলেট, রংপুর প্রভৃতি স্থানে স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি পাঁচটি ভাষা জানতেন। পণ্ডিত শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুপরিচিতি ছিল। তিনি ১৯৪৯ সালে ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্শের উর রহমান সাহেব তাঁর সুযোগ্য পৌত্র ।

৭. মৌলভী সাফাতউল্লাহ সিকদার সাহেব

মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কাছে এসে ১৯১৩ সালে বয়াত করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীয়াত প্রচার ও প্রসারে প্রথম যুগে অনেক কাজ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাটাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

৮. আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব

১৮৯৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাসাইট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফি মতিউর রহমান সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি বয়াত করেন। তিনি কাদিয়ানে মোবাল্লেগ প্রশিক্ষণের পর বঙ্গদেশে বিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে আমরণ জামা’তের খেদমত করেছেন। তিনি ‘হাদীসুল মাহদী’ নামে অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ কাজের মূল্যায়নে তাঁকে আল্লামা উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ ইন্তেকাল করেছেন।

৯. হোসামউদ্দিন হায়দার সাহেব

হযরত মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে প্রথম দিকে উচ্চ শিক্ষিত বয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি একজন। কুমিল্লা শহরের মুন্সেফ বাড়ি তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ছিল। তিনি কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আহমদীয়া জামা’তের প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। ষাট দশকে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

১০. সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব

তিনি মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চীফ সেক্রেটারী, অর্থ সেক্রেটারী, ম্যানেজার, মোবাল্লেগ এবং ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এদেশে ১৯৩৮ সালে প্রথম গঠিত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ ছিলেন। ৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

১১. এডভোকেট দৌলত খান খাদেম সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া খড়মপুরের খাদেম বংশের সন্তান। তিনি জামা’তের বিভিন্ন পদে আজীবন কাজ করেছেন। ‘সেকালের তরুণ মুসলিম’ তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পাকিস্তান ভারত বিভক্তির পূর্বে কোলকাতা এবং পরে ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট ছিলেন।

১২. মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব

তিনি একজন প্রবীণ আহমদী ছিলেন। পুলিশ অফিসার হিসেবে যথেষ্ট সুনাম

অর্জন করেন এবং জামা'তের অনেক খেদমত করেছেন। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পাবনা জেলার অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গীয় প্রথম আমীর সাহেবের জামাতা তিনি।

১৩. মওলানা মোজাফ্ফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব

১৮৯৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ ও জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী(রা.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। The Review of Religions পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বসহ জামা'তের বিভিন্ন কাজ করে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন।

১৪. এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খড়মপুর গ্রামের খাদেম বংশের সন্তান। ১৯২৫ সাল থেকে প্রকাশিত মাসিক আহমদী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৭ সালে কোলকাতা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসেন। তিনি ত্রিশ দশকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের আমীর ছিলেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৫. মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব

১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৬ বছর কাদিয়ানে শিক্ষা লাভ করে প্রায় ৩৬ বছর সদর মুরব্বী হিসাবে জামা'তের সেবা করেছেন। ১১ মে ১৯৯০ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি বঙ্গীয় প্রথম আমীর সাহেবের সুযোগ্য সন্তান।

১৬. মৌলভী এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার সাহেব

তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার তাতারকান্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯১৯/২০ সালে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করেন। তিনি জামা'তের অনেক পুস্তক ও উর্দূ লেখা বঙ্গানুবাদ করেছেন। দীর্ঘদিন পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। মুরব্বী সিলসিলাহ মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ তাঁর সুযোগ্য সন্তান।

১৭. ডা. মোহাম্মদ নূর হোসেন সাহেব

১৮৯৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২২ সালে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি মুন্সিগঞ্জের রেকাবীবাজার জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৮. মৌলভী মোহাম্মদ আলী আকবর সাহেব

১৯১০ সালে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি জামা'তের জন্য জিন্দেগী ওয়াকফকারী ছিলেন। ২ অক্টোবর ১৯৬৮ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মরদেহ রাবওয়া নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রাহে.) তাঁর নামাযে জানাজা পড়ান এবং বেহেশতী মাকবেরায় দাফন করা হয়।

১৯. মওলানা মমতাজ আহমদ সাহেব

বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার বড়লেখার অধিবাসী। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম, সুবক্তা এবং ধর্মীয় লেখক ছিলেন। জামা'তের মোবাল্লেগ হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি কিছুকাল পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর পবিত্র কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ দীর্ঘদিন পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত হয়। সদর মুরুব্বী মওলানা ফারুক আহমদ সাহেব তাঁর সুযোগ্য পুত্র।

২০. এডভোকেট বদরউদ্দিন আহমদ সাহেব

তিনি ১৮৯৩ সালে রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ সালে বয়াত গ্রহণ করেন। রংপুর জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি রংপুর পৌরসভার প্রথম মুসলিম চেয়ারম্যান এবং একাধিকবার পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

২১. মৌলভী মীর আব্দুস সাত্তার সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইল নিবাসী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। একজন নেক মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। জামা'তের খেদমতে তাঁর অবদান স্মরণীয়। ১৯৮৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২২. মোহাম্মদ কফিলউদ্দিন সাহেব

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আহমদীপাড়া মসজিদে মোবারক নির্মাণে তিনি অন্যান্যদের সাথে জমি দান করেছেন। তিনি ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

২৩. আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী'র সুযোগ্য পুত্র চৌধুরী সাহেব। তিনি কাদিয়ানে লেখাপড়া করেন। নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের নাযেম আলাসহ জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ১৯১৪ সালে তাঁর জন্ম এবং ১৯৮৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২৪. ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব

নাটোরের চৌধুরী বংশের সন্তান। তিনি মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের নাযেমে আলা এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীরসহ জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯৩ সালে মৃত্যুবরণ

করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ।

২৫. নাজির আহমদ চৌধুরী সাহেব

প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের তবলীগে বয়াতকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৩১ সালে আব্দুল লতিফ সাহেবের মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি জামা'তের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পূর্বসূরীর ধারা বজায় রাখেন।

২৬. ময়মুনা বিবি সাহেবা

হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-কে স্বপ্নে দেখে তিনি ত্রিশ দশকে বয়াত করেন। তার স্বামী মৌলভী আব্দুল হাদী সাহেব স্ত্রী'র বয়াতের তিন বছর পর বয়াত করেছেন। তাঁরা সন্দ্বীপের অধিবাসী। তাঁদের সন্তান জাহিদ হোসেন মোক্তার ও ড. শফিউল আলম আতহার। ময়মুনা বিবি খুবই পরহেজগার মহিলা ছিলেন। তিনি ১৯৬০ সালে মারা যান।

২৭. মীর রফিক আলী সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল নিবাসী মীর সেকান্দর আলীর পুত্র মীর রফিক আলী সাহেব। চট্টগ্রামে সরকারি হাই স্কুলে শিক্ষকতাকালে ১৯৩৯ সালে তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে যান। দেশ বিভাগের কিছুদিন পূর্বে তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের শিক্ষক থাকাকালে মারা যান।

২৮. জিন্নাত আলী ভুঁইয়া সাহেব

তিনি ১৯২৪ সালে ১৯ বছর বয়সে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। বাড়ি ছিল চাঁদপুর জেলায়। তিনি ১৯৩৯ সাল থেকে দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২৯. মীর ওসমান আলী সাহেব

সরাইলের মীর সেকান্দর আলী সাহেবের ঘরে ১৮৯০ সালে জন্ম। তিনি বহুদিন সরাইল জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পোস্টমাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি মারা যান।

৩০. মীর হাবিব আলী সাহেব

সরাইলের মীর সেকান্দর আলী সাহেবের ঘরে ১৯১০ সালে জন্ম। তিনি একজন শিক্ষানুরাগী ছিলেন। চট্টগ্রাম জামা'তের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি মারা যান। তাঁর পরিবার আহমদীয়াতের সেবায় নিয়োজিত।

৩১. মৌলভী আহমদ আলী সাহেব

তিনি ১৯০৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তারুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)-এর হাতে বয়াত করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৭৪ সাল তারুয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করেছেন এবং ৩০ মার্চ ২০০৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

৩২. মির্যা আলী আখন্দ সাহেব

তিনি কিশোরগঞ্জ জেলায় ১৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। জামা'তের সেবায় লেখালেখি ও তবলীগে তাঁর অবদান অনন্য। তিনি ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩৩. মুসলিম বারী সাহেব

১৯০৭ সালে নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ভারত বিভক্তির পর তিনি চুয়াডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। ১৯৬২ সালে চুয়াডাঙ্গা শহরে প্রথম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এ জামা'তের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৮৮ সালের ২৭ মে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩৪. আবুল হোসেন সাহেব

১৮৯৯ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক ছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তিনি যুদ্ধে সেনাবাহিনীর একই ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। ১৯২১ সালে সাব-রেজিস্ট্রার পদে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ১৯৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৫. এডভোকেট আনিসুর রহমান সাহেব

তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুরে ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে তিনি বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে ঢাকার বকশীবাজারস্থ দারুত তবলীগের

ভূমি ক্রয়ে এবং বায়ান্নের মহান ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২৪ মে ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওসিয়ত নম্বর ৮৯২৯।

৩৬. আমেনা খাতুন সাহেবা

নারায়ণগঞ্জ জামা'তে প্রথম আহমদী ধর্মপ্রাণ মহিলা আমেনা খাতুন সাহেবা। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আজিমউদ্দীন। মাতা সাফুরুন্নেসা। তাঁর স্বামীর নাম কাজী জয়নাল আবেদীন। এ মহীয়সী নারী ১৯৩৬ সালে দুর্গারামপুর জামা'তের ফকির ইয়াকুব আলী সাহেবের তবলীগে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ এবং মৃত্যু ১৯৯১ সালে। তিনি নারায়ণগঞ্জ জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

৩৭. হামিদ হাসান খান সাহেব

দিনাজপুর জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের ফাইজাবাদ জেলার বিডিপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে দিনাজপুর শহরে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং সততার সাথে দীর্ঘদিন সরকারি চাকুরি করেছেন। তিনি বয়াত নেন ১৯৪২ সালে। তাঁর ওসীয়্যত নং ৯৯৭৩। ৯ জানুয়ারি ১৯৯২ সালে ইন্তেকাল করেন।

৩৮. মওলানা মুহিবুলল্লাহ সাহেব

১৯১২ সালে চাঁদপুর জেলার মৌলভী আব্দুল মান্নান সাহেবের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি বয়াত করেন। জামেয়া ইসলামীয়া, আমরোহা, মুরাদাবাদ, উত্তর প্রদেশ ভারতে তিনি শিক্ষা লাভ

করেন। তাঁর ওসীয়্যত নম্বর ৮৬৯২। সদর মুরুব্বী হিসেবে তিনি আজীবন জামা'তের সেবা করেছেন। তিনি খুব পরহেজগার মানুষ ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি আপন প্রভু সকাশে যাত্রা করেন। অস্ট্রেলিয়া জামা'তের মিশনারি ইনচার্জ ও ন্যাশনাল আমীর মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব তাঁর কীর্তিমান সন্তান ছিলেন।

৩৯. ভিজির আলী সাহেব

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শাহবাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি সত্তর ও আশির দশকের প্রায় প্রতি বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসা কমিটির সেক্রেটারি কিংবা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। নায়েব ন্যাশনাল আমীর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৪০. ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব

আহমীয়া জামা'তের বর্ষীয়ান বুযুর্গ ছিলেন মোল্লা সাহেব। তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্নভাবে জামা'তের সেবা করেছেন। ষাট দশক থেকে আমরণ পাক্ষিক আহমদীর প্রকাশক ছিলেন। তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সালানা জলসায় তিনি বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি গত ২১ জুলাই ২০০৯ তারিখে ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৪১. খন্দকার কামদার আলী সাহেব

আনুমানিক ১৯২১ সালে শাহবাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খন্দকার রাহাত আলী শাহ্ ও আমেনা খন্দকার-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র জীবনে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি ২৪ জুন ২০০১ তারিখে মারা যান।

৪২. শামসুর রহমান সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সাহেবের পুত্র তিনি। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার কায়েদ ছিলেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৭ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার যয়ীমে আলা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে নায়েব ন্যাশনাল আমীর হিসেবে কাজ করেছেন। ২৪ জুলাই ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন।

৪৩. আলী আকবর খান সাহেব

নোয়াখালী জেলার বর্তমান সোনাইমুড়ী থানার নোয়াগাঁও গ্রামে তিনি ১৯২২ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জিন্নাত আলী পণ্ডিত ও মাতা সুরতুন্নেসা। তিনি জলপাইগুড়িতে কর্মরত অবস্থায় ১৯৪৫ সালে বয়াত করেন। তিনি দীর্ঘদিন আমরণ চট্টগ্রাম জামা'তের সেক্রেটারি মাল ছিলেন। ৩ জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওসিয়ত নম্বর ১৩২২৬।

৪৪. মোহাম্মদ লকিয়ত উল্লাহ্ সাহেব

তিনি ২০মে ১৯২৬ সালে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ নূর মিয়া। তিনি ১৯৪৫ সালের জুন মাসে মোবাল্লেগ মওলানা সেলিম সাহেবের হাতে বয়াত করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ ছিলেন। তাঁর ওসিয়ত নম্বর ১৫০৫০। তিনি ২০০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেন।

৪৫. শামসুর রহমান সাহেব

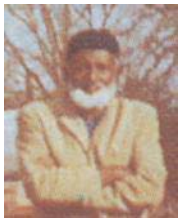

সুন্দরবন জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট তিনি। ১৯৬১ সালে রাবওয়া জলসায় যান এবং জলসার পর বয়াত করে জামা'তভুক্ত হন। তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৮৭ সাল সুন্দরবন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। নিজ এলাকায় সমাজ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তাই পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'তমগায়ে খেদমত' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। এ বুযুর্গ ১৯৮৭ সালে মারা যান।

৪৬. শেখ জোনাব আলী সাহেব

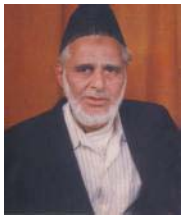

১৯৩০ সালে জন্ম এবং ১৯৬৩ সালে আহমদীয়া জামা'তে বয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৬৪-১৯৬৬ সালে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুন্দরবনের কায়েদ ছিলেন এবং ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে সুন্দরবন জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১১ জানুয়ারি ২০০৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৪৭. আবু তাহের খতিব উদ্দীন আহমদ সাহেব

আনুমানিক ১৯৩৩ সালে বীরগঞ্জ, দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করেন। বীরগঞ্জ জামা'তের জন্য তিনি জমি দান করেন। রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৪৮. মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শহরতলী ঘাটুরা গ্রামে ২৩ মার্চ ১৯২৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে বৃটিশ সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ঘাটুরা মজলিসের কায়েদ ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)-র তাহরীকে তিনি ১৯৫২ সালে মোয়াল্লেম হিসেবে জীবন উৎসর্গ করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তে সেবা করেছেন। তিনি বড়-বড় বিরুদ্ধবাদী মওলানাদের সাথে অনেক বাহাস করেছেন। ৩০ আগস্ট ১৯৮৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত 'নযমুল মাহদী' পুস্তির নযমগুলি বাঙালির মুখে-মুখে ফেরে।

৪৯. ফকির ইয়াকুব আলী সাহেব

১৯১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার দুর্গারামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী সেকান্দর আলী।

১৯৪০ সালে তিনি বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি দাঈ-ইলাল্লাহর কাজে আজীবন ফানাফিল্লাহ ছিলেন। শাহবাজপুর, চরসিন্দুর, নারায়ণগঞ্জ, মাহীগঞ্জ এবং তেজগাঁও জামা'ত প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনন্য। ১১ নভেম্বর ১৯৮৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫০. আজিজুর রহমান চৌধুরী সাহেব

তিনি ১৯০৬ সালে হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জুয়াদুল্লাহ। ১৯৪৩ সালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)-এর হাতে বয়াত করেন। তাঁর তবলীগে হবিগঞ্জের জামালপুরের তাঁর নিকটাত্মীয়রা বয়াত করেন। ফলে জামালপুর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি জামালপুর ও চট্টগ্রামের যোলশহরে মসজিদের জন্য জমি দান করেছেন। ৯ আগস্ট ১৯৮৬ সালে তিনি চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন।

৫১. শহীদুর রহমান সাহেব

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদী পাড়ায় ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল হক সাহেব। তিনি জন্মসূত্রে আহমদী হওয়ার কারণে শৈশব থেকে জামা'তী তালীম তরবিয়ত লাভ করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজীবন জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের কায়েদ, ঢাকা মজলিসের কায়েদ, মজলিসে আনসারুল্লাহ ঢাকার যয়ীমে আলা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১২ই জুন ২০০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মওলানা বশীরুর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ।

৫২. এ.কে.এম. রেজাউল করীম সাহেব

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব বাজার থানায় ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে বয়াত করে আহমদী হন। আজীবন জামা'তের খেদমত করেছেন। সর্বশেষে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সেক্রেটারি উমুরে আমা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে এবং সাহসিকতার সাথে জামা'তের সেবা করেছেন। তিনি ১ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৩. চৌধুরী হাকিমুদ্দীন সাহেব

ডোহাড়া ও বীরগঞ্জ অঞ্চলের নিষ্ঠাবান আহমদী সেবক তিনি। তিনি আজীবন তবলীগ করেছেন।
জামা'তের বিভিন্নমুখী নীরব সেবা করেছেন।

প্রফেসর আব্দুল জুব্বার, আবু বকর আকন্দ, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন ও মোহাম্মদ ইব্রাহীম হোসাইন। [২৬ আগস্ট ১৯৮৭ খেদমতে খাল্‌ক (টাঙ্গাইলে ত্রাণ বিতরণ) কাজে গিয়ে ১৮ অক্টোবর ১৯৮৭ পর্যন্ত ৫৬ দিন কারাবাস]

১৯৯২ সালে বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহে.) সৌদি বাদশাহ ফয়সাল, ভুট্টো ও জিয়াউল হক-এর ৩টি সিদ্ধান্ত ও তাদের পরিণতি তুলে ধরে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে সর্তক করে বলেছিলেন,

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯২ এ প্রদত্ত খুতবা

“ সুতরাং যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন যে, তিনি তিনকে চার করতে চান, অর্থাৎ এই অর্থে তিনি স্বাধীন, তাকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না, কিন্তু মনে রাখবেন যে, খোদার নিয়তিকে কেউ রদ্ করতে পারবে না। আপনি যা চান তাই করুন; খোদার নিয়তি অবশ্যি আপনার পশ্চাদ্ধাবন করবেই; আপনার বিচার না করে ক্ষান্ত হবে না। ইহা একটি বিনীত পরামর্শ মাত্র। ইহা এই অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী নয় যে, খোদা আমাকে নির্দিষ্টভাবে আপনার সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি যে, আমি এই তিনটি ঘটনার আলোকে নিঃসন্দেহে এমন একটি অকাট্য ফলাফলে উপনীত হয়েছি যে, আপনাকে অনেক ইস্তেগ্‌ফার ও তওবা করা উচিত। আপনি নিজ দেশকে এমন বিপদাবলীর দিকে ঠেলে দিবেন না যেসব বিপদাবলী এইরূপ নির্যাতন করার পর পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাকে তৌফীক দান করুন এবং বাংলাদেশের গরীব মুসলমানদের সহায় হউন। ”

বাংলার কৃতী সন্তান

রত্নগর্ভা বাংলার অনেক গুণীজন বহির্বিশ্বে ইসলামের সেবা করার অনন্য সুযোগ পেয়েছেন। এখানে তাদের কয়েকজনের উল্লেখ করা হল।

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

তিনি ১৯০৯ সালে কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল(রা.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তিনি ১৯২০ - ১৯২২ লণ্ডনে এবং ১৯২২ - ১২৪ সালে জার্মানিতে প্রথম মিশনারী হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৪০ - ১৯৪৯ সাল বঙ্গীয় ও পূর্ব পাকিস্তান জামা'তের আমীর ছিলেন। ১ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুফি মতিউর রহমান সাহেব

১৯১৬ সালে বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ সুদীর্ঘ বিশ বছর আমেরিকায় জামা'তের মিশনারি হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ৫৬ বছর বয়সে ৩০ অক্টোবর ১৯৫৫ সালে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন।

আব্দুর রহমান খাঁ বাঙালি সাহেব

তিনি ১৯২৮ বা ১৯২৯ সালে বয়াত করেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত তিনি

মাসিক/পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক ছিলেন। কাদিয়ান ও রাবওয়ার তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমেরিকার মিশনারি ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭২ সালের ১৬ মে অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন।

মওলানা আনিসুর রহমান সাহেব

১৯৭০ সাল থেকে পাকিস্তানের কয়েকটি স্থানে এবং ১৯৭৭ সাল থেকে কয়েক বছর যুক্তরাজ্যে এবং পরে ১৯৮৭ সাল থেকে খুলনায় জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। ১৯৮৯ সালের ২০ মার্চ তিনি ইন্তেকাল করেন।

মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব

তিনি অস্ট্রেলিয়ার মিশনারি ইনচার্জ ও ন্যাশনাল আমীর ছিলেন। খিলাফতের সান্নিধ্যে কেন্দ্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দীর্ঘদিন নিয়োজিত থাকার পর ১৯৯০ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। ২৩ এপ্রিল ২০১৪ খ্রি. তার মৃত্যুতে হুযূর(আই.) ২৫ এপ্রিল ২০১৪ খ্রি. খুতবায় তাঁর প্রশংসা ও স্মৃতিচারণ করেছেন।

এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব

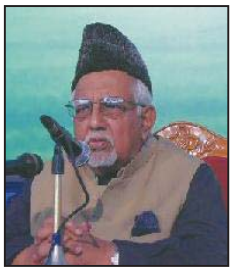

বাংলাদেশের বাইরে থেকেও জন্মভূমির প্রতি তাঁর টান এতটুকুও ম্লান হয়নি। তিনি আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের সুযোগ্য পুত্র। খিলাফতের পক্ষ থেকে দোয়া ও সমর্থন তাঁকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর লেখা ও উপস্থাপনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাদৃত।

মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব

বর্তমানে লণ্ডনে কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত এবং আযান দেয়ার মাধ্যমে তিনি সারা বিশ্বে সুপরিচিত। খিলাফতের সান্নিধ্য লাভ করে তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক বড় সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন।

প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব

কাদিয়ানে লেখাপড়া করেন। 'নুসরত জাহান' স্কীমের অধীনে জীবন উৎসর্গ করে আফ্রিকার ঘানায় তিনি আহমদীয়া স্কুলে কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন।

মৌলভী আহমদ তারেক মোবাশ্বের সাহেব

বর্তমানে লন্ডনে কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কে কর্মরত। আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেবের পুত্র তিনি। কেন্দ্রে মূল্যবান নীরব সেবা দানে তিনি সুযোগ পাচ্ছেন।

শাহেদ আহমদ সাহেব

জামা'তের নিষ্ঠাবান সেবক শাহেদ আহমদ সাহেব। তিনি ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত সৌদী আরবের ন্যাশনাল আমীর হিসেবে সেবা করে বহির্বিশ্বে খাঁটি ইসলাম প্রচারে অবদান রেখেছেন।

ডা. মুহাম্মদ সেলিম খান

আফ্রিকার কঙ্গোতে জামা'তের আর্ত-মানবতার সেবায় তিনি কয়েক বছর কাজ করেছেন।

জাহাঙ্গীর মোর্শেদ আলম সাহেব

তিনি বর্তমানে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অস্ট্রিয়া হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

শাহেদ আহমদ সাহেব হুযূর(আই.)-এর সান্নিধ্যে
Janab Shahed Ahmad Sb. met Huzur Aqdas(aba)

ইউরোপিয়ান আহমদীদের সাথে শামসুর রহমান সাহেব ও অন্যান্যরা
Bangladeshi entourage with European Ahmadis at UK Jalsa 1985

১৯৭২/১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত তালীম তরবিয়তী ক্লাসে বুযুর্গদের সাথে অংশগ্রহণকারীদের স্মরণীয় ছবি
1972/1973 Tarbiyyati Class

জলসা সালানা যুক্তরাজ্যে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ
Participants of the Jalsa Salana UK

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়ার একক ঐশী খলীফার হাতে আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান
International Bai'at (Initiation Ceremony) at Jalsa Salana UK

আমাদের ভবিষ্যৎ

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) বলেছেন :

... “খোদা তা'লা আমাকে বারবার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আমাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করবেন, আর মানুষের হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসা গেঁথে দিবেন। আমার জামা'তকে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত করে দিবেন আর সকল দলের বিপক্ষে আমার জামা'তকে বিজয় দান করবেন। আমার জামা'তের সদস্যগণ জ্ঞান ও তত্ত্বে এমন উৎকর্ষ লাভ করবে, যার মাধ্যমে তারা তাদের সত্যের জ্যোতি, দলিল-প্রমাণ এবং নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলকে নির্বাক করে দিবে। সকল জাতি এ ঝরনাধারা থেকে সুধা পান করবে। আর এই জামা'ত প্রবলবেগে বৃদ্ধি পাবে এবং সম্প্রসারিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, অনেক বিপদাপদও দেখা দিবে কিন্তু খোদা এ সবকিছু মধ্যখান থেকে অপসারণ করে দিবেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাকে আশিসের পর আশিস দান করব এমনকি বাদশাহগণ তোমার বস্ত্র থেকে আশিস অন্বেষণ করবে।”

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

২২৬ পৃষ্ঠার পর

৫৪. এডভোকেট আউসাফ আলী সাহেব

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিমরাইলকান্দীর অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম আমেলার তিনি জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আজীবন জামা'তের সেবা করেছেন। সেকালে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে বয়াত করার প্রেক্ষিতে যারা মোখালেফাতের সম্মুখীন হয়েছেন তা নিরাময়ে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি দশের দশকে এল.এল.বি. পাশ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারে যোগ দেন। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলমান উকিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ক'জন।

৫৫. সাবের আলী চৌধুরী সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোড়াইলের অধিবাসী ছিলেন। ১৯১৩ সালে জামা'ত গঠনের পর জামা'তের প্রেসিডেন্ট বড় মাওলানা সাহেবের নির্দেশে তিনি ১৯১৪ সালে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) জাহির হবার বিজ্ঞাপন রচনা করে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় লেখা-লেখিতে তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি জামা'তের পুস্তক উর্দূ থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টের কর্মচারী ছিলেন।

৫৬. হাজী মৌলভী মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব

গাজীপুরের এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হাজী মৌলভী মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব। তিনি গাজীপুর জামে' মসজিদের ইমাম ছিলেন। ১৯৭৮ সালে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। জামা'তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর আদর্শগত শিক্ষায় ছয় ছেলে ও তিন মেয়ে জামা'তের সেবায় একান্তভাবে জড়িত। ১২ জানুয়ারী ১৯৮৮ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৫৭. কাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব

ঢাকার লালবাগ এলাকার আমলীগোলার স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন কাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব। তিনি ১৯১৮ সালের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বয়াত করেন। ঢাকা জামা'তের গোড়াপত্তনে তাঁর অবদান অনন্য। তিনি ১৯২৪ সাল থেকে কয়েক বছর ঢাকা জামা'তের ইমাম বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আজীবন জামা'তের সেবা করেছেন। কর্মজীবনে সরকারী ডাক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

৫৮. হুরুননেছা বেগম সাহেবা

তিনি এ দেশে লাজনা ইমাইল্লাহর সদর হিসেবে দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন। ধর্মীয় বিষয়ে লেখা-লেখিতে তাঁর দক্ষতা ছিল। পাক্ষিক আহমদীতে তাঁর অনেক মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমলীগোলা এলাকায় নিজ পরিবার ছাড়াও আহমদী ও অ-আহমদী অনেক ছেলেমেয়েকে তিনি পবিত্র কুরআন নাযেরা পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। এ ধর্মপ্রাণ মহিলা ১৯৯৯ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্বামীর নাম কাজী আব্দুস সাঈদ সাহেব।

৫৯. মকবুল আহমদ খান সাহেব

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচঙ্গ গ্রামে ২২ মার্চ ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুর রহিম খান। ১৯৪৪ সালে তিনি কাদিয়ানে বয়াত করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি ঢাকা জামা'তের আমীরের দায়িত্বে নিযুক্ত হন এবং ১৯৮২ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। লেখা ও বক্তৃতায় তাঁর অবদান ছিল অনন্য। নব্বই দশকে তিনি পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রচিত 'বারাকাতুদ দোয়া' পুস্তকটি তাঁর বঙ্গানুবাদে প্রকাশিত হয়। তিনি ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

৬০. আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব

আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর জামা'তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ক'বছর পাক্ষিক আহমদী প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন। এক তবলীগ পাগল ব্যক্তি ছিলেন। তবলীগের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত 'মহাসুসংবাদ' গ্রন্থটি তাঁর রচিত। তিনি ৭৬ বছর বয়সে ১৬ জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৬১. মুন্সী দিয়ান উদ্দীন আহমদ সাহেব

তাঁর জন্ম স্থান তারুয়া গ্রামে। তিনি ১৯১৬ সালে বয়াত করার পর সে বছরই তারুয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার ইমাম বা প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন এবং তারুয়া জামা'তের কর্নধারের দায়িত্ব ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত পালন করেন। লেখা-লেখিতে তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর লেখা তৎকালীন আহমদীয়া বুলেটিন ও মাসিক আহমদীতে প্রকাশিত হয়। তিনি ও তাঁর স্ত্রী তাহেরুন নেসাসহ কয়েক জনের ওয়াকফকৃত জমিতে জামা'তের মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মুন্সী দিয়ান উদ্দীন সাহেব ১৯৩৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

৬২. মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ সাহেব

পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর জেলায়। কোলকাতায় লেখাপড়া করে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২৫ সালে মাসিক আহমদী প্রকাশনার শুরুতে তিনি ম্যানেজার ছিলেন। জামা'তের অনেক পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ে কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেছেন। তাঁর রচিত 'খাতামান নাবীঈন' একটি অমূল্য পুস্তক।

৬৩. সুফি সকিম উদ্দীন আহমদ সাহেব

সুন্দরবন এলাকার প্রথম আহমদী তিনি। ১৯৫৭ সালে তিনি বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। আহমদী হবার পর প্রচণ্ড মোখালেফাত শুরু হয়। বিরুদ্ধবাদী মোল্লাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাঝে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু তিনি একাই ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা প্রদর্শনে জয়ী হন। তাঁর মোখালেফাতের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি খাকদানে অনারারী মোয়াল্লেম হিসেবে কাজ করেছেন এবং সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান রয়েছে। এ বুযুর্গ ৯৬ বছর বয়সে ২৫ নভেম্বর ১৯৮৫ সালে নিজ বাড়ি ভেটখালীতে ইন্তেকাল করেন।

৬৪. আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব

তিনি জামা'তের কাজে নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন। বয়াত করার পর আজীবন জামা'তের খেদমত করেছেন। লেখনীর ব্যবহারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। জামা'তের অনেকগুলি পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। অনেক লেখা উর্দূ থেকে বঙ্গানুবাদ করেন। দীর্ঘদিন পাক্ষিক আহমদীর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন। কুরআন শরীফ বাংলা অনুবাদ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করনের কমিটিতে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। এ বুর্যুগ ২৪ জানুয়ারী ২০১০ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম স্থান পটুয়াখালী জেলায়। তাঁর সুযোগ্য সন্তান মৌলভী আহমদ তারেক

মোবাশ্বের বর্তমানে লন্ডনের বাংলাডেস্কে কর্মরত আছেন।

৬৫. কওসার আলী মোল্লা সাহেব

তাঁর জন্মস্থান ভারতে। এ দেশে আসার পর জামাতের খেদমতে বাকী জীবন অতিবাহিত করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারী ও মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের নায়েব সদর আউয়ালসহ বিভিন্ন পদে কাজ করেন। সর্বশেষ তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ছিলেন। এ বুর্যুগ ২৮ এপ্রিল ২০১৩ সালে ইন্তেকাল করেন।

৬৬. আবদার আলী সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাহবাজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শাহবাজপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন। জামা'তের মসজিদ নির্মাণের জন্য তিনি জমিও দান করেন।

৬৭. মুন্সি আব্দুর রহমান সাহেব

ডাক নাম চাঁন মিঞা নামে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে বয়াত করার পর প্রচণ্ড মোখালেফাতের সম্মুখীন হন। তাঁর নিজ বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল থানায়। বিরোধিতার সময় তার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বয়কট করে দীর্ঘ দিন একঘরে করে রাখা হয়। কিন্তু তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী সকল মোখালেফাতকে ঈমানের পরীক্ষার সোপান হিসেবে বরণ করে নেন। ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তাঁর সন্তান বিশিষ্ট সাংবাদিক আহমেদুর রহমান ও হাবিবুর রহমান মিলন।

৬৮. মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান সাহেব

গাইবান্ধা জেলায় তাঁর জন্মস্থান। তিনি ১৯১৯ সালে আহমদী হওয়ার পর আজীবন জামা'তের খেদমত করেছেন। পুলিশ বিভাগে চাকুরীতে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। চাকুরী জীবনে যেখানে গিয়েছেন সেখানেই তবলীগ করেছেন। তিনি ১৯২০-১৯২১ সালে শিলিগুড়িতে কর্মরত অবস্থায় শিলিগুড়িতে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি প্রথম ইমাম নিযুক্ত হন। তিনি 'দি প্রমিজড সান অফ দি প্রমিজড মসীহ্' গ্রন্থ রচনা করেন। এ বুযুর্গ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৩ তারিখ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

৬৯. মোহাম্মদ ইয়ামিন সাহেব

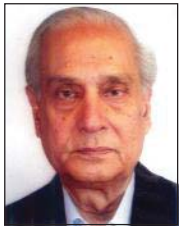

পাবনার পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ইয়ামিন সাহেব। তিনি এ দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। জামা'তের কাজে মুক্ত হস্তে দান করেছেন। কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ব্যয় নির্বাহ করেন তিনি। বঙ্গীয় প্রথম আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মেয়ের ঘরে নাতী। নারায়ণগঞ্জের দ্বিতল মসজিদ ক্রয়, নিউসোনাতলা বগুড়ার মসজিদ নির্মাণ এবং তারুয়ার মসজিদে বিশারাত নির্মাণ ছাড়াও কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহ্‌কে শ্বেত পাথর দিয়ে মোড়ানো ইত্যাদি নির্মাণ কাজ করানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন। এছাড়া প্রকাশনার কাজেও অনেক সেবা করেছেন। এ বুযুর্গ ১৯৩৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২০১১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৭০. মৌলভী তালেব হোসেন সাহেব

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার প্রেমারচর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর জামা'তের কাজে নিবেদিত হন। এলাকায় অনেক তবলীগ করেছেন। আল্লামা জিল্লুর রহমান সদর মুরুব্বী এবং এ.এইচ.এম. আলী আনোয়ার সাহেবসহ বিভিন্ন জনকে নিয়ে বড় বড় বাহাস করেছেন। ১৯৪০ সালে প্রেমারচর গ্রামে বাহাসে বিপক্ষের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাওলানা তাজুল ইসলাম পরাভূত হন। তালেব হোসেন সাহেব ১৯৪৩ সালে জামা'তের মৌলভী হিসেবে শাহ্‌বাজপুর জামা'তে কর্মরত অবস্থায় শাহ্‌বাজপুরে ইন্তেকাল করেন।

৭১. আব্দুল বারী সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এডভোকেট গোলাম ছামদানী খাদেম সাহেবের বড় ছেলে আব্দুল বারী সাহেব। তিনি বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিভিন্ন দেশে সুনামের সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮৯ সনে জামা'তের কাজে নিবেদিত হয়ে যান। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সেক্রেটারী উমুরে আমা ও পরে এডিশনাল ন্যাশনাল আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মার্চ ১৯৯৩ সালে ইন্তেকাল করেন।

৭২. আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব

চৌধুরী সাহেব ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জামা'তের খেদমতে এক নিবেদিত ব্যক্তি ছিলেন। লেখনীর ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি কবিতা লিখতেন। কোলকাতায় এক হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকালে কোলকাতা শহরের তৎকালীন মেয়রসহ অনেক সুধীজনকে তিনি তবলীগ করেছেন। ফলে সেকালের শিক্ষিত সুধী মহলে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে সুধারণা ছিল। আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক সীরাতুন নবী দিবস পালনে সুশীল সমাজের অনেকে আসতেন এবং বক্তব্য রাখতেন। চৌধুরী সাহেব ২২ জানুয়ারী ২০০৩ সালে কানাডায় মৃত্যুবরণ করেন।

৭৩. খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খড়মপুরের খাদেম বংশের লোক। তিনি সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ পদে চাকুরী করেছেন। চাকুরী জীবনে যেখানে গিয়েছেন সেখানেই তবলীগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর ছিলেন। তিনি ডেপুটি কে আর খাদেম নামে বেশি পরিচিত। ঢাকার দারুত তবলীগ ক্রয়ের কাজে তাঁর অবদান অনন্য।

৭৪. মাওলানা গিয়াসউদ্দীন আহমদ সাহেব

বিষ্ণুপুর গ্রামের প্রথম আহমদী ও এ জামা'তের প্রথম ইমাম। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গঠিত প্রথম বেঙ্গল ইয়ংম্যান আহমদীয়া এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। জামা'তের সাহিত্য ও লেখায় তার অবদান আছে। তিনি দেবগ্রাম হাই স্কুলে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বঙ্গীয় মোবাল্লেগ ছিলেন।

৭৫. মাওলানা আজিজ উদ্দীন আহমদ সাহেব

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর গ্রামে জন্মস্থান। তিনি বঙ্গীয় মোবাল্লেগ ছিলেন। এক তবলীগ পাগল ব্যক্তি। প্রত্যহ বাইসাইকেল নিয়ে বের হতেন এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আর্বিভূত হবার সংবাদ প্রচার করতেন। 'সত্য সোপান' নামে তাঁর রচিত একটি তবলীগি পুস্তক সে সময় বিশেষ সমাদৃত ছিল।

৭৬. হেকিম সাজেদুর রহমান সাহেব

পঞ্চগড়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ত্রিশ

দশকে বকশীবাজার দারুত তবলীগ অবস্থান করে জামা'তের অনেক খেদমত করেছেন। আহমদনগরে আহমদীদেরকে জমি ক্রয় করে বসতী স্থাপনের জন্য তিনি প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এক বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি পেশায় একজন খ্যাতিমান হেকিমী চিকিৎসক ছিলেন।

৭৭. মৌলভী আজীম উদ্দীন সাহেব

কিশোরগঞ্জ জেলার বীরপাইকশা গ্রামে ১৮৮৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষক থাকাকালে ১৯১৬ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর চাকুরী চলে যায়। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন স্থানে সুনাম ও দক্ষতার সাথে চাকুরী করেছেন। 'চশমায়ে মসীহ' ও 'কাশ্মীর বক্তৃতা' পুস্তক তাঁর কৃত বঙ্গানুবাদে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি 'ওফাতে মসীহ্' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি ১ মার্চ ১৯৬০ সালে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৭৮. মৌলভী রহমত আলী সাহেব

জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার বাশারুক গ্রামে। তিনি ১৯১৫ অথবা ১৯১৬ সালে বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তাই পিতা বাড়ি থেকে বের করে দেন। ফলে তিনি কাদিয়ান চলে যান। মাদ্রাসা আহমদীয়ায় অধ্যয়ন করেন। বিশ দশকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র আহবানে শুদ্ধি আন্দোলনে যোগদান করেন। পরবর্তীতে বঙ্গীয় মোবাল্লেগ হিসেবে জামা'তের খেদমত করেন। তিনি ২১ জুলাই ১৯৬০ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর ৭৫ বছর পূর্তি (১৯৩৮-২০১৩) উপলক্ষে নির্মিত স্মারক মসজিদ

মসজিদে আফিয়্যাত, মাহিগঞ্জ (খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবার পর)
Masjid-e-Aafiyat after complition, Khuddamul Ahmadiyya Memorial Mosque at Mahiganj

মসজিদে মাহমুদ: শতবার্ষিকী মূল স্মারক মসজিদ, কোড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবার পর)
Masjid-e-Mahmood: The main Centenary Memorial Mosque, Kodda, Brahmanbaria

GULSHAN

UTTARA

AREL

Adina Real Estate Ltd.

CONTACT:

0177 6061499

0179 3590126

BADDA

ADDRESS
72 PARK ROAD, SUITE-402
BARIDHARA

email: arelpost@gmail.com
web: www.arelinfo.com

Quality is our Tradition

Amecon

Since 1983

Address : H-79/3, Block-E, Chairman bari, Banani, Dhaka-1213, Bangladesh, Tel : 8824945, 9895686, Fax : 8824945,
Email : amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com
Website : **www.amecon-bd.net**

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.
CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.
LRORA
开利空调
Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com
House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা
Centenary Souvenir of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh. Printed by Intercon Associates, Motijheel, Dhaka